দগ্ধতার দিন

সোমক দাস

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

গল্পক্রম

ঝিনুকের মেখলা ৭

তুষারাবৃত ২১

অরাজনৈতিক ২৬

স্কিনডিজিজ ৩৩

বিধেয়লিপি ৪১

অশ্রুহীন জন্মমৃত্যু ৪৭

নতুন মানুষ ৫৫

মানুষের স্বভাবচরিত্র ৬২

হঠাৎ একটা হাওয়া ৬৮

কেন মেঘ আসে ৭৪

ঠিকানা ৮০

পতনের কথামালা ৯১

বিচ্ছিন্ন ৯৮

অলকা ও ভুল মানুষের পৃথিবী ১০৫

বাঘের ঘরে ১১০

গ্রহান্তরের মানুষ ১১৭

মানুষ-জন্ম ১২৪

লেটার-বক্স ১৩১

এখন তথাগত ১৪১

আশা-ভরসা ১৪৯

শূন্যতার স্বভাব ১৫৮

শ্বেত-ঊর্ণনাভ ১৬৭

ছমছম পর্বতমালা ১৭৭

দগ্ধতার দিন ১৮৭

বাঁক ১৯৫

এই লেখকের :

কবিতা

সোমক দাসেব কবিতা (প্রথম পর্ব)

ধ্বংসের প্রক্রিয়া

অনন্তজাতক

প্যারিস ডায়েরি

গল্প

সোমক দাসের গল্প

কোনো কোনো ধোঁয়ার রং নীল

অক্ষরের জন্মসূত্র

উপন্যাস

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

দিনরাত্রির তাপমাত্রা

প্রবন্ধ

ব্রহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

আঁটপুর থেকে বেলুড মঠ

কবিতার বিভিন্ন কোরাস

ঝিনুকের মেখলা

ওই তো, নীল জলরাশি, শাদা ফেনা আছড়ে পড়ছে, যাকে ঢেউ বলে লোকে। পুরী হোটেলের সামনের রাস্তাটায় পড়তেই তাকে দেখা গেল, যার জন্যে হাওড়ায় ওয়েটিং রুমে বসে থাকতে হয়েছে কাল রাত সাড়ে দশটা ওব্দি, তারপর স্টেশনে আরও দেড় ঘণ্টা ; জগন্নাথ লেট ছিল। আয়োজন শুরু হয়েছে সেই কবে থেকে। হঠাৎ ফোন এল একটা— নারীকণ্ঠ শুনে অকারণ পুলক যে একেবারে হয়নি, তা নয়, ওসব, আজও হয়, তবে তুলনায়, অল্প। শ্বেতার দিদি, 'কবে আসবে শ্বেতা', 'জুনের সেকেণ্ড উইকে আমরা সবাই পুরী যাচ্ছি, তোমাদের অসুবিধে আছে ?'

অসুবিধে ? হ্যাঁ, তা তো আছেই, অসুবিধেই তো আছে। থাকে, অসুবিধে কখনো যায় না। তাছাড়া সবাই ? আবার ! বোম্বে-গোয়া অজন্তা-ইলোরা, একবার হয়েছিল, ওই সবাই ; না, সেসব কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। গোয়ার ট্রেনে ওঠার আগে বোম্বে থেকেই আলাদা হয়ে গেল অসীমা, কৃষ্ণা আর রত্না। তারা নাগপুর চলে যাবে ছোটকার বাড়ি— আমাদের সঙ্গে যাবে না। জোনা বলেছিল— বেড়াতে যাবো বলে অনেক কষ্ট করে বেরিয়েছি, গোয়া আমি যাবোই। শ্বেতা গুনগুন বা মিনমিন করেছিল— আমিও যাবো। আগের দিনের সন্ধে বেলাকার গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার বাগানের ঘাসে ঝরে পড়া আমার অশ্রু ততক্ষনে বাষ্প হয়ে গেছে ; তবু, রাগটা তো আর কমেনি ! এলটিসি, লোন, অ্যাডভান্স, বাবা-মা-ভাই-বোনের নামে টাকা বের করে দিদি— না, দিদি সেবার ছিল না, শ্বেতা জোনা অসীমা কৃষ্ণা আর রত্নার টিকিট কেটে, অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাশের ভাড়া নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট— এসব করে দেওয়ার জন্যে অফিসে লোক থাকে আমি জানতামই না— মৃগাঙ্ক কদিন ঘোরাঘুরি করতে লাগল— এল টি সি নিচ্ছেন না ? বৌদিকে নিয়ে বেড়িয়ে আসুন ! ভূস্বর্গ কাশ্মীরটা দেখে আসুন, ভারতে থাকেন ! শুনতে শুনতে বলেই ফেলি একদিন— তোমার তাতে কি লাভ মৃগাঙ্ক ? আপনাকে নিয়েই তো আমরা আছি। ব্যাপারটা বোঝা গেল পরে। শালীদের নামে নামে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট মৃগাঙ্ক ঠিক সময়েই এনে দিয়েছিল— তার আগে মা বাবা ভাই বোনের নামে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে শো করতে হয়— সে ব্যবস্থাও মৃগাঙ্কই করে দিয়েছিল খুঁতহীন পদ্ধতিতে— ফিরে এসে এল টি সি'র বিলটাও মৃগাঙ্কই করে দিয়েছিল। বিল যাতে আটকে না যায় তার ব্যবস্থাও ওই মৃগাঙ্কই করেছিল।

পেমেণ্টের দিন, পাশে দাঁড়িয়ে, রেভিনিউ স্ট্যাম্প এক-গাল হেসে এগিয়ে দিয়েছিল ওই মৃগাঙ্কই ;— 'অসুবিধে হলে বলবেন।' 'অসুবিধে হলে বলবেন।' অসুবিধে তো হলই। ছজনের গোয়া পর্যন্ত ফার্স্ট ক্লাশের আপ ডাউন-টোটাল ভাড়া তার থার্টি পার্সেণ্ট মৃগাঙ্কের পকেটে চলে গেলে খুব একটা সুবিধে হবার কথা নয়!

এবার পুরী ; সঙ্গে ওই সবাই। সেবারে দিদিরা ছিল না ; এবারে দিদি তো আছেই, সে-ই উদ্যোক্তা— সঙ্গে ভায়রা, যার ডাক নাম 'সুন্দর'—ভালো নামটা মনে না থাকার মতন কথা একটা ; কি একটা ভূষন জাতীয় ; যত্নের সঙ্গে ভুলে গেছি। সঙ্গে টিম্‌পাই আর মুনিয়া, শ্বেতার দিদির ছেলে আর মেয়ে ; একজন পাঁচ আর অন্যজন দুবছরের। দিদিকে কি বলা যায়— তোমাদের সঙ্গে আর না? টেলিফোনে বেশ শান্ত প্রত্যুত্তর দিতে হল— 'শ্বেতা তো এসেই যাচ্ছে। মাসখানেকের ছুটি। অসুবিধের কি আছে!'

থাপায়ের হলিডে হোমটা পাচ্ছি। পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক করে দিয়েছেন। তাহলে তোমাদেরও টিকিট কাটছি। জুনের সেকেণ্ড উইক কিন্তু।

ঠিক আছে। রাখছি?

আচ্ছা। তুমি ভালো তো?

এই, চলছে। সুন্দরদা কেমন আছে?

সারাদিন হাই তোলে। কিছুই হজম হয় না। কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চায় না।

পুরী তো আগেও গেছ তোমরা?

দু তিন বার। এবার সবাইকে নিয়ে...ওদের তো কোথাও যাওয়া হয় না!

ঠিক আছে। রাখছি।

আচ্ছা।

ফোনটা রেখে সেকশনে ফিরতেই হুড়মুড় করে ছুটে এল বম্বে ও গোয়ার ছবি, কয়েক টুকরো। লোক ছজন হলেও ব্যাগের সংখ্যা মোট তেরোটা। খাবার দাবারের বালতিই ছিল দুটো। মাঝে মাঝে ট্রেন থেকে নেমে গরম জল চেয়ে আনতে হচ্ছিল চায়ের জন্যে। খাবার দাবারের ডিপার্টমেণ্ট কৃষ্ণার ; কলা খাবেন? ডিম খাবেন? কিছুই খাবেন না, শুধু চা খাবেন? আপনি যে কীই না, গরম জল আনবেন সামনের স্টেশনে। করে দোব। সামনে দিয়ে চোদ্দবার ঘুরে যাচ্ছে চা-ওলা। তার দিকে উপেক্ষার চোখে তাকিয়ে রত্না— ওই চা খেতে হবে না।

শ্বেতা যেখানে যায় গ্লাস থালা ছুরি সুঁচ সুতো বোতাম— পুরো সংসার তার সঙ্গে থাকে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, সুবিধে হয়। বেড়াতে গিয়েও ওয়েদার মিলিয়ে জামাকাপড় পরা যায়, ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ানো যায়— শ্বেতার পরিশ্রমপ্রবণতার যাবতীয় সুখ মেখে নেওয়া যায় সর্বাঙ্গে, শুধু কর্তৃত্ব বোধটা ছেড়ে দিতে হয় পুরোপুরি— কিছু পেতে হলে, কিছু দেবারও নিয়ম আছে পৃথিবীতে।

'কেমন লাগছে ব্যাপারটা?'

বোনেদের মাঝখানে, ইন্দ্রানীর মতো বসে, খেতে খেতে যেতে যেতে— শ্বেতা

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিল হাল্কা খুশিতে, উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসের চোখে, ঠোঁটে ছিল দুষ্টুমিষ্টি এক হাসি, যা অপ্রকাশ্য— প্রকৃতপক্ষে! যেন, শ্যালিকাপরিবৃত হয়ে এই ঘরোয়া পরিবেশের সঙ্গে দূরপাল্লার ট্রেনের এই ঝমঝমাঝম— আর কি চাই। কজনের কপালে হয় এতো!

'বুঝতে পারছি না ঠিক।' বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের ছুটন্ত সবুজদের দিকে— যা আসলে চলমান না, স্থির ও শান্ত— সেই দৃষ্টিবিভ্রমের দিকে তাকিয়ে রয়েছি দেখে সবচেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রত্না। ছোট শালী। বোধহয়, সেই সবচেয়ে বেশী জানে শোনে আমাকে, যেহেতু সে তার মেজদিকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশী। আর চেহারায়, মনের মিলে, শ্বেতার অল্পবয়সী সংস্করণ বলা যায় তাকে; রত্নাকে— মানে, যে শ্বেতাকে আমি দেখিনি কখনো, পাইনি এবং পাবো নাও— রত্না, ঠিক সেরকমই। শ্বেতা ও রত্না, দুজনেই, প্রফেশনাল নার্স। ফলতঃ তাদের মিল গভীর, গভীরতর। দুজনের দেখা হলে, আমাকেই ভুলে যায় শ্বেতা। অন্তত, সেরকমই মনে হতে থাকে; তাদের যে কথার ফুলঝুরি— না বলা কথার স্রোত, যা জমে থাকে দিনের পর দিন, যেন পাহাড় ফেটে বেরিয়ে পড়েছে ঝর্ণা; হাবভাব দেখে মনে হয়। কই, আমার তো হয় না এরকম; শ্বেতাকে দেখলে! রত্না তো আমার চেয়েও অনেক বেশীদিন ধরে শ্বেতাকে দেখেছে। মেজদি, মেজদি মেজদি...। কি এত কথা থাকে ওদের। আমার তো—।

লেডি উইথ দ্য ল্যাম্পের পরে, শ্বেতাকে, নার্স বলে, ব্যাগ অ্যাণ্ড ব্যাগেজ সবসময় ওর সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত থাকে বলে— আমরা নাম দিয়েছি তার— 'লেডি উইথ দ্য লাগেজ'! তাছাড়া শ্রেষ্ঠ লাগেজের মধ্যে আমি তো আছিই; দায়িত্ব নেবার নাম শুনলেই যে অসহায় হয়ে পড়ে, যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব— ওই শ্বেতারই। কৃষ্ণাকে— 'ওসি, কিচেন' আর জোনা হল 'ওসি, প্ল্যানিং'; যে কোনো পরিকল্পনা জোনার মত আর কেউ অতোটা পারে না। রত্নাকে, 'ওসি, অ্যামিউজমেন্ট', আর অসীমাকে— 'ওসি, অ্যাকাউন্টস।' আসলে, ওসি না হলে ওদের হাবিলদার বলাই উচিত। রেগে যেতে পারে বলে বলি না। কৃষ্ণা একবার বলেছিল— আপনি যে এত নাম দিলেন; আপনাকে যদি আমরা সবাই মিলে নিত্য নতুন নাম দিই— সামলাতে পারবেন? বলেছিলাম— ছিঃ! গুরুজনদের নিয়ে ঠাট্টা।

বোম্বে নেবেই ছোট ট্রেনে দাদার। সেখান থেকে অটো। ঢালু চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে মধ্যে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি। সুন্দরদার জামাইবাবুর বাড়ি সহজেই পাওয়া গেল। বিরাট সরকারি অফিসার লোক। দিদি কিন্তু কালো, মোটা, হাসিখুশি ভাব। 'ন্যাশনাল পার্কটা কিন্তু আজ না গেলে আর দেখা হবে না, ওটা শুধু রোববার খোলা থাকে।' বলে বাবু, জামাইবাবুর একমাত্র সন্তান, তখনো বেকার— যে কোনো দিন আই এ এস পেয়ে যাবে মার্কা চেহারা— আমাদের ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল। টিভিতে কুইজ প্রোগ্রাম দেখে। সাজানো ফ্ল্যাট, মাঝখানে নীচু পার্টিসান ওয়াল, ভারী ও আরামদায়ক সোফা, এক কোনে টিভি, কাঁচের চওড়া

জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের উজ্জ্বল রোদ হালকা ও নরম হয়ে ঘরে আসছে। লম্বা ঘরের অন্যদিকে বাদামী ডাইনিং টেবিল, বুকসমান উঁচুতে দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসছে হাতদুয়েক চওড়া সিমেন্টের সেলফ, সেখানে পরপর নানারঙের জিনিস সাজানো। গাঢ় রঙের দেয়াল আর কোনাকুনি বসানো মোজাইকের মেঝের ডিজাইন— সবকিছুর ওপর শেড দেওয়া স্তিমিত আলো এসে পড়ছে নানা দিক থেকে, এবাড়িতে আলো ও রৌদ্রের প্রকাশ ও পরিক্রমা যেন নিয়ন্ত্রিত, উচ্ছল ও অনধিকারীর মত ছেলেমানুষ নয় তারা।

এক মিনিট বিশ্রাম না করেই রত্না— চলুন, চলুন। তাহলে তো এক্ষুনি বেরোতে হবে। মেজদি, ক্যামেরাটা কোন ব্যাগে রে!

এখানে কিন্তু বাঘ সিংহরা বাইরে ছাড়া থাকে, মানুষ যায় খাঁচায়। চাকা লাগানো খাঁচার ভেতর থেকে মানুষ তাদের দেখে! বাবু আরও বলল।

অসীমা বলল— ওমা! ছাড়া থাকে?

সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসে এখন আবার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল পার্কে। এদের কি মাথা খারাপ! আমি যাবো না।

থাকো তাহলে, বিশ্রাম করো। জামাইবাবুর কাছ থেকে সব জেনে টেনে নিয়ে কালকের প্রোগ্রাম সব ঠিক করে রেখো। বাবু এসো। আমরা গেলাম।

দিদিও কোথায় একটা কার বাড়িতে রামকৃষ্ণ ভজনসভায় চলে গেলেন। জামাইবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা দুজনে সব রান্না শেষ করে ফেললাম বেলা দুটোর মধ্যে। জামাইবাবু বললেন, বম্বেতে কাজের লোক পাওয়া খুব ঝামেলা। আমরা সব নিজের হাতে করি! হাসি হাসি মুখে নানারকম রসিকতার কাহিনী বলতে বলতে রান্নাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামিয়ে দিলেন বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। আমরা কেউ কারও ওপর ডিপেণ্ডেণ্ট নই। যখন যার যা ইচ্ছে রান্না করে খেয়ে নিই। চমৎকার ব্যবস্থা। বলতেই হল।

সাড়ে চারটের সময় বিকেলে রামকৃষ্ণ ভজনাপর্ব শেষ করে দিদি ফিরলেন। ফিরেই বললেন— সেকি, ওরা এখনও ফিরল না?

বাবু তো আছে সঙ্গে? জামাইবাবুর সান্ত্বনা।

খিদেয় পেট থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। দিদি আমাকে দেখিয়ে জামাইবাবুকে— তোমরা খেয়ে নিয়েছো তো?

সবাই ফিরলে একসঙ্গে...।

সে কি! ট্রেন জার্নি করে এল... কিছুই খেতে দাওনি ওকে?

আমরা কফি খেয়েছি, বিস্কুট— বলতেই হল।

না না, তোমরা খেতে বসো, টেবিলে এসে বোসো। আমি দিচ্ছি।

বিপুল খাওয়া দাওয়া। শরীর অবসন্ন হয়ে এল। ঘুম ভাঙলো শ্বেতাদের চেঁচামেচিতে। প্রায় সন্ধে নেমেছে তখন বাইরে। শালীদের উজ্জ্বল মুখ ও খুশি খুশি কলকাকলি। বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। দু-একবার অনুরোধ করলেই তো

আমিও রাজী হয়ে যেতাম যেতে। একবার বলা তো দূরে থাক, সবাই কিরম ড্যাঙ ড্যাঙ করে বেরিয়ে গেল বাবুর সঙ্গে— আমি শুধু জামাইবাবুর সঙ্গে 'ওরা কখন ফিরবে' 'কখন ফিরবে' করতে করতে ভাত নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইলাম! দিদি এসে জোর না খাওয়ালে আমরা তো না খেয়ে বসেই থাকতাম ওরা না ফেরা পর্যন্ত! এসব কথা কি মনে ছিল ওদের একটুও। সন্ধেবেলাটা মোটামুটি গল্প করে টিভি দেখে কেটে গেল। কালকের দিনটা— শুধু বোম্বে। পরশু সকাল নটায় বোম্বে ভি.টি. থেকে গোয়ার ট্রেন। বাইশটা টানেল পড়বে। মিরাজ এক্সপ্রেসে মিরাজ থেকে ট্রেন পাল্টে পানজি। সেখান থেকে বাসে গোয়া টুরিস্ট লজ, রাজধানী পানজীর মাঝখানে, বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে।

সকালে উঠেই দেখি পাঞ্জাবিটা নেই। এত লাগেজ বইবার মানে কি তাহলে? বুলুর দেওয়া পাঞ্জাবিটা সবুজ, সিল্কের— আর প্যাণ্টটা দইয়ের সরের মতন রঙের ভেলভেট কর্ডের। বাইরে বম্বেতে বা গোয়ার সমুদ্রের ধারে ওগুলো পরে ঘুরে বেড়াবো— ধরেই নিয়েছিলাম। বুলু যে আমার বন্ধু, শ্বেতা তা জানে। আমার এক কথায় প্রাইভেট ফার্মের চাকরি ছেড়ে ডিভোর্স করে পাঁচবছরের মেয়ে দোলাকে নিয়ে সল্ট লেকে মায়ের কাছে চলে এসেছিল। রিসেপশনিস্টের চাকরি বুলুকে মানায় না! সেখানে ডিভোর্সীর এত বদনাম! ডিভোর্স অবশ্য করতে হতই। হঠাৎ একদিন, অফিসের নিচের একটা চায়ের দোকানে— উদ্‌ভ্রান্ত বুলু— তোমার একটা দায়িত্ব নেই। তার মেরীর মত মুখ তখন কান্নায়, অবরুদ্ধ আবেগে করমচা লাল, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, যেন অনেক কিছুই চায় তারা। বলে ফেলতে, করে উঠতে চায়।

আমার সঙ্গে থাকবে? শ্বেতা তো তোমার সঙ্গে থাকে না!

বুলু এতদূর পর্যন্ত বলেছিল।

মেয়েটাকে নিয়ে এলে কেন? লেক গার্ডেন্‌সের বাড়ীতে, সুদীপের কাছে ওতো ভালোই মানুষ হতো। কমপ্যারাটিভলি, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতো দোলা।

আমার মেয়ে আমার সঙ্গে, আমার কাছে থাকবে। দৃঢ় হয়েছিল বুলু অত বিষণ্ণতার মধ্যেও।

অফিসের বন্ধুরা দু-একজন ছিল, রোজই থাকে। অনেক মুখচেনা লোকজন আসছে যাচ্ছে, দেখছে। কোনো যুবতী মহিলা যদি সামনে বসে কাঁদে, তাও নিঃশব্দে— সে দৃশ্য কম আকর্ষণীয় নয়।

দোলার সাথে যদি হয় হতে পারে। তোমার সঙ্গে আর হয় না। শ্বেতা সব সময় আমার কাছে থাকতে হয় তো পারে না— ট্রান্সফারেবল চাকরি; তবু, সে আমার স্ত্রী। সহধর্মিনী। হিন্দুদের দুবার বিয়ে হয় না। তাছাড়া, তোমাকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেও নেই আমার। কোন দিনই ছিল না। তুমিও তো বিবাহিতই একরকম। এখন অবশ্য ডিভোর্সী!

তুমি ভীতু।

হতে পারি। তবে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু। বিপদে পড়লে তোমায় দেখবো।

মায়ের কাছেই, সল্টলেকে, দোলাকে নিয়ে গেল বুলু। গতবার পুজোর আগে দোলার একটা ফ্রক আর বুলুর একটা শাড়ির বদলে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর দুধের সর রঙের ভেলভেট কর্ডের প্যাণ্ট দিয়েছিল বুলু। শ্বেতা বলেছিল— তুমি, নিলে ? কি করে নিলে গো ?

আমার বরের কাছ থেকে যে মেয়ে শাড়ি নেয়, তাকে আমি...

আমার কোনো বন্ধু তোমাকে কিছু উপহার দিলে তুমি নেবে না ? লক্ষ্মণ তোমাকে কাঁচি দিলে তুমি নাও নি !

তা, শ্বেতা, পাঞ্জাবিটা আনেনি। বহুবার বলেছিলাম প্রত্যেকের একটা করে আলাদা আলাদা ব্যাগ হোক ; যে যার ব্যাগে নিজের জিনিসপত্র ইচ্ছেমত গুছিয়ে রাখুক ; যাতে চট করে যে কেউ তার দরকারের জিনিসটা সহজে অন্য কাউকে টানাটানি না করেই পেয়ে যেতে পারে। কেউ তা শোনেনি। পুরো দুদিন ধরে ক্যালরব্যালর করতে করতে সবাই মিলে মালপত্র গুছিয়েছে। মোট তেরোটা ব্যাগ। কার মধ্যে কে কি ঢুকিয়েছে তাই নিয়ে যখন তখন ঝনঝাট হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা বার করার দরকার হলে অসীমা প্রথমেই বলছে— আমি জানি না। বাকিরা বেশ খানিকক্ষণ রিসার্চ করে বলে দিচ্ছে— ওই নীল ব্যাগটা দেখ তো।

সকালে বেরিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে কৃষ্ণা বলল— এবার কোন দিকে ?

উঁচু নিচু চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে লম্বা লম্বা গাছ। সকালের প্রশান্ত হাওয়া। আলো তখনও রোদ্দুর হয়ে যায় নি। উত্তরে পরিষ্কার বললাম— আমি কিচ্ছু জানি না। বাবু, শ্বেতা অনেক করে বললেও আজ আর আসতে রাজী হয় নি। ডিরেকশন বুঝে নিয়েছে শ্বেতা। দাদার স্টেশনে গিয়েই একটা উল্টো ট্রেনে উঠে বসল সবাই। আমি যেন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ওদের সঙ্গে সদ্য আলাপিত এক অপরিচিত যুবা মাত্র। শ্বেতা বিশেষ অন্তরঙ্গতা দেখাবার ভঙ্গিতে 'পকেটমার হয়ে যেতে পারে', 'পেছনের পকেটে রেখো না পার্স', 'পকেটমার হয়ে যেতে পারে'— বার বার বলতে লাগল। আমি সিগারেট কেনার মতন টাকা বুক পকেটে রেখে পার্সটা শ্বেতাকে দিতেই বিনা মন্তব্যে নিজের ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে জানলার ধারের সিটটা দখল করল মেজাজে।

ট্রেন ছেড়ে দেবার দু এক মুহূর্ত আগে বলতেই হল— এটা কিন্তু বোম্বে ভি.টি. যাচ্ছে না !

হুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়ল। উল্টে দোষ চাপাল রত্না— কিরকম লোক ; ভুলভাল ট্রেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছেন !

তুলে দিয়ে ? কড়া চোখে রত্নার দিকে তাকাতেই চোখ নামিয়ে নেয় সে।

সারাদিনে, হ্যাঙ্গিং গার্ডেন আর সফদরজঙ্গ মিউজিয়াম ছাড়া আর কিছু দেখে উঠতে পারলাম না আমরা। ফটো তুলতে গিয়ে হাস্যকর মান অভিমান হল, আমি

দাঁড়াবো না। রত্না বলল সেও ফটো তোলাবে না— ওসব ছেলেমানুষি তার আসে না ঠিক! জোনা কিছু ছবি তুলল ঘুরে ঘুরে। ওর চিবুকের নিচে গলার ডানদিকে একটা বড় ধরনের পোড়া দাগ আছে বলে সহজে সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে চায় না। ছবি তোলার কথা উঠলেই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে— দে, আমি তুলে দিচ্ছি। রাস্তায় মাঝে মাঝে ভুল করে দু-একবার বলে ফেলেছি— এই বাসটা যাবে। কেউ আমার কথায় কর্ণপাত না করে অপরিচিত লোকজনকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে এক একটা বাসে উঠল। উঠতে হল আমাকেও। বিকেলের দিকে দেখলাম পাঁচজন নারীর পেছন পেছন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি বোম্বে শহরে আর সিগারেট খাচ্ছি একা একা মাঝে মাঝে মনের দুঃখে!

হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে জড়াজড়ি করে বসেছিল কিশোর কিশোরী, বুড়োবুড়ি, ছুঁড়োছুঁড়ি, যুবকযুবতী, বুড়ি ও যুবক যে যেমন খুশি ভঙ্গিতে, পৃথিবী ভুলে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বকবকম্ করে যাচ্ছে একনাগাড়ে। ওপরে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে দূরের মেরিন ড্রাইভ দেখতে দেখতে শ্বেতারা সবাই মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখে নিচ্ছে জড়াজড়ি করা প্রেমিক প্রেমিকাদের— বিরক্তিতে কুঁচকে উঠছে অবোধ ভ্রূ। আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এক বিদেশী বিদেশিনীর দলের দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে আছি দেখে শ্বেতা বলল— চল্। আরও অনেক বাকি। বস্তুতঃ, দুজন বিদেশিনী ও একজন বিদেশীর প্রেমকীর্তির সমবেত প্রকাশ দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল।

ঝামেলাটা শুরু হল গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ায় গিয়ে।

এলিফ্যাণ্টা কেভে যাবো।

আমরা যাবো না। প্রথম শুরু করল রত্না।

আমরা ন্যাশনাল পার্কে ক্যানারি কেভস্ দেখেছি। জামাইবাবু বলেছে, এলিফ্যাণ্টা কেভস্ ওই একই। এবার জোনা।

আমি কিন্তু যাবোই। সারাদিন আমি কোনো কথা বলিনি। তোমাদের কোনো ইচ্ছেয় বাধা দিইনি আমি। তোমাদের কোনও অসুবিধেও করিনি। শুধু পাঁচজন মেয়ের পেছন পেছন সঙের মতন ঘুরে বেড়াবার জন্যে আমি বম্বে এসেছি নাকি। অনেকক্ষণ চা খাইনি। আমি এখন চা খাবো। তারপর এলিফ্যাণ্টা যাবো। তোমরা যাবে না। তোমরা যা পারো করো।

চাপা গুঞ্জন উঠল মেয়ে মহলে। রত্না একবার শক্ত হবার চেষ্টা করল। আমি বুঝিয়ে বলছি। বললে, সোমকদা নিশ্চয়ই বুঝবে। সোমকদা তো আর আমাদের মতন অবুঝ নয়।

শ্বেতা একবার আটকাবার চেষ্টা করল। তুই জানিস্ না—

রত্না ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। শুনুন, দিদি জামাইবাবুদের অসুবিধে হবে। এক-দুদিনের জন্যে অতিথি হয়ে এসে আমরা তো তাদের বিরক্তির কারণ হতে পারি না—

কাল মনে ছিল না ?

কাল তো বাবু ছিল আমাদের সঙ্গে।

আমি আর জামাইবাবু ভাত নিয়ে সারাদিন ঘরবার করেছি।

না করলেও পারতেন। এসে তো দেখলাম মেজাজে ঘুম মারছেন।

আমি এখন এলিফ্যাণ্টা কেভ যাবো রত্না। চা খেয়ে। মাথাটা ধরেছে। কথা বাড়িও না। কোনো লাভ নেই!

চা খেয়ে কাউন্টারের দিকে গিয়ে দেখি, স্টিমারের টিকিট দেওয়া ঘণ্টাখানেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে। পিছন ফিরে দেখি— ওরা কেউ নেই!

এতদূর, ভাবতে পারিনি। আরব সাগরের লোনা জলের ঢেউয়ে দুলছে ছোট ছোট লঞ্চ। ডাকছে— এলিফ্যান্টা, এলিফ্যানটা—। সরকারী কাউণ্টার তো বন্ধ হয়ে গেছে এক ঘণ্টা আগে! এরা কি তবে বেসরকারী ? যাই হোক, এখন তো যাই। টিকিট কত করে, জিগ্যেস না করেই উঠে জলের ধারে রেলিঙে ভর দিয়ে মেজাজে দাঁড়ালাম। ভট্ ভট্ করতে করতে দুলে দুলে ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নীল জলরাশিকে ক্ষিপ্ত করে দূর থেকে— 'ওই যে, সাব্, এলিফ্যাণ্টা— আজ গেট বন্ধ হয়ে গেছে'— বলে ভট্ ভট্ করতে করতে ফিরে এল।

দুশ্চিন্তা শুরু হল সন্ধ্যে নেমে আসার পর। বোম্বের কিছু চিনি না। কাছে দূরে বিশাল বিশাল বাড়ি। গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার ভিড় কমে আসছে। সামনের পার্কে খেলা করছে শিশুরা ; স্বাস্থ্যবান তারা বেশ, সুসজ্জিতও। উজ্জ্বল পালিশ করা মায়েরা আশেপাশে ঘুরছে অলসমন্থর ভঙ্গিতে। দু'একজন যুবতী কয়েকজন যুবকের সঙ্গে গোল হয়ে বসে উচ্ছল ভঙ্গিমায় হাসাহাসি করছে সলজ্জ অনুশাসনসহ।

শ্বেতারা এ তল্লাটেই নেই।

ধীরে ধীরে, প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম পার্কের ঘাসে। তারপর আস্তে-আস্তে উপুড় হয়ে শুলাম। ওরা...চলে যেতে পারল ? আমাকে ফেলে রেখে ওরা চলে গেল, সত্যি ? কাদের সঙ্গে এলাম, তাহলে! বেড়াতে এলাম, যারা বেড়াতে চায়, যাদের বেড়ানো হয় না, তাদের মায়ায় ভুলে বেআইনী ভাবে টিকিট কেটে— ধরা পড়লে চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে যেখানে, যাদের জন্যে এতখানি ঝুঁকি নেওয়া— মা বাবা ভাই বোনের নামে টাকা বের করে, তাদের না দিয়ে, না জানিয়েও— যাদের নিয়ে এতদূর এলাম, তারা... তারা... সামান্য মতের অমিল হয়েছে বলে ফেলে চলে গেল আমাকে! বাহ্। চমৎকার।

অসহায় লাগলেই মন মদের দিকে ঝোঁকে। এ পকেট ও পকেট ঝেড়ে ঝুরে দুতিন পেগ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে...। একটা সিগারেটের দোকানে ফোন করতে দিল। তিনটে চাইনিজ রেষ্টুরেণ্ট ফোন করতে চাইলে না বলল। নাম্বারটা ভাগ্যিস শাদা রঙের ক্র্যাডলের মাঝখানে দেখে নিয়েছিলাম, লেখা ছিল। স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ফোন ধরল বাবু।— ওরা তো এখনো আসেনি। আপনি কোথা থেকে বলছেন ?

ইণ্ডিয়া গেট থেকে। আমি কিভাবে বাড়ি ফিরবো ?

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বোম্বে ভি.টি. ষ্টেশনে চলে আসুন। ওখানে থেকে লোকালে দাদার। তারপর তো জানেন।

'হ্যাঁ। তারপর জানি। ট্যাক্সি পাবো তো।' '—এটা কলকাতা নয়।'

আচ্ছা, রাখছি!

ট্যাক্সি সহজেই পাওয়া গেল। পোঁ করে বোম্বে ভি.টি। দাদারের লোকালও বেশ সহজেই পাওয়া গেল। ওভারব্রীজ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে কিছুদূর যেতেই একটা ছোটোখাটো বার কাম রেস্তোঁরা। আর কি চাই।

কে কার সঙ্গে এসেছে, কে কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে, কে কার কথা শুনবে এবং শুনবে না, সেসব কথা পরে হবে!

'আমার চোখের দিকে তাকাও তো দেখি,' খাবার টেবিলে আমার চিবুক ধরে দিদিভাইয়ে প্রশ্ন কিংবা পরীক্ষা, 'তাকাতে পারলে তো তাকাবে।' মুখের গ্রাস নামিয়ে রেখে— 'না তাকাবার কী আছে আবার!' বলতেই বেশ ভয় পেয়ে যায় দিদিভাই। তার আগে, চুর চুর হয়ে— 'এ লগন গান শোনাবার' গুনগুন করতে করতে ঢুকতেই— 'ওদের ছেড়ে চলে গেলেন ?' বলেছিল বাবু।

'আমি ওদের ছেড়ে চলে গেছি ? তাই নাকি ?' ততক্ষণে একটা ছোট ব্যাগ খালি করে তার মধ্যে আমার জামাকাপড় ভরে ফেলেছি দ্রুত। সেটা কাঁধে নিয়ে— বাবু, আমি আর একবার ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি— তুমি সামলিও, দেখো ওদের, কেমন ?— বলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম দ্বিতীয় বার। উৎরাই পেরিয়ে কিছুদূর নামতেই পেছন থেকে বাবু এসে— মা খুব বকছে। আপনি আমাদের অতিথি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনি কিছুই চেনেন না বোম্বের—।

ফিরে আসতেই হল। খাওয়া দাওয়া হলে, দিদিভাইকে— আপনি শ্বেতাকে কিন্তু আপনার ঘরে রাখুন দিদি, আমার সঙ্গে শুলে মার্ডার ফার্ডার হয়ে যাবে শেষে।

ব্যাগ খুলে আমার ঘর থেকে সবাই জামাকাপড় নিতে এলে দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, 'আউট, বেবিস্' বলে এমন চিৎকার করলাম একটা...।

এই 'সবাই'কে নিয়ে, আবার!

বোম্বে ভি.টি. স্টেশনে শ্বেতার কাছ থেকে টিকিট, টাকা, পুরো বুঝে নিয়ে বললাম— হ্যাঁ, কে কে যাচ্ছে, গোয়া। যেই যাক, কোনরকম ট্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করলে সোজা লাথি মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দোব একদম। অনেক হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে পাছা বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রত্না বলল, আমি যাবো না।

অসীমা বলল, এরম করলে আমিও যাবো না।

কৃষ্ণা বলল, আমরা ছোটকার বাড়ি যাবো। নাগপুর।

বললাম, যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যা তোরা! আমি গোয়া যাবো।

তা ওরা চলেই গেল। অসীমা, কৃষ্ণা আর রত্না। আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পর দরজায় দাঁড়িয়ে শ্বেতা বলল, ওদের দেখা যাচ্ছে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

জোনা কোনো গণ্ডগোল করেনি। তবে, গোয়ায় ট্যুরিস্ট লজে, ডর্মিটারিতে ওঠার আমার ইচ্ছা ছিল না। শ্বেতা বলল— দশ টাকা করে রেট। এত শস্তা। অন্য জায়গায় যাবো কেন!

আবার সেই মতের অমিল! বাড়িতে তো রোজই হয়। বাইরে বেরিয়েও যদি—

ট্যুরিস্ট লজের ক্যান্টিনের বারটা ভারী চমৎকার। ক্যাশ এখন আমার হাতে। জোনার প্ল্যান প্রথম দিন রেস্ট। তারপর পর পর দুদিন কণ্ডাকটেড ট্যুর। একদিন সন্ধেবেলা লঞ্চের ছাদে বসে নাচ গান দেখা।

আজ তো খাই। পরের কথা পরে। ক্যান্টিনে বসে সারাদিন হুইস্কি থেকে কাজু ফেনি, কিছু বাদাম দিলাম না। বার বন্ধ হল রাত দশটায়। ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শ্বেতা বলল- বাইরে চলো।

তা যেতে পারি। আপত্তি কি!

বাইরে কিছুদূর গিয়ে একটা চমৎকার রাস্তা। লাল খোয়া ঢালা রাস্তা। অল্প জ্যোৎস্নায় ভালোই লাগছে। পেটে, রক্তে, আত্মায়— নানা রকম মদ। আকুল হয়ে প্রশ্ন করলাম— বুলুর পাঞ্জাবিটা তুমি আনলে না কেন, শ্বেতা?

তোমার কি জামাকাপড় নেই?

জামাকাপড়, আমি নিজে কোনদিন নিজের জন্যে কিনতে পারি না। কিনতে গেলেই মনে হয়— অমুকের নেই। আমার চেয়ে ওর আরও বেশী দরকার।

লক্ষণ তোমাকে কাঁচি দিলে আমি কি তোমাকে ব্যবহার করতে বারণ করি!

ধীরে ধীরে জামাটা খুলি। ছুঁড়ে ফেলে দিই। কুড়িয়ে আনে শ্বেতা। গেঞ্জিটা খুলি। ছুঁড়ে ফেলে দিই। কুড়িয়ে আনে শ্বেতা। প্যান্ট খুলি। ছুঁড়ে ফেলে দিই। আর্তনাদ করে ওঠে শ্বেতা। ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেটাও কুড়িয়ে আনে সে। জাঙ্গিয়াটাও যখন খুলতে যাচ্ছি— শ্বেতা বাধা না দিয়ে পারে না। একটু ধাক্কা দিতেই ছিট্‌কে পড়ে যায় সে। ততক্ষণে তার মুখের ওপর জাঙ্গিয়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকি আমি। মাথায় মদ। জ্যোৎস্না ঢুকে যাচ্ছে প্রত্যেক অণুতে। সমুদ্রের হাওয়া আসছে দূর থেকে!

হাওয়ার কি প্রাণ আছে? না থাকলে, হাওয়ার ভেতর থেকে এত আশ্বাস, আশ্রয়, অনাবিল উৎসাহ ভেসে আসে কেন! মানুষের কাছ থেকে কেন যে আসে না! এলেও তা বড় শর্তসাপেক্ষ।

এদের সঙ্গে পুরী আবার! সঙ্গে দিদি, এবং দুটি শিশু। মহিলা মোট ছজন। ব্যাগ অবশ্য আগেরবারের তুলনায় সংখ্যায় কম; মোট এগারোটা। ছজন মহিলা, দুটি শিশু এবং দুজন পুরুষ। দিদি আর সুন্দরদার, শিশুদেরও, জিনিসপত্র একটা ঢাউস ট্রাভেলাইটে, রত্নারটাও ট্রাভেলাইট, অন্যদেরগুলো নানা সাইজের ব্যাগ।

প্রথম ঝনঝাট হল রিকশাভাড়া নিয়ে। পুরী হোটেল পেরিয়ে, স্বর্গদ্বারের গলির ভেতর ঢুকে রিকশাওলা বলে, আর যাবো না। আট টাকায় এর বেশী যাওয়া যায় না।

আট টাকা দিব না তো কি আঠারো টাকা দিব? উড়িয়া ভাষার দখল বোঝাতে এরকম বাংলা বলল সুন্দরদা। রোগা লম্বা, একমাথা চুল, মোটা ফ্রেমের চশমাসহ ধারালো চিবুক, সরু করে ছাঁটা গোঁফ ও অল্প বসে যাওয়া চোয়াল, সব মিলিয়ে বেশ ব্যক্তিত্বময়। তবে চিৎকার করে উঠল হঠাৎ এত জোরে — দু চারজন পথযাত্রী দাঁড়িয়ে গেল। থাপারের হলিডে হোম আমরা চিনি না। রিকশাওয়ালাও চেনে না। তারা আট টাকায় এর বেশী যাবে না, আর 'পুরী হোটেল দশটাকা নিই।'

মুখার্জি ট্যুরিস্টের বলরাম বাঁচিয়ে দিল পরিস্থিতি। 'ওই যে রবি আসছে— থাপারের কেয়ারটেকার।' এবং রবি এল। সাইকেল থামিয়ে— আপনারা, তিন নম্বর আর চার নম্বর রুম তো! এত দেরী হল!

দ্বিতীয় ঝনঝাট হল স্টোভ আর বেডশিট নিয়ে। একটা স্টোভও জ্বলে না। প্রত্যেকটা বেডশিটই দুর্গন্ধময়; অপরিষ্কার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অপদার্থ ও দালালে পরিণত হল রবি। প্রচুর স্টোভ ও প্রচুর বেডশিট এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবি পালালো।

এর কিছুক্ষণ পরে ফুরিয়ে গেল জল।

আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এসব ব্যাপার নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও হবে এখন। আপাতত সবাই মিলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকি। রাস্তায় দোকান থেকে যাই হোক খেয়ে নিলেই হবে।

অতঃপর অপদার্থ চূড়ামণি প্রমাণিত হলাম আমি। রত্নার ট্রাভেলাইট বয়ে বয়ে আমার তখন কাঁধ কনকন করছে। যা ভারী!

কাজের মেয়েটার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করল শ্বেতা। দিদি ভয় পেল; মেয়েটা রেগে মেগে চলে গেলে আমরা এখানে বাসনমাজার লোক পাবো কোথায়! রত্না স্টোভ সারালো দেড় ঘণ্টা ধরে। খুঁজে খুঁজে দুটো স্টোভ ভাড়াও করলাম আমি। সেগুলোও জ্বলল না। সব পলতেগুলো পাড় ছেঁড়া দিয়ে তৈরী করে পরিয়ে টরিয়ে সবে যখন স্টোভটা জ্বেলে চা বানিয়েছে রত্না, তিনটে ভালো ভালো স্টোভ নিয়ে রবি ফিরে এল। বেডসিট ধোপা না এলে হবে না। খুব মন খারাপ।

দোতলার বারান্দা থেকে জোনা বলল— জলের পাম্প ওই ঘরের ভেতরে। ঘরের চাবিটা আমাদের দিয়ে যেতে বলুন।

প্রস্তাব শুনে রবি একগাল হাসল। তা কি হয় বাবু! অধর্ম হবে না?

কাজের মেয়েটার নামে লম্বা নালিশ ঠুকলো শ্বেতা। রবি উল্টে নালিশ ঠুকলো মেয়েটারই নামে, আমার নামে আমার বাবাকে কি বলেছে জানেন? আমি নাকি সমুদ্রের ধারে বসে প্রেম করি আর মদ খাই! ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যে মেয়েটাকে রেখেছিলাম, আমি নাকি তার সঙ্গে ভালোবাসা করি। এইসব বাবাকে গিয়ে বলেছে!

একটুও ঘাবড়ালো না মেয়েটা। সোজা রবির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল— তুমি আমাকে কি বলেছ, জগন্নাথো জানে!

—ওপর থেকে জোনা বলল— অর্ধেক স্নান করা বাকি, এরম সময় যদি জল

চলে যায়, তাহলে কি হবে?

তাহলে কি হবে, রবি?

জগন্নাথ্-থ জানে। বলে, রবি চলে গেল।

বিকেলের আগেই জল এসে গেল। স্নান টান করে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে ভায়রা-ভাইকে চেপে ধরলুম, চলো চা খেয়ে আসি।

কফি করে দিচ্ছি। বলে জোনা রান্নাঘরে চলে গেল।

এই তো চা খেলে। বলে দিদি কোলের ওপর ফেলে দিয়ে গেল মুনিয়াকে।

টিম্‌পাই চিৎকার শুরু করে দিয়েছে— দুধ খাবো না। কৃষ্ণা এক গ্লাশ পাউডার মিল্ক নিয়ে তার পেছনে ছোটাছুটি করছে।

চুলের জট ছাড়াচ্ছে অসীমা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। শ্বেতা বাথরুমে ঢুকে খুব সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়েছে।

রত্না জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। অসম্ভব উদাস।

সুন্দরদা মুনিয়াকে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলল, প্রথম যখন পুরীতে এসেছিলাম, এসব কিচ্ছু ছিল না। মোটে তেইশটা হোটেল ছিল। গুনে দেখেছি।

অনেক কষ্টে সন্ধের মুখে একটু বেরোনো গেল। রত্না হাতে বাজারের থলে ধরিয়ে দিয়েছে। মুর্গির মাংস রাঁধবার উৎসাহ তার নাকি এখনও আছে। অন্যেরা কেউ এখন বেরোতে পারবে না। ক্লান্ত। যাবো না যাবো না করেও রত্না শেষ পর্যন্ত সঙ্গে এল।

স্বর্গদ্বারের মোড়ে আসতে না আসতেই একটা পাণ্ডা— 'পাণ্ডার নাম কি, পাণ্ডার নাম কি' বলতে বলতে পিছু নিল। কোনো উত্তর দিচ্ছি না দেখে শেষমেষ রেগে গিয়ে বলল— গোপন রাখিবি? পাণ্ডারও নাম-অ গোপন-অ রাখিবি! উদ্ধার পাইবি না। পাণ্ডার ছেলে অভিশাপ দিছি— জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়া মরিবি; উদ্ধার পাইবি না! শুনে রত্নার সে কি হাসি। খিল খিল করে হাসল রত্না। ...কে চায় উদ্ধার পেতে, পেয়ে গেলে— মেজদি কথা শোনাবে কাকে!

চাল কিনতে মুদিখানার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে 'পুরনো রত্না কত করে' জিজ্ঞেস করছি, রত্না মাথা নিচু করে অস্ফুটে বলল— রত্না পুরনো হবে কেন!

চিরকাল নতুন থাকবে!

নতুন জায়গায় খুঁজে খুঁজে মুর্গি নিয়ে ফিরতে রাত হল। দিদি বাচ্চাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, বিধ্বস্ত, ওরা সাধারণতঃ কৃষ্ণার কাছে থেকে, মাকে পাত্তাই দেয় না। পুরীতে এসে পর্যন্ত কৃষ্ণা ওদের ধারে কাছে ঘেঁষছে না। তোমাদের এত দেরী হল? দিদি কি গম্ভীর।

খাওয়াদাওয়া মিটল সাড়ে বারোটায়। আমার ঘরে আমি আর সুন্দরদা। পাশের ঘরে বাচ্চাদের নিয়ে মেয়েরা। প্রথম দিন, সমুদ্রের দিকে, যাওয়াই হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাই তুলে সুন্দরদা বলল— পুরী আর সে পুরী নেই। এখন সন্ধেবেলা পুরী হোটেলের সামনে মেলা বসে। আগে নির্জন ছিল সব, শুনশান্ ছিল। পুরী

হোটেলটা যার, সেই ভদ্রমহিলা আগে জামাকাপড় ইস্ত্রি করত, জানো তো? ধূপ বেচতো, তারও আগে; জানো?

নাঃ।

মশারির মধ্যে ঢুকে সুন্দরদা আরও বলল, আলোটা নিভিয়ে দেবে নাকি, ভায়রা ভাই; বাঙালীর ছেলে তাহলে আর মশারি থেকে বেরোবে না! হাজার হোক, বাঙালীর ছেলে তো।

সুন্দরদার হাই তোলা আর পুরনো গল্প আর রান্নাবান্না, শেষদুপুরের দিকে ওরা যখন যেতে চায় সমুদ্রে তখন আমার ঘুমোনো— সন্ধের দিকে ওদের অখণ্ড মনোযোগে জিনিস কেনাকাটা— এর মধ্যে কোথায় সমুদ্র, কোথায় শ্বেতা। বোনেদের নিয়ে এমন মত্ত হয়ে আছে যে স্বামী পদার্থটি কি করছে তার দেখার দরকার নেই। সময় কোথায়।

টিমপাই সমুদ্র দেখেই ভয়ে কৃষ্ণার দুপায়ের ফাঁকে মুখ গুঁজে সিঁটিয়ে দাঁড়াল। তারপর সারাদুপুর নাচল ঝিনুক দেখে— ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে, ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে...।

জোনারা কেউ জলে নামলো না। শুধু কৃষ্ণা একবার কোমরজল ওব্দি গিয়েছিল নিজের চেষ্টায়। জামাকাপড়ের যা অবস্থা হল তাতে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরে চলে গেল একাই।

প্রথমদিন সারাদুপুর আমি ছবি আঁকলাম। ঢেউয়ের, নুলিয়ার, সমুদ্রসীমার। কেউ এসে চটি রেখে গেল, কেউ ক্যামেরার ব্যাগ— 'কোথাও যাবেন না কিন্তু, খুব দামী জিনিস, খেয়াল রাখবেন, আপনার যা ভুলো মন।'

তৃতীয় দিন— টিম্‌পাইয়ের পাঁচ জ্বর এল।

রত্না আর শ্বেতার চেষ্টায়— পরদিন বিকেলে জ্বর ছেড়ে গেল। কন্ডাটেড ট্যুরে গিয়ে রোদ্দুরে ঘুরে—। সবাই বলল।

শ্বেতার সঙ্গে দেখা হত সকালে, বাজারে যাবার পথে।

বাকি সময়টা দেখতে হত সুন্দরের হাই তোলা। শুনতে হত পুরনো দিনের ইতিহাস। আমাদের বাড়িতে একসময় একটা থিয়েটার হল ছিল। সাজঘর ছিল, জানো সোমক! চিংড়ি দিয়ে ভাত খেতে খেতে... এখন ইস্কুলমাস্টারি করলে কি হবে আমার জিব আসলে খুব অভিজাত! আর একদিন এক ব্যাংক চাকুরে বিকেলের দিকে স্বর্গদ্বারের উত্তাল ভিড়ের মধ্যে বিভ্রান্তের মত বলে বসল— জানেন, খবরের কাগজ পাচ্ছি না! একটু আশ্বস্ত করার পর আবার— জেলুসিল পাচ্ছি না! ...সমুদ্রের কাছে যেতে গেলে মানুষের কত কি যে দরকার!

চলে আসার দিন বিকেলে সমুদ্র থেকে ডেকে আনতে হল শ্বেতাকে। সেই দুপুরে নেমেছে। যাবার সময় আমাকে ডেকেছিল। আজকাল আমি সমুদ্রের দিকে ভোররাতেই চলে যাই একা। কাউকে ডাকি না! কে কখন কি মুডে আছে কে জানে! একটা নুলিয়া এসে গড় হয়ে পেন্নাম করে একটা বিড়ি দিল। হুই ঢেউয়ের

মাথায় যাবেন, চলুন। পাঁচ টাকা ?— চলো। কতদূর যে নিয়ে গেল রবারের গোল লাইফসেভারের মাঝখানে বসিয়ে! পেছন ফিরে দেখি, বিরাট একটা ঢেউ আসছে তিনতলা সমান উঁচু! কি হবে গো, পিটু ? কি আবার হবে ? 'জয় জগন্নাথ' বলে পিটু আমাকে তুলে দেয় ঢেউয়ের মাথায়। কানের পাশ দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ নেমে যায় নিচে। পাড়ে ভিড় জমে গেছে। বাবু আপনি চান করছেন কত লোক দেখছে। আর পাঁচটা টাকা বেশী দিবেন বাবু! সেকি! পিটু— তোমার মনে মনে এই ছিল, আগে পাড়ে নিয়ে চলো। না বাবু, দশটাকাই দিবেন। আপনি লোক ভালো। আপনার হাতে ধরি।

যখন ফিরলাম তখন ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যাচ্ছে রত্না। বাহ্, বেশ। ঘুরে এলেন দিব্যি!

দুপুরে শ্বেতা যখন সমুদ্রে— ঘুম এল না ভালো— মনে হতে থাকল, গেলেই হত। আজই তো ফিরে যাবো সন্ধেবেলা— দুজনে একসঙ্গে সমুদ্রে স্নান করা আর হয়তো জীবনে হবে না। তারপরই মনে হল— দূর, হাঁটুজলে যেতে না যেতেই শ্বেতা বলবে— আর যেও না, এই, আর যেও না!

তার চেয়ে কাজুবাদামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নাঙ্গাবাবার আশ্রমই ভালো; গির্নারি পাহাড়ে। ছিমছাম, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন আশ্রম। পাঁচ টাকা দিয়ে "নাঙ্গা-বাবার বাণী" কিনলাম একটা। এক বৃদ্ধা বসেছিলেন একা; বললেন— শিশুকে জোর করে খাইয়ে না দিলে শিশু কি খায়!

পাতা ওল্টাতেই দেখি— ঈশ্বর হল অবিদ্যাশক্তির সঞ্চারক।

এই, শ্বেতা, উঠে এসো। দুপুর থেকে সমুদ্রের ধারে একা একা তুমি কি করছো ? উঠে এসো।

আমার সঙ্গে আসার তো কারও সময় হল না!

আমি যখন আসতে বলি তখন তো তোমার সময় হয় না!

আমি এখন যাবো না।

এর বেশী দেরী করলে ট্রেন পাবো না শ্বেতা। উঠে এসো।

সর্বাঙ্গে বালি। ইস, এক দিনেই কী কালো হয়ে গেছে শ্বেতা। দাঁড়িয়ে থাকার আর শক্তি নেই। সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে বুড়িদের মত বসে আছে। উবু হয়ে।

ঢেউ নয়, ফেনা এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে নিতম্বপ্রদেশ। তাতেই সে সুখী।

নুলিয়া নেবে ?

না— চিৎকার করে উঠল শ্বেতা।

তুষারাবৃত

'ওমা, এতো ঝুলন'—বলে উঠেছিলে তুমি, ম্যালের রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, সিমলায়, মনে আছে? আমার মনে আছে। সন্ধেবেলা, অবশ্য পাহাড়ি এলাকায় অল্প সন্ধেকেই অনেক রাত্রি বলে মনে হয়; এখানেও তাই হচ্ছে; কন্ডাকটেড ট্যুরে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা সারাদিন — শরীরে তার সামান্য ক্লান্তি; মনে কোনো ছাপ নেই অবশ্য সে ক্লান্তির একেবারেই; তোমার সঙ্গে, অনেকদিন পরে, ঘুরে বেড়াতে পেরে, মন বেশ প্রফুল্লই ছিল, উৎফুল্লও বলা যায়। এই সন্ধেবেলা, ম্যালের এক ধারে দাঁড়িয়ে, এখানে আলো নেই বেশি, লোকজনও ঘরে ঢুকে গেছে যে যার, শুধু আমরাই ঘুর ঘুর করছি এদিক ওদিক, বেশ চার দেওয়ালের বদ্ধতায় ঢুকে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই এখনই, যেন খোলা আকাশের নিচে এই এলোমেলো পাহাড়ি পথে যদি আরও কিছুক্ষণ থাকা যায়.....আনন্দ নিঙড়ে নেওয়া যাবে আরো কিছুটা — তুমি কিন্তু বেশ তৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলে ম্যালের কিনারে, কাছে দূরে ছড়ানো পাহাড়—দূরে কোনো ছোট্ট গ্রাম থেকে মিটমিটে আলোর ইশারা। দেখা যাচ্ছে হয়তো—দিনের বেলায় অদ্ভুত পরিষ্কার নীলবর্ণ ছিল যে আকাশটা এখন তা-ই কেমন হারিয়ে গেছে অন্ধকারে, থিক থিক করছে নক্ষত্র যেখানে সেখানে; যেন ছুঁয়ে দেওয়া যাবে। পেড়ে আনা যাবে যাকে খুশি— এই সব দেখতে দেখতে, অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর—তুমি হঠাৎ অস্ফুট, আত্মগত স্বরে, বলে উঠলে, 'ওমা, এতো ঝুলন।'

কোথা থেকে যেন একটা বিদেশী বাদ্যের সুর ভেসে আসছিল। এ ছাড়া, নিজেরা কথা না বললে, চারিদিকে শান্তিময়, নিস্তব্ধতা। শান্তিময়? চার পাশের ছড়ানো পাহাড়ে, অন্ধকারের উপস্থিতিতে — নীরবতার বিরাজমানতায় — যে আপাত প্রশান্তি, প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, মনের অভ্যন্তরে, গভীরে, গহনেও কি তাই? না বোধহয়। অবাধ্য মন, নিয়ন্ত্রণের অতীত—সে বরাবরই, কেবলই নিজের নিয়মে চলে। এই আবছায়ায়, এই আলো-আঁধারিতে, সিমলার এই সন্ধেবেলার প্রায়ান্ধকার ম্যালে দাঁড়িয়ে আমার এই চির-অবাধ্য, চির-অশান্ত মন, প্রকৃত অর্থে—ঠিক তোমাকেই কি চায়? এই তোমাকে, যে-তুমি দাঁড়িয়ে আমার ঠিক এক হাতের মধ্যে—রেলিঙে হেলান দিয়ে, অল্প বেঁকে, দূরের প্রকৃতির দিকে হারিয়ে যাওয়া চোখে চেয়ে? না বোধহয়।

মন কেন উচিত-অনুচিত, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক মানে না। এত আয়োজন করে

এতদূর এসে, যে কাছে আছে তাকে ফেলে, মন কেন কাউকে চায়—যে কাছে তো নেই-ই, কখনো থাকবেও না, তার দিকেই কেন চলে যেতে চায় বার বার? একেই কি অভিজ্ঞতা বলে! ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টার নাম জীবন? যা ভাবছি, তা বলা যাবে না? যা করতে মনপ্রাণ চাইছে, তা করা যাবে না কিছুতেই? শুধু মেনে নিতে হবে তাকেই, দশ বারো বছর ধরে দাম্পত্য বাঁধনে যার সঙ্গে এ জীবন বাঁধা।

ঠিক তখনই তুমি বলে উঠলে, 'কী ভাবছো?'

মনে মনে চমকে উঠলেও, ভাব দেখাতে হয়, যেন কিছুই হয়নি। যেন, এরকম একটা জায়গায় এসে, এইভাবে উদাসীন হয়ে পড়াটাই খুব স্বাভাবিক; অত্যন্ত অনিবার্য। কিন্তু, মানি আর নাই মানি, এ কথা তো সত্যি যে, যার সঙ্গে ওঠবোস করি প্রতিদিন, বিগত দশ বারটা বছর ধরে যে বুঝে নিয়েছে আমার প্রতিটি ভঙ্গিমার তাবৎ অন্তর্নিহিত অর্থ—তার কাছে যে কোনো গোপনতাই ধরা পড়ে যাবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে সব, সব জারিজুরি! অতএব, সুতরাং বাধ্যতঃ আশ্রয় নিতে হয় দর্শনের কাছে— ভাবছি, কি কি হল না জীবনে।

এবং তা শুনে, তুমি, অদৃশ্য এক হাসি ঠোঁটে লুকিয়ে রেখে, কেমন বিধাতার মত ঝলে উঠলে, 'আর, কী কী হল জীবনে, এই ছোট্ট মরণশীল জীবনে, সেসব কথা ভাবছ না কেন? আমি তো সেই সবই ভাবছি।' পরের বাক্যটা আরাও মারাত্মক ছিল—সুন্দরের সন্নিধানে এসে, নিজেকেও সুন্দর ভাবতে হয়! অপ্রাপ্তির চিন্তা এক ধরণের মানসিক বিকার।

বুকের ভেতরে যেন গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল কোনো মৃত, অর্থহীন অভিমানের বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। গলে গলে গড়িয়ে যেতে লাগল সব জমে থাকা বরফের স্তূপ, সত্যের উত্তাপে।

যাকে পেতে চাই সে কলকাতায়, মেয়েকে কার্শিয়াংয়ের স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে, স্বামীকে ডিভোর্স করে, ফ্ল্যাট কিনে, চাকরি করে, এতক্ষণ হয়তো বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে, হয়তো ভাবছে না। হয়তো কোনো আড্ডায় তার অনিন্দিতা, শ্বেতশুভ্র হাসি দিয়ে সে এইসময় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে অন্যদের—হয়তো নিজের ফ্লাটে টি ভি খুলে অত্যন্ত অলস শুয়ে আছে সোফায় এলিয়ে।

সে এখানে, এখন থাকলে, সিমলার এই সান্ধ্য অন্ধকারে আবছা ম্যালে, সব শূন্যতা ভরিয়ে, নিজেকে ছড়িয়ে দিতে শুধু গানে আর গানে, কথা বলত অনবরত, হেসে উঠত নিতান্ত যৎসামান্য কারণেই; মঞ্জুলা যেরকম নয় আদৌ; মঞ্জুলা ঠিক বিপরীত। সে শান্ত, গম্ভীর; কথা যদি বলেই—তবে তাকে, তার যে কোনো কথাকে, কথা না বলে বাণী বলাই সম্ভবতঃ ভাল। সে নিজেকে উজাড় করে দেয় না কখনো, উচ্ছল হয় না কিছুতেই, পথে ঘাটে, কার্যক্ষেত্রে, হোটেলে এখানে বেয়ারাদের সামনে—প্রতি মুহূর্তে সুতীক্ষ্ণ খেয়াল রাখছে, রাখেও সে, যে কেউ তাকে কোনরকম অপমান করে ফেলল কিনা বিন্দুমাত্র; নিজস্ব একরকম সম্মান,

সে, মঞ্জুলা—সব সময় পেতে চায় সবায়েরই কাছ থেকে, যা না পেলে তুলকালাম কাণ্ড করে থাকে যখন তখন।....

অথচ পারমিতা, কখনো রাগে না, মজা খুঁজে পায় সব কিছুতেই—হেসে ওঠে যে কোনো প্রসঙ্গে ; মানুষের অবিচার-প্রবণতার বিরুদ্ধে, তার শুধু একটাই অস্ত্র আছে—সেটা তার হাসি। তবে, যত সহজে সে কারও সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে, তাকে ছেড়ে চলেও যায় ঠিক তত সহজেই। তাকে তাই, কিছুতেই, যেন আপনজন মনে হয় না ; যেটা মঞ্জুলাকে সবসময় মনে হয়।...

তাছাড়া, পারমিতার কোনো দায়িত্ববোধ নেই, নিজের সুবিধে ছাড়া সে এই পৃথিবীর অন্য কোন কিছু নিয়েই ব্যস্ত নয় ; দিনের পর দিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও সে যায় না ; শুধুই নিজের খেয়ালে থাকে। আর মঞ্জুলা, একদিন কথার খেলাপ করলে, চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেয় পরের দিন, তার সামনে কোনরকম অমনোযোগী হলে ওঠা সম্ভব নয়।....

—'ঘরে চলো।'

বলে তুমি আলতো করে চাপ দিলে হাতে। যেন এর পরে, বুঝতে পারি—বাইরে থাকা যেতেই পারে না। পারমিতা হলে হয়তো বলা যেত—আর একটু পরে যাব, এখন ওই হোটেলের মধ্যে বন্ধ ঘরে ঢুকতে ইচ্ছেই করছে না। তোমাকে তা বলাও যাবে না। বললে, তুমি হয়তো বাণী দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠবে, সময়ে দাঁড়ি না টানলে কোনো ভালোই আর ভালো থাকে না ততটা...।

হোটেলে, আমাদের ঘরের জানলাটা থেকে—এয়ারপোর্ট দেখা যায়। সিগারেট খেতে খেতে সে জানলা দিয়ে বাইরেটাকে যতটা দেখা যায়, পাওয়া যায়, ঘরের ভেতর থেকে সে চেষ্টায় মগ্ন হয়ে আছি—কাল চলে যেতে হবে, এরকম একটা জানলা যে জীবনের আবার কবে আসবে কে জানে ; হয়তো এই শেষ, হয়তো আসবে না আর—কলকাতার কাজ-বাড়ি-আড্ডার চেনাজানা গণ্ডির বাইরে আবার যে বেরুনো যাবে কবে। দ্রুত খেয়ে নিয়ে রাতের পোশাকে সেই যে তুমি বিছানায় চলে গেলে, আর কোনো সাড়াও দাওনি তারপর থেকে। শুধু একবার, আমাকে ক্রমাগত জানলায় দাঁড়িয়েই থাকত দেখে, বলে উঠেছিলে, 'দেরি কোরো না, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু।...'

যেন এও এক ধরনের সাইরেন কিংবা বিপদসংকেত। মঞ্জুলা, একবার ঘুমিয়ে পড়লে, আর তাকে ঘাঁটানো যায় না, নিতান্তই অনর্থ বাধবে তাহলে। .....এই যে স্ত্রীর-ভয়ে-তটস্থ জীবন, এর মানে কি ? চেনাজানার চৌহদ্দি থেকে এতদূরে এসেও কেন মেনে নিতে হবে তার যাবতীয় মেজাজ ও হুংকার, যতই স্তিমিত হোক তার উচ্চারণ ?

—পারমিতা হলে এখন অনেক গান শোনাত, কবিতা বলত। এত সুন্দর একটা জায়গায় এসে, এরকম বোকার মত ঘুমাত না।

বেশ মরিয়া হয়ে বলে ফেলি। যতটা উত্তেজিত দেখব ভেবেছিলাম মঞ্জুলাকে,

এ নির্মম, নির্লজ্জ উচ্চারণ শুনে—তার দশভাগের এক ভাগও অন্ততঃ প্রকাশ করে না মঞ্জুলা। অর্ধনির্লিপ্তই বলা যায় তাকে, যে চোখে একবার আমাকে দেখে সে বলে—তাহলে তার ধ্যান করেই বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দাও ওখানে দাঁড়িয়ে। ছোট্ট, একটা হাই তোলে সে তারপর .... আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

হায় সিমলা। যে হাহাকার আমি লুকিয়ে রেখেছি নিঃশব্দে বিগত বারটা বছর ধরে, সিমলা পর্যন্ত এসেও তা কাটল না। আমার জন্য মঞ্জুলার কোনো উন্মাদনা নেই, নেই কোনো অতিরিক্ত, অপর্যাপ্ত আবেগ। ....অন্য নারীর প্রতি আমার দুর্বলতার কথা জেনেও সে শান্ত থাকে। থাকতে পারে।

আমি জানি, এটা তার অভিনয় নয়। উপেক্ষা।

কলকাতায় ফিরে অফিসে জয়েন করার দু-এক দিনের মধ্যেই হঠাৎ পারমিতার টেলিফোন।

—'কী ব্যাপার—তোমার কোনো ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না ক'দিন ধরে—কেউ বলতে পারছে না তুমি কোথায় গেছ—হঠাৎ কোথায় চলে গেস্‌লে বল তো ?'

—'এই, কুলু-মানালি-সিমলা...'

—'সস্ত্রীক ?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'ঝগড়া করেছ? আমাদের তো বাইরে গেলেই ঝগড়া হত। বাড়িতে তো হতই, বাইরে গেলে আরো; দিনরাত্তির খালি ঝগড়া আর ঝগড়া—ওহ্ কতদিন ঝগড়া করি না।'...

—'করলেই পারো।'

—'নিজের হাজব্যান্ড ছাড়া আর কারও সঙ্গে ঝগড়া করে ঠিক জুত হয় না জান ? যাক্‌গে ওসব কথা থাক। আজ সন্ধেবেলা অলীকের বাড়ি আসতে পারবে ?'

—'হঠাৎ ?'

—'অলীকের মেয়ে হয়েছে। সবাইকে খাওয়াবে ?'

—'তাহলে তো কিছু কিনে নিয়ে যেতে হয়....'

—'ধুৎ, সে তো বৌ-মেয়ে ফিরলে; এখন তো বাড়ি খালি।'

—'ওহ্, সেই সুযোগে তোমরা...'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি চলে এস। নাকি বৌ বকবে ?'

কোনো উত্তর দিচ্ছি না দেকে পারমিতা আবার বলে, 'কী হল ? আসবে না ? সবাই না থাকলে আমার ভাল লাগে না, জান তো।'

—'ঠিক আছে। যাব।'

বলেই টেলিফোনটা রেখে দিই। হুল্লোড়বাজ পারমিতার আড্ডার সঙ্গী হতে আর ভালো লাগে না। আমার অন্য পারমিতাকে দরকার ছিল। যাকে আর পাওয়া যাবে না কোনোদিন।

সন্ধেবেলা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকি। মঞ্জুলা এসে

কোনো প্রশ্ন না করেই এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। আলো জ্বেলে দেয়।

—'অকারণে মন খারাপ করাকে দুঃখবিলাস বলে।'

বাণী দেওয়া ছাড়া কি মঞ্জুলা আর কিছু জানে না ? এর চেয়ে অলীকের বাড়ির হৈ হুল্লোড় অনেক ভাল ছিল না কি ?

কোনো কথা না বলে, নিঃশব্দ, চা-টা শেষ করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, বুক-সেলফ্ থেকে একটা অনেক পুরনো হেডলি চেজ বের করে, সেটা নিয়ে শুয়ে পড়ি।

যে কোনো রকম একটা উত্তেজনা তো অন্তত দরকার জীবনে।

অরাজনৈতিক

অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, দেরী হবে। ট্যাক্সির ব্যাক সিটে শুয়ে, পা মুড়ে, সারা রাস্তা—তিন ঘন্টা, এই একভাবে এসেছেন। পেচ্ছাপ পেতেই পারে। নার্সিং-হোম থেকে একটা গামলা দিয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বললে ভর্তি করা যাবে না। অন্যেরা বলছে সেসব। অম্বিকাপ্রসাদ চিঁচিঁ করে বললেন, পেচ্ছাপ করবো। আর পারছি না। ছেলে বিমলাপ্রসাদ অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠেছিল— একটু পরেই তো তুমি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে যাবে। তখন বেডে শুয়ে শুয়ে করতে পারতে। বেডপ্যান দিত। এতক্ষণ থাকতে পারলে আর একটু.....। কথা শেষ করার আগেই ওই ক্ষীণ কণ্ঠেই ধমকে উঠলেন অম্বিকাপ্রসাদ—বলছি তো আর পারছি না। এখুনি একটা ব্যবস্থা কর। ধমকটা আর্তনাদের মত শোনালো। নার্সিং-হোম থেকে একটা গামলা দিল। ট্যাক্সির দরজাটা খুলে প্রকাশ্য দিবালোকে সেটা বাবার দুপায়ের ফাঁকে ধরে রইল বিমলাপ্রসাদ। পথচারীরা ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। গামলাটা ধরে থাকতে বিরক্ত লাগছিল। লজ্জা, অস্বস্তি। অথচ কিছুই হচ্ছে না। বিমলাপ্রসাদ প্রায় চাপা স্বরে চিৎকার করে উঠল—কি হল ? অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, দেরী হবে।

তাহলে এত হাঁপাচ্ছিলে কেন—কথাটা বলতে গিয়েও বলল না বিমলাপ্রসাদ, বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল। বেঁকাচোরা একটা তালের মত, দু-পায়ের ফাঁকে, পেচ্ছাপ যেখান থেকে বেরোবে সেখানটা দেখাই যায় না প্রায়। পাঁচ-ছ বছর আগে অপারেশন করাতে গিয়ে সুগারের জন্য, লো প্রেসারের জন্য শেষ পর্যন্ত অপারেশন করল না ডাক্তার। হাইড্রোসিল বাড়তে বাড়তে এখন অসম্ভব আকার নিয়েছে। দু-এক মিনিটের চেষ্টায় টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গামলায়। এর জন্য এত। অস্পষ্টভাবে বিমলাপ্রসাদের মনে হল—তার যাবতীয় অস্তিত্বের উৎপত্তি ওই অঙ্গ থেকে। তার সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, বিরক্তি, রোগবালাই—সবেরই উৎপত্তি ওইখান থেকে। যখন উৎপত্তি হচ্ছিল এই বিমলাপ্রসাদের, তখন কে জানতো — একদিন তাকে এইভাবে গামলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

বাবার ওপর চিরকালই কেমন একটা অন্ধ রাগ আছে বিমলাপ্রসাদের। কেন কে জানে। সম্ভবতঃ খুব কমবয়সে হাত ধরে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার জন্যই। কলেজ লাইফেও গাধার মতন খেটে গেছে বিমলাপ্রসাদ। সন্ধ্যেবেলার কলেজে কোনো প্রাণ ছিল না। হাতে কাঁচা পয়সা পেয়ে তার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেল

বিমলা। নেশার পিচ্ছিল পথে নেমে কুয়াশাঘেরা জীবনে ঢুকে পড়ল নিজেরই অজান্তে। হোস্টেলবাসী বন্ধুদের মদতে প্রায় দিনই বাড়ী ফিরতো না বিমলা। সেসব দিনে সাতসকালে ছেলেকে খুঁজতে বেরোতেন অম্বিকাপ্রসাদ। তখন বিরক্ত লাগতো খুবই। একগাদা ভাইবোন ভর্তি অভাবের সংসারে মন বসতো না বলে বন্ধুদের হোস্টেলে নেশার স্বর্গ খুঁজে বেড়াতো বিমলা। সেসব দিনে নেশা জড়ানো চোখে ঘুম ভেঙে বাবাকে দেখতে বিরক্ত লাগারই কথা। কিন্তু কথাটা মনে পড়ে এখন বেশ ভালোই লাগল।

অন্য ভাইবোনেরা কেউ বিমলাপ্রসাদের মত এলোমেলো নয়। সেকারণেই সম্ভবতঃ তাদের নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা ছিল না অম্বিকাপ্রসাদের। কিছুটা গোলমেলে বলেই সম্ভবতঃ বিমলাপ্রসাদকে তিনি ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশী।

বেশ কিছুক্ষণ পর অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, হয়ে গেছে। নার্সিং হোমের লোক গামলাটা নিয়ে চলে গেল। ডাক্তারের পারমিশন পাওয়া গেছে জানা যেতে একটা পাল্কির মত ডাঁটি লাগানো হাতলওয়ালা চেয়ার চলে এল নার্সিংহোম থেকে। অম্বিকাপ্রসাদ নিজেই সেই চেয়ারে এসে বসলেন ধীরে সুস্থে। যেন কোনো কিছুতেই তাঁর আর কোনো আপত্তি নেই।

ছোটবেলায় একবার প্লুরিসি হওয়া ছাড়া সারা জীবনে বড়সড় অসুখবিসুখ বলতে তেমন কিছুই হয়নি অম্বিকাপ্রসাদের। সত্তর পেরিয়ে এই হাইড্রোসিল, সুগার, লো-প্রেসার আর এই দিন পনেরো হল পা-ফোলা, পেট ফোলা আর অরুচি। কিছুই খেতে পারছেন না ভালো করে। যে লোকটা পাগলের মত খেতে ভালোবাসে সে কিছুই প্রায় খাচ্ছে না। উল্টে ফুলে যাচ্ছে পা ও পেট। তাতেই ভয় পেল সবাই। সোজা গ্রামের বাড়ি থেকে নার্সিং-হোম।

অসুখটা যে ক্যানসার, অ্যাবডোমিনাল—সেটা জানা গেল বিমলার প্রায় ষোলো হাজার টাকা শেষ হয়ে যাবার পর। কোনোরকম টেষ্ট যখন আর বাকি নেই, ডাক্তার তখন বললেন—ফুলে থাকা অ্যাবডোমেন থেকে ফ্লুইড নিয়ে একবার টেষ্ট করবো। মনে হচ্ছে.....। হলও তাই। রিপোর্টে পরিষ্কার লেখা—ম্যালিগন্যান্ট সেল সীন।

বিমলাপ্রসাদ লক্ষ করল, তার পরের ভাই টাকা দেবার ভয়ে বাবার সঙ্গে দেখাই করল না নার্সিং-হোমে। তার ওপরের দাদা, প্রবাসী. দিল্লীতে চাকরি, টেলিগ্রাম পেয়ে, ট্রেনে রিজার্ভেশন না পেয়ে— জেনারেল কম্পার্টমেন্টে অনেক কষ্ট করে এসে বলল—তাড়াতাড়িতে মাত্র তিন হাজার আনতে পেরেছি। কাকারা নানান অজুহাত দিয়ে কেটে পড়ল। সবায়েরই বিপন্নতা বিবিধ। অম্বিকাপ্রসাদ মারা গেলে অন্য কথা ছিল। তিনি তো এখন জীবিত।

বেশ-তিরিক্ষি মেজাজেই অফিসে বসে ছিল বিমলাপ্রসাদ। মাঝারি ধরনের এক্সপোর্ট-ফার্ম। মাইনে খুব একটা ভাল না হলেও যখন তখন মালিকের কাছ থেকে ধার পাওয়া যায়। নেশার জন্য আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের একটা অভ্যাস ছিলই বিমলার। বাবার অসুখের জন্য এক কথায় কুড়ি হাজার টাকা ধার সে পেয়ে গিয়েছিল আগেই।

নার্সিং-হোম থেকে ক্যান্সার হসপিটালে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিল সে, আর তার জন্য আরও দশ হাজার টাকা চাইবে বলেও ভাবছিল। টাকার ব্যাপারে সবাই যেভাবে হাত গুটিয়ে নিল, তাতে হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল বিমলাপ্রসাদ। অনেক বোকামি হয়ে গেছে। আর নয়। এবার একটু বুদ্ধিমান হওয়া দরকার। মালিক ধার চাইলেই দেবে। কিন্তু সে তো শুধু খাটিয়ে মারার সুবিধের জন্যে। অনেক ভালো চাকরি পেলেও ছেড়ে যেতে পারবে না। এই রাজনীতি।

পৃথিবীতে আসলে সবাই সবাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনীতি করে চলেছে সবসময়। এরবাইরে কোনো সুস্থ বা স্বাভাবিক ভালোবাসা বলে কিছু হয় না। মা-ও পেটের ছেলের সঙ্গে রাজনীতি করে। ভাবছিল বিমলাপ্রসাদ। এই যেমন আমার মা আমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে বসে আছে। স্রেফ টাকার জন্যে। টাকা। আমার বড় ছেলে দিয়েছে। মেজ ছেলে দিয়েছে। তুই কেন দিবি না। এই হল ব্যাপার। প্রেস্টিজ ফাইট। অন্ততঃ নিজের সঙ্গে নিজের। মানুষের সব সুখ-দুঃখই আসলে নিজের সঙ্গে নিজের। অন্যকে কতটা গুরুত্ব দিতে হবে তা তো আর কেউ বলে দেয় না। বরং গুরুত্ব জিনিসটা সবাই শুধু পেতেই চায়। দিতে চায় না কেউ। অন্যকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয় যারা, কিছুটা কাদা ছিটিয়ে দেয় অন্ততঃ সেটা দেবার আগে। বাবার অসুখের জন্য টাকা দিতে পারল না যারা, তারা অন্ততঃ বলে তো গেল—রায়পুরের দেড়শো বিঘে ধানজমি গেল কোথায়। সবই তো তোমাদের ছিল।

কি যে কোথায় যায়। সরকারই তো নিয়ে নিল অর্ধেকেরও বেশী। জমিদারি বিলোপ হল, বর্গা হল, পিসিদের বিয়ে দিতে বাবা বিক্রি করে দিল বাকি সব, মাঝখান থেকে ভাগচাষীরা জলের দরে নিয়ে নিল যা পেল। এরকম একজন ভাগচাষীর ছেলে তপন। তার বাবা ছিল অম্বিকাপ্রসাদের ভাগচাষী। সস্তায় অনেক জমি পেয়েছে বলেই হোক, বংশপরম্পরায় তারা রায়বাড়ীর মানুষের অন্ন খেয়ে আসছে বলেই হোক, রোজ তাদের কেউ না কেউ একবার না একবার রায়তবাড়ীতে ঢোকে। বাস্তব প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের প্রকারভেদ তো পাল্টায়। তপন আসে টিভি দেখতে। তাদের মাটির ঘর। রায়বাড়ীর দোতলায় শানের মেঝেতে খালি গায়ে গড়াগড়ি খেলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয় গরমের দিনে সন্ধ্যেবেলা। অম্বিকাপ্রসাদকে নার্সিংহোম থেকে পাড়ার সরকারি হাসপাতালে সকলের সম্মতিক্রমে নিয়ে আসার পরে—সবাই যখন এসে দেখে যাচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনেরা একবার করে—একদিন তপনও এল। সুদর্শন, সুসজ্জিত হিসেব করে কথা বলা, শিক্ষিত, সতর্ক পালিশ-মারা লোকজনের মধ্যে মূর্তিমান ছন্দপতন যেন, তপন এল। কালো কুচকুচে, বেঁটে, শক্তপোক্ত, জামাকাপড় যথেষ্ট ভাঁজ করা নয়, প্যান্টে ইস্ত্রি নেই, চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা তপনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল বিমলাপ্রসাদের খুড়তুতো ভাই অমলাপ্রসাদ। কুতকুতে চোখে, বিমলাপ্রসাদের বাসার দরজায় দাঁড়িয়েই ভারী সাদাসিধে প্রশ্ন করল তপন—বড়বাবু ভালো আছে?

বরানগরে, বিমলাপ্রসাদের বাসায় স্থানীয় জেনারেল হাসপাতালে, মৃত্যুর জন্য

অপেক্ষমান অম্বিকাপ্রসাদকে ভর্তি করে দিয়ে, সকলে প্রহর গুণছিল, কখন শেষ খবরটা আসবে। অম্বিকাপ্রসাদ তাদের কারও বাবা, কারও স্বামী, কারও কাকা, কারও মেসোমশাই বা পিসেমশাই, কারও মামা। সুদূর রায়পুরের চাষাভুষো লোকজনদের কাছে তাঁর যে অন্য আর একটা পরিচয় ছিল, সেটা মনে ছিল না কারও। 'বড়বাবু' ডাকটা শুনে দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্ত্রী রঞ্জাবতীর। বললেন—কে? তপ্না এলি। আয়। যেন স্বামীর আসল অস্তিত্বের পরিচয়বাহী একজন মানুষ পাওয়া গেছে। চারপাশের আত্মীয়-স্বজনের ভুল ভিড়ে তাঁর খুব অনাথ লাগছিল নিজেকে।

—একমাসের উপুর হয়ে গেল কোনো খপর নেই, আমি তাই অম্লাকে বন্নু—আমায় নিয়ে চ। বড়বাবুর অবস্তা নিচ্চয় ভালো নয়। তপন বলল।

—তুই বোস। অদ্দুর থেকে এলি। হাত-পা ধুয়ে নে। রঞ্জাবতী নিজেকে ফিরে পেলেন প্রায়।

তিনি জানেন, কেউ না থাকলেও, আজ তপন একাই সারারাত জেগে জেগে পাহারা দেবে তাদের বড়বাবুকে। যদিও তপন তার নিজের কেউ নয়। আর যারা তাঁর নিতান্ত নিজের লোক, আত্মীয়, তারা সব ভদ্রতা সেরে যে যার বাড়ি চলে যাবে।...

গ্রামের বাড়ীতে হঠাৎ টিউবওয়েল খারাপ হয়ে গেলে সারিয়ে দিয়ে যায় তপন। ক্ষেতে নতুন শসা হলে ঝুড়ি ভর্তি করে দিয়ে যায় তপন। যখন তখন যে কোনো দরকারে খবর পাঠালেই ছুটে আসে। যে কোনো কাজ বললে মুখ বুজে করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। অথচ সংসার আছে তারও। ব্যস্ততাও আছে। ক্ষেতের কাজ তো আছেই সারাবছর। তবু 'বড়বৌদি' ডাকলে তপন আসবেই। রায়বাড়ীর সঙ্গে তাদের যে জন্ম-জন্মান্তরের যোগ। সেই তপন এসেছে কলকাতায়। তাদের বড়বাবুকে দেখতে। মনটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল রঞ্জাবতীর।

বিমলাপ্রসাদের এক পুলিশ-কাকিমা অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তাঁকে। জেঠতুতো খুড়তুতো দু-তিন জন মাসীও একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সমানে। এসবে শান্ত হওয়ার চেয়ে রঞ্জাবতী বিরক্ত হচ্ছিলেন বেশী। স্বামীর মৃত্যু হলে ঠিক কেমন লাগে সে অভিজ্ঞতা যদিও কারও নেই, তবু প্রত্যেকেই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে নানারকম। এক পিসেমশাই হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসে তো চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন রীতিমত—তোমরা ঘরে বসে আছো? শিগ্‌গির যাও, দুধ গঙ্গাজল দিয়ে এসো, এই যায় সেই যায় অবস্থা দেখে এলাম। নিজেকে কঠিন করে রঞ্জাবতী বললেন— আজ এগারো দিন ধরে ওই একই রকম চলচে। এখন গেলে বাঁচি। এর আগে কলকাতার নার্সিংহোমে কুড়ি দিন ছিল। কিচ্ছু খাচ্ছে না....।

সব দেখেশুনে তপন বলল, আমি এক্ষুনি হাসপাতালে যাবো। বড়বাবুকে দেখবো। মনে হল সে শেষ দেখা দেখতে চায়।

বিমলাপ্রসাদ তপনের সমবয়সী। তপনকে সে-ই হাসপাতালে নিয়ে গেল। যেতে

যেতে তপন বলল, বড়বৌদি ওরাম করে বলচে কেন ? গেলে বাঁচি ? বিমলা বলল, এন্তার খরচা হচ্ছে তো। তাই। তপন বলল, খরচার জোগান হচ্ছে না ? বিমলা বলল, হচ্ছে—তবে অনেক কষ্টে। বাবা তো কিছু রেখে যায়নি। তপন খুব সহজ গলায় বলল, কেন—তোমাদের তো রেখে গেছে।

মনে মনে চমকে উঠল বিমলাপ্রসাদ। বার বার ব্যবসা করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বিষয়সম্পত্তি সব শেষ করে দেওয়ার জন্যে বাবার ওপর তার চিরকালের রাগ। সেই কোন ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার সব খরচ নিজেকেই জোগাড় করতে হয়েছে তাকে। ছোটখাট কত রকম চাকরিই যে করতে হয়েছে। রায়পুরের রায়বাড়ির ছেলে হয় কলকাতা শহরে ভিখিরির মত....। পড়তে হয়েছে সন্ধেবেলার কলেজে। বাবা যদি করিৎকর্মা মানুষ হত, এমন আলাভোলা না হত—বিমলাপ্রসাদ কি আর একটু ভালোভাবে মানুষ হতে পারতো না ? এসব ভাবলেই একটা ভীষণ রাগ হত বাবার ওপর। এখন মনে হচ্ছে— তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা থেকে স্রেফ নিজের চেষ্টায় অনেক বড় হয়েছে অনেক মানুষ। প্রতিকূল পরিস্থিতি বরং তাদের জেদ ও একাগ্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক। আগেকার মত স্বচ্ছলতা থাকলে হয়তো আরও বখে যেত বিমলাপ্রসাদ। কিন্তু এখন একজন অশিক্ষিত চাষা যা বলল তাকে, তাতে সে নাড়া খেয়ে গেল রীতিমত। সত্যিই তো, সে কানা নয়, খোঁড়া নয়, অথর্ব নয়; বুদ্ধি বা প্রতিভা তারও কিছু কম ছিল না। অভিমান করে নিজেকে নষ্ট না করে ইচ্ছে করলে সে তো সারা পৃথিবীটা জয় করলেও করতে পারতো। কেউ তাকে বারণ করেনি। মানুষ কেন যে এত আটকে থাকে।

ঠিক চারদিন হল অম্বিকাপ্রসাদ কাউকেই চিনতে পারছেন না। শূন্য চোখে চেয়ে থাকছেন শুধু। মুখে দুধ গঙ্গাজল দিলে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তপনকে কিন্তু চিনলেন ঠিক। আশ্চর্য শান্তির ছায়া নেমে এল চোখেমুখে। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শুরু হল গ্যাসপ্রিং। আধঘন্টার মধ্যে সব শেষ। তপন দাঁড়িয়ে রইল বিছানার পাশে। বিমলাপ্রসাদ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাইরে মাঝে মাঝে। অথচ তপনের কোনো বিকার নেই। শেষবার হেঁচকি তুলে যখন স্তব্ধ হয়ে গেলেন অম্বিকাপ্রসাদ, তপন শান্তভাবে বলল— চলো ভাইপো বাড়ীতে খপর দিতে হবে।

তবে কি তপনের জন্যেই এতদিন বেঁচে ছিল বাবা ! শুধু তপনের সঙ্গে বাবার সম্পর্কের মধ্যে কোনো রাজনীতি ছিল না তাহলে !

মৃত্যু মানুষকে গম্ভীর করে। বিষণ্ণ বা উদাসীন করে। আবার মুক্তিও দেয়। রঞ্জাবতী কাঁদলেন না একটুও। ভেঙেও পড়লেন না। পাথরের মূর্তির মত শান্ত হয়ে গেলেন শুধু। বললেন, দুটো শাদা থান নিয়ে আয়। বড় ছেলে শংকরীপ্রসাদ বলল, আমি যাচ্ছি। বিমলাপ্রসাদ দাদার সঙ্গে বেরিয়ে দোকান দেখিয়ে দিতে গেল। একটা ম্যাটাডোরও ভাড়া করতে হবে। অনেকগুলো টেলিফোনও করতে হবে।....

শ্মশানেও রাজনীতি। ঘুষ। শ-দুয়েক টাকা দিলে সাত-আট জনের আগে চুল্লিতে তোলা হবে। অনর্থক অপেক্ষা করতে হবে না। দূর দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়স্বজনের

মুখ চেয়ে রাজী হয়ে গেল বিমলাপ্রসাদ। এক পুলিশ-কাকু সারাক্ষণ শুধু—একশো টাকার একটা নোট কোথায় পড়ে গেল—বলতে বলতে খুঁজে বেড়ালেন সারা শ্মশান।

কাশীপুর মহাশ্মশানের পাশেই গঙ্গা। সেখানে কলসীভরা অস্থিভস্ম ভাসিয়ে দিয়ে মনে হল একটা মানুষ তাহলে সত্যিই শেষ হয়ে গেল। বিমলাপ্রসাদ দেখল, দাদা শংকরীপ্রসাদ অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্ত। প্রবাসী বাঙালী। কদিন আগে, কলকাতার নার্সিংহোমে ডাক্তারকে বলছিল—আর কতদিন, মানে, এভাবে.....। ডাক্তার প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেননি। বলেছিলেন—ঠিক কতদিন ভুগবে তা কি করে বলবো বলুন। শংকরীপ্রসাদ তখন একদম সরাসরি বলেছিল—বাবার এই ভোগান্তিটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় না। ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—আমরা মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করি মিঃ রায়। শংকরীপ্রসাদ তার পরেও বলেছিল—কিন্তু আপনিও জানেন, আমরাও জানি—আমাদের বাবা বাঁচবে না। খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ কি।

ডাক্তার তার পরই বলেছিলেন, আপনারা পেশেন্টকে লোকাল হসপিটালে নিয়ে যান। এখানে রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

এখন সেই শংকরীপ্রসাদ অত্যন্ত গম্ভীর। পরিণতি যতই জানা যাক, বাস্তবের মুখোমুখি হলে মানুষ অল্পবিস্তর বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

দুধগঙ্গাজল যখন চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, বিমলাপ্রসাদ তখন একদিন লক্ষ করেছিল দূর থেকে — দাদা খুব করে খাওয়াবার চেষ্টা করছে বাবাকে। হঠাৎ কার কোন আবেগ জেগে ওঠে কে জানে। বৌ-ছেলে নিয়ে দূরে থাকে। মা-বাবাকে বছরের পর বছর দেখতেই পায় না। হঠাৎ মনে হয়েছিল হয়তো, যে মানুষটা চলেই যাচ্ছে, তাকে নিজের হাতে অন্তত দুধগঙ্গাজল...। তখন অবিরত অশ্রু ঝরছিল শংকরীপ্রসাদের দুচোখ বেয়ে—দূর থেকে লক্ষ করেছে বিমলাপ্রসাদ। কাছে গিয়ে বিরক্ত করেনি। শুধু মনে হয়েছিল, এই মানুষই কয়েকটা দিন আগে নার্সিং হোমে নিজের বাবার দ্রুততর মৃত্যুর উপায় প্রার্থনা করেছিল। এখন মনে হল, সেসব করেছিল তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটিয়ে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার তাগিদে হয়তো। নিষ্ঠুর বাস্তব আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে মানুষের মনে অনেক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরী হয়। তখন সে কি করবে নিজেও জানে না, জানতে পারে না অনেকসময়।

স্বামী ঋণে জর্জরিত হয়ে যাক, কোনো স্ত্রীই তা পছন্দ করে না। বাবার অসুখ, মৃত্যু, ঘাটের কাজ—বরানগর থেকে গঙ্গা কাছে, কিংবা অন্য ছেলেরা অনেক দূরে দূরে থাকে—যে কোন কারণেই হোক, সব কাজই হচ্ছিল বিমলাপ্রসাদের বাসা থেকে। স্ত্রী অর্কপ্রভা এর মধ্যে একদিন বলেছে—সব দায়িত্বই কি তোমার একার। বিশেষ কোনো উত্তর দেয়নি বিমলাপ্রসাদ। বাবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নিজের পরিবারের সব মানুষকেই সে নতুনভাবে চিনছে। স্ত্রীও মানুষ।

অম্বিকাপ্রসাস মানুষ হিসেবে খুব সফল ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু সৎ ও সরল

ছিলেন, বিবেকবান, ধর্মভীরু ও পরোপকারীও ছিলেন। করিৎকর্মা কিংবা উদ্যোগী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু অন্যায় কাজ করতে পারতেন না। কেউ কিছু চাইলে তাকে ফেরাতে পারতেন না। সে সব বিমলাপ্রসাদও পেয়েছে যথারীতি। তাই কিছু মনে করল না। শুধুই নিজেকে নিয়ে থাকার যে যুগোপযোগী স্বভাব প্রচলিত হয়েছে আজকাল, তা আর আয়ত্ব হল কই বিমলাপ্রসাদের।

ঘাটের কাজ সেরে নেড়া মাথায় বাড়ি ফিরছিল সবাই। হঠাৎ রাস্তার পাশের চায়ের দোকান থেকে একটা মোটামতন ছেলে বিমলাপ্রসাদের পাশে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল—কেটারিংয়ের কাজটা কাকে দিচ্ছেন? শ্রাদ্ধের সময় তো কেটারার লাগবেই। এভাবে রাস্তার মধ্যে বলছি বলে কিছু মনে করলেন না তো? বুঝতেই তো পারছেন দাদা, কমপিটিশন মার্কেট।.....

স্কিনডিজিজ

—সুখশান্তি আর হল না জীবনে, শুধু স্কিনডিজিজ হল।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা দাঁতে কাটতে কাটতে পার্থ বলল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ বুঝতে পারল, সন্ধেবেলা কলেজ স্ট্রিটে এসে হঠাৎ কফি-হাউসে ঢুকে পড়াটা ভুল হয়ে গেছে একদম। সময়টা নষ্ট হল। একটু পরে মাথাটা ধরবে। নিজের অবিশ্বাসী পা-দুটো তারপর তাকে আজও কি তরল আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে? পিনাকী যাকে বলে-দীনুদার মাজার। শ ব্রস। মেট্রো গলি। কিংবা ম্যাজেস্টিক। অন্ততঃ মনসুখ। বাড়ি ফেরার আগে আধ ঘণ্টা এ-সিতে বসার আরাম। তিন পেগ গুনে গুনে। মাথাটা ফাঁকা হয়ে আসবে তাতে। অন্ততঃ তিন ঘণ্টা ঘুমানো যায়। ম্যাজেস্টিকে অবশ্য এ-সি নেই। তবে পরিবেশটা ভালো। বেয়ারাগুলো ভদ্র অন্ততঃ। আজকাল অফিসের লোক, বা বন্ধুবান্ধবের চেয়ে বিভিন্ন বারের বেয়ারাদের সঙ্গেই অমিতাভর আত্মীয়তা বেশী। পার্থ অবশ্য এসব কিছুই জানে না। সে এখনও একদম আগের মতই আছে। বাড়ি, অফিস আর কফি-হাউস। রোজ। এখনও। কি করে পারে কে জানে। এত ধরাবাঁধা গণ্ডির মধ্যে থাকার কথা অমিতাভ তো ভাবতেই পারে না।

—বৌ কেমন আছে? মেয়ে? অমিতাভ কথা পাল্টালো।

—কেমন আছে ঠিক বলতে পারব না। পার্থ বলল— তবে ওরা বেশ ব্যস্ত আছে দেখি।

পার্থটা বরাবরই এরকম। সবসময় সব ব্যাপারে চালাক চালাক কথা বলে আর খ্যাক খ্যাক করে হাসে। কিছুতেই জড়াতে চায় না কোন ব্যাপারে। কফি-হাউস ছাড়া আর সব জায়গায় অস্বস্তি বোধ করে। সংসারে প্রায় অতিথির মত থাকে। অফিসেও তাই। দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যে ভাবে শিখেছে পার্থ, তাকে প্রায় শিল্প বলা যায়। একবার, অনেকদিন আগে, বিবেকানন্দ রোড আর কর্নোয়ালিশ স্ট্রিটের মোড়ে ব্যাজার মুখে পার্থকে ট্যাক্সি খুঁজতে দেখেছিল অমিতাভ বিকেলের দিকে। তখন ঘোষ লেনের লোহাপট্টির ভেতরে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতো। যথারীতি ট্যাক্সি পাচ্ছিল না পার্থ। অমিতাভ বেশ অবাক হয়েছিল বলতে গেলে, পার্থকে ট্যাক্সি খুঁজতে দেখে। ঘোষ লেন থেকে কফি-হাউস তো রোজ হেঁটেই যায় পার্থ। কি ব্যাপার। জিগ্যেস করতে পার্থ বিরক্ত মুখে বলেছিল— ধর না মাইরি একটা

ট্যাক্সি। মাকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে। আরও অবাক হয়ে অমিতাভ বলেছিল— মেডিকেল কলেজে? কেন? নিরাসক্ত গলায় পার্থ বলেছিল— বাণ্টি মাথা ফাটিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা নিয়ে গেছে হাসপাতালে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। এখন মা বলছে দেখতে যাবে। কি ফ্যাসাদ বল। অমিতাভ হাসবে কিনা বুঝতে পারেনি ভালো। মেয়ের মাথা ফেটেছে— তাতে কোন সমস্যা নেই। মা দেখতে যেতে চাইছে সেটা যেন বড় সমস্যা। মাকে সে যমের মতো ভয় পায়। অমিতাভ জানে। ট্যাক্সি ধরে মাকে নিয়ে পার্থসহ হাসপাতালে পৌঁছেছিল অমিতাভ। ততক্ষণে সেলাই হয়ে গেছে। ঠাম্মাকে দেখে এই প্রথম একটু কেঁদেছিল বাণ্টি। ছটা সেলাই যখন হচ্ছিল তখন একটুও কাঁদেনি। অমিতাভ লক্ষ করেছিল, বাবার দিকে ফিরেও তাকায়নি বাণ্টি একবারও। সে যে কি অস্বস্তি। বরং পাড়ার ছেলেদের দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছিল বাণ্টি। তাদের সম্পর্কেই ওর অনুভূতি বেশী।

এই পার্থ যাকে বিয়ে করেছে, সুচরিতা, সে ছিল বিশ্বজিতের প্রেমিকা। পার্থ দিনরাত বেকারজীবনে আড্ডা দিত অসিতের বাড়িতে, গোয়া বাগানে। বিবেকানন্দ রোডের ওপাশে, লোহাপট্টি থেকে, মানে— ঘোষ লেন থেকে পার্থ রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে আসতো অসিতের বাড়ি। অনেক সময় দিনের প্রথম চা-টাও খেত অসিতের বাড়িতে। দুপুরে একবার শুধু খেয়ে আসতো নিজেদের বাড়ি গিয়ে।

অসিতের ঘরটাও ছিল আড্ডার স্বর্গ। সারাদিন বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। অমিতাভ আর বিশ্বজিৎ তো ছিল যাকে বলে রেগুলার মেম্বার। তাস, দাবা, কবিতার পত্রিকার সম্পাদনা, সমসাময়িক ঘটনাবলীর আদ্যশ্রাদ্ধ, খবরের কাগজ বিক্রি করে মাঝে মাঝে হঠাৎ মদ্যপান, কি যে হত না সে আড্ডায়। নিজেদের হঠাৎ-অর্জিত কোনো নতুন কৃতিত্বের কথা সে আড্ডায় না জানাতে পারলে যেন প্রেস্টিজ থাকতো না। এরকম ধারণা থেকেই বিশ্বজিৎ প্রথম সুচরিতাকে অসিতের বাড়িতে নিয়ে আসে। যৎসামান্য উদ্দেশ্য ছিল সকলের সঙ্গে সুচরিতার আলাপ করিয়ে দেওয়া। নিজের অর্জন দেখানো।

সুচরিতা আড্ডায় এসে দেখলো— পার্থ হল আড্ডার ছোটখাট ধর্মগুরু। অন্য সবাই পার্থর মতামত, বুদ্ধিমত্তা, সবকিছুই মেনে নেয় শেষ ওব্দি। বিশেষ করে বিশ্বজিৎ সবসময় পার্থর মন্তব্যকে মেনে নেয় বিনা শর্তে। দৃষ্টিকটু ভাবে সে ছিল আসলে ব্যক্তিত্বহীন, অন্য বন্ধুবান্ধবদের হুকুমের, ইচ্ছার, ক্রীতদাস ও আজ্ঞাবহ। ফলে ক্রমশ সুচরিতা প্রেমে পড়ে গেল পার্থর। আর দীর্ঘ অসুখে পড়ল বিশ্বজিৎ। তার জটা বেরোলো মাথায়। কলকাতায় তখন নীল দোতলা বাস বেরোলো। অসিতের বাড়ির আড্ডায় একদিন বিশ্বজিৎকে দেখতে যাবার কথা উঠলো। পার্থ আর সুচরিতা চোখ চাওয়াচাওয়ি করে নিয়ে বলে উঠল— তা বেশ, এসব আমাদের ভালোই লাগে। তখন অমিতাভ আর অসিত নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিঃশব্দে বলে ওঠে— এরকমও হয়। যার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছে পার্থ, তাকে রোগশয্যায়

দেখতে যাবার কথা উঠলে সে বলছে— এসব আমার ভালই লাগে। আমার নয়, বলছে 'আমাদের'! ভাবা যায়।

সেবার বিশ্বজিতের বাড়িতে, টালা ব্রিজের নিচে, রেলকোয়ার্টারে, বিশ্বজিতের বাবা ছিল কাশীপুর রেলইয়ার্ডের ফোরম্যান— সেই সূত্রে কোয়ার্টার— সেখানে সবাই মিলে গিয়ে, বিশ্বজিতকে তোলা হল বিছানা থেকে, টালা ব্রিজে উঠে তার সে কি বিস্ময়— একি, কলকাতায় নীল ডবলডেকার। যেন প্রেমিকা চুরি হয়ে যাবার ঘটনাটা কোনো ব্যাপারই নয়। ওসব তো হয়েই থাকে। কিন্তু, কলকাতায় নীল রঙের দোতলা বাস। এতটা ভাবাই যায় না।

অমিতাভর মনে পড়ছিল সব। টুকরো টুকরো ঘটনা। বিভিন্ন স্মৃতি। টেবিলে আরো কারা সব বসে আছে। মেয়ের-বাবা হওয়ার সমস্যা নিয়ে নানান রসিকতা হচ্ছে। পার্থ হঠাৎ বলল— কন্যার জনক আর ন্যক্কারজনক আসলে একই ব্যাপার।

হাসির হুল্লোড় উঠল একটা। অমিতাভ আর একবার বুঝল, এইসব কফি-হাউসীয় হাসি থেকে সে অনেক দূরে সরে গেছে। দূরে সরে গেছে তার মন। তার জীবন। তার রুচিবোধ।

উঠে আসতে ইচ্ছে করলেও সঙ্গে সঙ্গে ওঠা যায় না। অমিতাভ বসেই রইল। পার্থর রসিকতায় তার হাসি পেল না তেমন। নিজের মেয়ের আদুরে মুখটা মনে পড়ল। আজকাল তো বেঁচে থাকার সব আকর্ষণ সে ওই মেয়ের কাছ থেকেই পায়। তার হাসি, তার আব্দার, তার শাসন, এটুকুই তো বাঁচিয়ে রেখেছে অমিতাভকে। ঈশানী তো পুরনো হয়ে গেছে সেই কবে, উনিশশো কতয়। কি কথায় উত্তরে কি বলবে সে সব ধারাপাতের মত মুখস্থ অমিতাভর। সব ব্যাপারেই একটা অনুগত অভ্যাসের স্বরলিপি। ভালো লাগার চেয়ে স্বস্তি বা আরাম বেশী তাতে। উত্তাপ নেই।

কম বয়সে কফি-হাউসে এলে এইরকমই একটা আরাম হতো। মনে হতো যেন ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এখন কেউ তাড়িয়ে দেবে না। এখন কেউ রেশন তুলে আনতে বলবে না। কেরোসিন তেলের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে বলবে না। পরীক্ষার পড়া ধরবে না। সিগারেট খেতে গেলে কারো কাছ থেকে লুকোতে হবে না। সময় কাটানোর জন্যে কি করবো ভাবতে হবে না। কতরকম লোকজন। কতরকম কথা। তখন যদি কেউ ওরকম কিছু বলতো— কন্যার জনক আর ন্যক্কারজনক... খুবই যে উপাদেয় লাগতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন... ব্যাপারটা কেমন যেন অন্য গ্রহের লোকদের বলে মনে হল। কিম্বা নিজেই হয়তো অন্য পরিধির আবর্তে ঢুকে পড়েছে অমিতাভ। তাও হতে পারে।

কাজের লোকেরা কফি-হাউসে বিশেষ আসে না। লক্ষ করেছে অমিতাভ। যাদের কিছু করার নেই তারাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কফি-হাউসে এসে বসে থাকে। অমিতাভও থাকতো। একসময় তো সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত থাকতো। দিনযাপনের

সেসব চক্র থেকে আজ অনেক দূরে চলে এসেছে অমিতাভ। এখন অফিস, বাড়ি, আর ওই সন্ধ্যের দিকে তিন পেগ--- সেটাও প্রায় কাজের মধ্যে পড়ে। রুটিন জব। আগে ছিল সারাদিন কফি হাউস, আড্ডা, সিনেমা, আর মাঝে মাঝে উদ্দাম নেশা। সে সব এখন স্বপ্ন।

বিশ্বজিৎ পরে যাকে বিয়ে করেছে, সে ছিল অমিতাভর প্রেমিকা। বিশ্বজিতের প্রেমিকাকে যেমন বিয়ে করেছে পার্থ, তেমনি অমিতাভর প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে বিশ্বজিৎ। এসব এখন কি যে হাস্যকর লাগে। অথচ তখন কত কাণ্ডই না হয়ে গেছে এসব ব্যাপার নিয়ে। পার্থ যেদিন অসিতের ঘরের আড্ডায় প্রথম জানায়— রুমার সঙ্গে বিশ্বজিতের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে, সেদিন অমিতাভর মনে হয়েছিল...।

এখন ঠিক মনে পড়ল না কি মনে হয়েছিল, কি বলেছিল অমিতাভ। এর নাম সময়। শুধু মনে পড়ল, বিশ্বজিতের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যথারীতি মানিয়ে চলতে পারেনি রুমা। আর রুমার বেখেয়ালি স্বভাবের জন্য উন্মাদের মতো ধার করতে লাগলো সবায়ের কাছে বিশ্বজিৎ। বন্ধুরা এড়িয়ে যেতে লাগলো বিশ্বজিৎকে। দ্বিতীয়বার একা হয়ে গেল বিশ্বজিৎ। প্রথমবার হয়েছিল সুচরিতাকে পার্থ বিয়ে করার পর। সোজা ছমাস বিছানায়।

আজ উঠি— বলে উঠে পড়ল অমিতাভ।

আবার আসিস— বলল পার্থ। ধুনি জ্বালিয়ে আমি বসে থাকি। সবাই তো যে যার গর্তে ঢুকে গেছে। আরো বলে পার্থ।

উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসে অমিতাভ।

এই কথাটা আরো অনেকেই বলে। সংসার কি গর্ত?

কফি-হাউসের বাইরে বেরিয়েই মনে হল, বাইরেটা কি ভালো, আর কি স্বাভাবিক। বেশ ফুরফুরে একটা হাওয়া। এই হাওয়া নকল সুরে কথা বলার চেষ্টা করে না। হয়তো তেমন আধুনিকও নয়। আধুনিক শব্দটা যখন তৈরীও হয়নি, এই হাওয়া হয়তো তখনকার। হয়তো তারও আগের। কিন্তু কি সরল। প্রাণ হাল্কা করে দেয়। কফি-হাউসের ভেতরে কেমন যেন ভারী লাগছিল সবকিছু। নিচু আলোর মধ্যে বসে আছে নিচু লোকজন।

দু-মাস অন্তর প্রধানমন্ত্রী পাল্টে যায় যে দেশে, সম্পর্ক বা প্রেম তো সেখানে পাল্টে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের একটা সিনেমার টিকিট বা কেরোসিন তেল বা একটা ভাড়াবাড়ি বা ফাঁকা বাস ট্রাম বা ভিড়ভাট্টাহীন একটা খালি রাস্তা একলা হাঁটার মতন— কিছুই দেয় না; সুস্থ দাম্পত্য বা দীর্ঘস্থায়ী কোনো সম্পর্ক বা ভাই বোনের ভালোবাসা— কিভাবে দেবে। ভাবতে ভাবতে ইউনিভার্সিটির সামনের বাসস্টপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অমিতাভ। নিজের সব ভাবনা তাকে যে খুব শান্তি দিচ্ছিল তা নয়। কাকেই বা দেয়।

বাংলা খেতে আর ভালো লাগে না। সেই শালপাতা, ভিজে ছোলা, আদাকুচি, আর তারপর- দুনিয়া তেরি মা কি-দুত্তোর! বলতে বলতে অমিতাভর পাশ দিয়ে চলে গেল দুজন কিশোর।

অমিতাভর মনে হল, এ কি সেই কলেজ স্ট্রিট? যেখানে সে নিতান্ত অবহেলায় ভাসিয়ে দিয়েছে তার যৌবনকাল। কবিতার বই কিনেছে পাগলের মত। রাত জেগে জেগে পড়েছে আর ভেবেছে- একদিন পৃথিবীটা সে একাই পাল্টে দিয়ে যাবে।

দ্রুত ধর্মতলায় চলে এল অমিতাভ। এক্ষুণি ঢুকে পড়তে হবে যে কোনো একটা বার-এ। তিন-পেগের অভ্যস্ত আরামটা চাই। মেয়ের টেস্ট-পেপার কেনা হয়ে গেছে। দেরী করে বাড়ি ফেরায় আজ আর কোনো অপরাধবোধ নেই তাই।

প্রথম পেগে প্রথম চুমুক দিয়েই, রোজ যেমন হয়, আজও মনে হল, সব ঠিক আছে। পৃথিবীটা আসলে ভালোই। আমরাই মাঝে মাঝে নিজেদের দোষে ভুল করি। পার্থ যদি আজ কফি-হাউসে না থাকতো, মেয়ের টেস্ট-পেপার কিনতে অফিস ছুটির পর কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে কাজ হয়ে যাবার পর কফি খেতে ঢুকে খুব একা ও অসহায় লাগতো না কি, পুরনো বন্ধুদের একজনকেও না দেখতে পেলে। অন্যদের মতন সংসারের বা ব্যক্তিগত ব্যতিব্যস্ততার চাপে জীবন ও সময়কে তুচ্ছ করার ক্ষমতা তো প্রায় সকলেরই চলে যায়। তবু তো থাকে পার্থ রোজ, আজও, এখনও। সবাই বোধহয় সেই কারণেই কফি-হাউসে ঢুকেই খোঁজ করে— পার্থ আছে। আসেনি এখনও? চলে গেছে? ইস্‌স্‌! কি হবে তাহলে?

সংসার যদি গর্তই হয়, তবে সে গর্তটাকে এখনও পর্যন্ত তো দিব্যি পাশ কাটিয়ে বেঁচে আছে পার্থ। প্রেম করে বিয়ে করা, শুধু যে প্রেম করে তাও নয়-রীতিমত বন্ধুর প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করা বৌ- সেও আজকাল নাহয় পার্থর চেয়ে তার একজন বশংবদ অফিস-কলিগকেই সাহচর্য, মনোযোগ ও গুরুত্ব দেয় বেশী, তা কি আর করা যাবে- সুচরিতার সে সহকর্মীটির জীবনবেদ বোধহয় এরকম যে 'শত কথায় সতী পটে' তো, পার্থর তো আর সেরকম নয় জীবনদর্শন। সে আধুনিক ও অহংকারী এবং বুদ্ধিমান। স্ত্রীর প্রিয় পুরুষ হয়ে ওঠার জন্যে লাইফ শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ঠ বোকা সে নয় কিছুতেই। বিশেষতঃ এক বোকা স্ত্রীর জন্য। জীবনে একদিনই কফি-হাউসে ঢুকে যে বলেছিল— বাবা, কি গোলমাল, কি ধোঁয়া, এর মধ্যে রোজ বসে থাকো? চোখ জ্বালা করে না? কথা বললে কেউ শুনতে পায়?

পার্থর কাছে কত লোক যে কত কি জানতে চায়! সেদিক থেকে দেখলে তার সংসার অনেক ছড়ানো। নিজের মেয়ে তাকে হোমটাস্ক বলে দিতে বলে না ঠিকই, বৌ তাকে বাজারে যেতে বলে না ঠিকই- সেসব ম্যানেজ করে পাড়ার দেওর-ঠাকুরপো দিয়ে- কিন্তু পার্থকে নির্বাচনের আগে কত লোক যে জিগ্যেস করে আগামী প্রধানমন্ত্রী কে হবে। বাগবাজারে শত ঘোষ কে ভিক্টর ব্যানার্জি যে হারাতে পারবে

না, বড় বাজার যে কংগ্রেসের হাতছাড়া হবে না, এসব থেকে শুরু করে— বাজপেয়ী টেলিফোনে গুজরালকে বলেছে-সংক্ষিপ্ততম কালের প্রধানমন্ত্রী থাকার আমার এই নজির যেন ভেঙে দিও না ভাই। এ হল রেকর্ড গড়ার যুগ। প্রেম-ভক্তি-মানবিকতা সব হ্যাপিস্। যে যেভাবে পারে শুধু রেকর্ড করছে। আপনার কত টাকা আছে বা আপনি কত গরীব- এসব এখন ব্যাকডেটেড। এখন ব্যাপারটা হল— আপনার রেকর্ড আছে কিসে? তাও আবার ক্লাস সেভেনে তিনবার ফেলে কিংবা হেডমাস্টার কেলিয়ে রাস্টিকেট- ওসব হলে হবে না। ওসবও পুরনো হয়ে গেছে সেই কবে উনিশশো কতয়। ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা, পার্থর সংসার বেশ ছড়ানো। শুধু দারাপুত্রপরিবার নিয়ে তার কারবার সীমাবদ্ধ নয়। তার, আরও আছে। এত আছে যে যারা স্ত্রী পুত্র মা-বাবা স্বামী শাশুড়ি নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত তাদের বেশ উপেক্ষাই করে পার্থ। যে কোনো পারিবারিক কঁ্যাচালের গল্প শুনলেই পুরো জ্যোতি বসুর কায়দায় বলে— এমন তো হতেই পারে। এতে এত দুঃখের কি আছে।

দ্বিতীয় পেগে দ্বিতীয় চুমুক দেবার পর মনে হল, পার্থই ঠিক বলে। ভালোবাসা বলে কিচ্ছু হয় না। ওসব আগেকার দিনে হত। আজকাল সবাই, সত্যি ওই রেকর্ড বোঝে। স্বামী-শাশুড়ি সামলে, ছেলে-মেয়ে সামলে, আমার মত সুখে কে আছে আর।

এই পার্থকে একবার ভারী আনস্মার্ট হতে দেখেছিল অমিতাভ। মেডিকেল কলেজের মুখে দেখা, বিকেলের দিকে। গম্ভীর ভাবে বলল, আমার মেয়ে হয়েছে, চল্ দেখে আসি। সুচরিতা ভালো আছে? জিগ্যেস করতে উদাসীন গলায় পার্থ বলেছিল- আছে বোধহয়। মেয়ে হয়েছে বলে এত গম্ভীর হয়ে যাবার কি আছে বুঝতে পারেনি তখন অমিতাভ। তুলতুলে মাংসপিণ্ডের মত নিজের শিশুকন্যার দিকে পার্থকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাকও হয়েছিল খুব। সুচরিতার সঙ্গেও কথা বলছিল না। অনেকক্ষণ ধরে শুধু তাকিয়ে ছিল সদ্যোজাত সন্তানের দিকে। সে কি চেয়ে থাকা। যেন পৃথিবীর কোনো কথাই মনে নেই। সে দৃশ্য সারা জীবন মনে থাকবে অমিতাভর। কি এত ভাবছিল তখন পার্থ? দ্বিতীয় পেগ শেষ করার পর এখন মনে হল, সেই কুন্তলা এখন কত বড় হয়ে গেছে। বাবাকে সে পাত্তাই দেয় না। যত কথা শুধু মা আর ঠাকুমার সঙ্গে। আর পাড়ার অন্য বাচ্চারা। পার্থ কি সেসময় জগৎ ভুলে সেই শিশুর উৎপাদিত হওয়ার মুহূর্তগুলোর কথা ভাবছিল। কি থেকে কি হল। সেই মুহূর্তে তার মুখে কফি-হাউসীয় সেই চালাকচতুর ভাবটা ছিল না। মনে পড়ল অমিতাভর।

কোণের টেবিলে একটা হল্লা উঠলো। মোটা মতন একটা লোক, হঠাৎ তারস্বরে গান গেয়ে উঠেছে-একটা গান লিখো আমার জন্য, নাহয় আমি, তোমার কাছে, ছিলেম অতি নগণ্য। 'নগণ্য'-টা বলার সময় মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করছে লোকটা। বেয়ারা ছুটে গেছে গান শুনে। চলবে না, চলবে না, এখানে ওসব চলবে না

মশাই। লোকটা ক্ষেপে লাল। কি ? গান গাওয়া যাবে না ? তাহলে এত মদ খেলাম কেন ? আমি কি টিপ্‌স্‌ দিই না আপনাদের।

লোকটাকে চেনে অমিতাভ। রোজ আসে। ভালো আছেন দাদা- বলে কাছে বসলেই জোর করে এক পেগ খাওয়ায়। একুশ বাইশ বছরের একটা রিটার্ডেড মেয়ে আছে। গোঁজ হয়ে বসে থাকে। পেচ্ছাপ-পায়খানা করে ফেলে অসাড়ে। গায়ে জামা কাপড় রাখতে পারে না। একটা ছেলে আছে অবশ্য বেশ ভালো। স্মার্ট। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। টাকা পয়সার ব্যাপার ছাড়া কথাবার্তাই হয় না সাধারণতঃ। ব্রেবোর্ণ রোডে একটা চা-কোম্পানির মাঝারি ধরনের অফিসার। শখের থিয়েটারে অভিনয় করার রোগ আছে। অফিস ছুটির পর নিত্য মদ্যপান ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো বিকল্প উৎফুল্লতার উৎস নেই। সোজা বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেই পারেন না। এখন বেশী মদ খেয়ে ফেলে গান গেয়ে উঠেছেন। তাতেই বিপদ। জীবনে এইটুকুই আনন্দ।

হঠাৎ বাড়ি ফিরে যাওয়ার একটা তীব্র তাগিদ অনুভব করল অমিতাভ। মেয়েটাকে অনেকক্ষণ দেখেনি। বাড়ি ফিরলেই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিরকম পাগলের মত। দেরী করে ফিরলে জুতোর আওয়াজ পেয়ে সিঁড়ির ওপর থেকেই ধমকাতে শুরু করে— কি, এতক্ষণে মনে পড়ল বাড়ির কথা। ঠিক মায়ের ভঙ্গিমা নকল করে বলে। ভারী আরাম লাগে তখন অমিতাভর। সংসারে টুকটাক সুখের ছবি অনেকরকম হয়। একে গর্ত বলে কেন লোকে।

সুচরিতার একজন বন্ধু ছিল, ঝর্না। অসিতের বাড়ির আড্ডায় প্রায়ই আসতো সেও। অসিতের সঙ্গে ভাবও হয়েছিল খুব। সোনাগাছির পাশে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটে ছোটবেলায় থাকতো অসিত। খুব রোগা আর কালো আর লাজুক আর ভীরু ছিল বলে অসিতকে অনেকে বেশ্যার ছেলে বলে সন্দেহ করতো স্কুলে। এসব গল্প শুনে ঝর্না আব্দার করতো, আমি ওদের দেখতে যাবো। শুনে অন্যরা খুব হাসতো আর পেছনে লাগতো ঝর্ণার। তোর আর কোনো এ্যাম্বিশন নেই ? হঠাৎ এরকম একটা ইচ্ছে হল। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ'র ছাত্রী ঝর্ণা ফোঁস করে উঠতো- একটা সভ্য দেশে মেয়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি খাবে, শরীর বেচবে, এসব হয় কি করে ?

সেই ঝর্ণা এখন একজন ব্যাংক অফিসারকে বিয়ে করে তিন সন্তানের জননী হয়েছে। সমাজের অন্য স্তরের মানুষদের কথা ভাবার সময় পায় না। সংসার যদি গর্তই হয় তাহলে সে গর্তে পুরোপুরি ঢুকে গেছে ঝর্না।

সুখশান্তি হয়তো হয়েছে তার। স্কিনডিজিজ হয়নি।

নিজের ফ্ল্যাটের কলিংবেলটা বাজাবার মুহূর্তে কথাগুলো বিড়বিড় করে বলল অমিতাভ। কাকে বলল ? পার্থকে ? না নিজেকেই।

রাত্রে খাবার টেবিলে ঈশানীকে জিগ্যেস করল অমিতাভ— তোমার পায়ের

একজিমাগুলো কেমন আছে ?

আজকেই ডাক্তারের কাছে গিস্‌লাম। ঈশানী বলল, ডাক্তার কোনো ওষুধ দিল না। খাওয়া থামিয়ে অমিতাভ জিগ্যেস করল, কেন ? ওষুধ দিল না কেন ?

ঈশানী নিরীহ গলায় বলল— ডাক্তারবাবু বললেন, স্কিনডিজিজ পুরোপুরি সারে না। সারাতে গেলে অন্য অসুখ বেড়ে যায়।

—আর সুখশান্তি ? সেটা থাকলে কি অন্য সার্থকতা থাকে না মানুষের জীবনে।

আলজিভে কথাগুলো ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে রইলো অমিতাভ।

বিধেয়লিপি

এখানে গাছের পাতায় যেন আটকে আছে নক্ষত্র। আকাশে মেঘ নেই। সন্ধের আগে কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গেল খুব জোর। তখন অবশ্য কলকাতায় ছিল কমলেশ। মিনিবাসে অফিস থেকে বেরিয়ে কোঠারি মেডিকেল সেন্টারে যাচ্ছিল। বৃষ্টিটা কেটে গেল মিনিবাসেই। যেভাবে শুরু হল মনে হয়েছিল নামতে গিয়ে ভিজে যাবে। কিন্তু থেমেই গেল। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল. তেমনই হঠাৎ থেমে গেল। মিনি থেকে নেমে একটু হাঁটতে হল। কোঠারির গেটের বেশ খানিকটা আগেই বাসস্টপ। দু-পা যেতে না যেতেই দেখতে পেল সুজাতা আর অনীতা যাচ্ছে আগে আগে। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কথা বলছে কার সঙ্গে। আর একটু এগিয়েই চিনতে পারল কমলেশ। নবারুণ। রুবির দাদা। আগেই এসে গেছে দেখছি। কিন্তু ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতে এখনও তো পনেরো মিনিট বাকি। সবে পৌনে পাঁচটা। আজ সবই ঠিকঠাক হচ্ছে তাহলে।

কলার বোন ভেঙে গেছে অমলেশের। অফিসের গাড়িতে যাচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরেছে ড্রাইভার একটা লরিকে ওভারটেক করতে গিয়ে। ব্যাকসিটে বাঁদিকে জানলায় হাত রেখে বসেছিল অমলেশ। হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়তে দুটো জানলার মাঝখানের রডে ধাক্কা লেগেছে কাঁধে—বাঁ দিকের কলার বোনটা তাতেই দু টুকরো হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোঠারি। চার দিন হয়ে গেল আজ নিয়ে। জিনা ফোন করেছিল সেই সোমবার। অফিসে। মেজদার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এক্ষুনি চলে এসো। ইনজুরি তেমন কিছু গুরুতর নয়। এর বেশী কিছু বলেনি জিনা। প্রফেশনাল এথিক্স। কোঠারির ষ্টাফ নার্স। কমলেশের সবচেয়ে ছোট বেন।

গিয়ে দেখে খুব বেশী কিছু হয়নি সত্যিই। কলার বোনটা ভেঙে ওপরে নিচে হয়ে গিয়েছিল। সেটাকে সেট করে ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে আটকে রেখেছে পিঠ থেকে বুক পর্যন্ত, আর বাঁ হাতটা ঝুলিয়ে দিয়েছে গলায়। পাংশু মুখে আটতলার ওপরের ঘরে জানালা দিয়ে বাইরের কলকাতা দেখছিল অমলেশ। অফিসের লোকেরা চলে গেছে একটু আগে। এখন শুধু রেস্ট আর ওষুধ পত্তর। করার কিছু নেই।

কি করে হল ? কমলেশের অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নে একটা অসহায় ভঙ্গি করে মেজদা বলেছিল— মেরে দিল শালা ড্রাইভার। এক্সরে প্লেটগুলো খুঁটিয়ে দেখছিল কমলেশ তারপর। জিনার সঙ্গে কথা বলেছিল ডিটেলে।

বাড়িতে খবর দিয়েছে অফিস থেকেই। রুবি এসে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। বাচ্চাদের আসতে দেবে না ওয়ার্ডে। তাদের আনবে না নিশ্চয়ই রুবি। বেহালা থেকে কোঠারিতে আসার কোন ঝামেলা নেই। সব মিনিগুলো এখান দিয়ে যায় বেহালার। একাই আসতে পারবে। সবসময় দেখাশোনার জন্যে জিনা তো আছেই। চিন্তার কোনো কারণ নেই। শুধু যাওয়া-আসা। একা কোথাও যেতে পারে না শুধু সুজাতা। পিঠোপিঠি বোন অনীতা এসে পড়তে যেন বেঁচে গেল কমলেশ। অফিসে বেরোবার মুখে বলে গেল—তোমরা দুজনে পারবে না চলে আসতে? শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া তো ট্রেনে—আর নেমেই সখের বাজার মিনি। কি, পারবে না? সুজাতা দু চার বার সখের বাজার সখের বাজার বিড় বিড় করে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যা, পারবো না কেন! খিলখিল করে হেসে উঠল অনীতা—দিদি সংসার করে তোর কি অবস্থা। কোঠারি যেতে পারবি না? রাগ রাগ ভাব করে সুজাতা বলেছিল—আহা, আমি কি তোদের মত রাতদিন ট্যাঙাস ট্যাঙাস করে ঘুরে বেড়াই কলকাতায়। আমার দরকারই পড়ে না! সবই তো পাওয়া যায় আমাদের শ্রীরামপুরে—যাবোই বা কেন!

এখন মিনি থেকে নেমে দুজনকে নবারুণের সঙ্গে কথা বলতে দেখে নিশ্চিত হল কমলেশ। তাহলে ঠিকঠাক এসেছে ওরা। আসলে অনীতাটা অনেক বেশী চালু। য়ুনিভাসিটির ক্লাশ, কোচিং, লাইব্রেরি—নিউ মার্কেট বা কফি হাউস—সারাদিন ঘোরাঘুরির অন্ত নেই। সে বুঝতেই পারে না একজন মহিলার একা যাতায়াত করার কি কি অসুবিধে থাকতে পারে।

পাশের বেডে একটা বাংলা দেশের লোক ভর্তি হয়েছে। জমিজমা বিক্রি করে বত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে চিকিৎসা করাতে এসেছে কলকাতায়। আজ এগারো দিন হল, বিছানায় পড়ে আছে। পা দুটো নাকি জ্বালা করে সারাক্ষণ। বিছানার ওপর উবু হয়ে বসে থাকে। বসে বসেই পা-দুটোকে কাঁপায় অনবরত। কৃষ্ণনগরে কে আত্মীয় আছে। টাকা পয়সা সব তার কাছে। সেই যে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেছে, তারপর আর দেখতেও আসেনি একদিনও। কি একটা মেসিনে কি সব টেস্ট করাবে বলে রোজ নিয়ে যায়, 'মেসিন খারাপ' বলে আবার বেডে দিয়ে যায়। এরকম চলছে এগারো দিন ধরে। রাতের দিকে, যত রাত বাড়ে—লোকটা শুয়ে শুয়ে পা দুটো সমানে ছুঁড়তে থাকে আর 'আল্লা হো' 'আল্লা হো' বলে চিৎকার করতে থাকে। সকালে কমোড ব্যবহার করে ফ্ল্যাশ টানতে পারে না! একদিন অমলেশকে বলেছে—দিনে দুতিন বাণ্ডিল বিড়ি লাগে। এহেন আইস্যা একটাক বিড়ি খাইতে পাই না! চার দিন ধরে তার সাথে এক ঘরে থাকতে থাকতে অমলেশের সঙ্গে তার কেমন যেন আত্মীয়তাই হয়ে গেছে। লোকটার কোনো ভিজিটারও আসে না। একদিন নাকি বলেই ফেলেছে—আম্নার কাহে কত লোগে আইসে, আমার কাহে তো কেহই আহে না! কি কইর‍্যাই বা আইবো। বাংলাদেশ তো অনেক ধুর।

মানুষ অসুস্থ হলে অসহায় হয়ে যায় পুরোপুরি; মানুষ অসহায় হয়ে গেলে যৌবনের

মদমত্ততা, অহংকার—হারিয়ে ফেলে শিশুসুলভ হয়ে যায় একেবারে; পূর্ণবয়স্ক কোনো মানুষ শিশুর মত হয়ে গেলে সে তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের কথা ভাবে; মানুষ মায়ের কথা ভাবলে নিজের জন্মের কথা, এবং জন্মের কথা ভাবলে নিজের মৃত্যুর কথাও ভাবে। বিশেষ করে মৃত্যুর তাৎক্ষণিক ওষ্ঠ স্পর্শ করে কেউ যদি আবার জীবনের মধ্যে হঠাৎ ফিরে আসে, সে তো ভাববেই। কলার বোনে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় অমলেশ এসব ভাবছিল চারদিন ধরে চুপচাপ বিছানায় বসে, আর বার বার মনে পড়ছিল দুর্ঘটনার সেই মুহূর্তটা। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল সমস্ত পৃথিবী। .....দড়াম করে একটা ধাক্কার শব্দ। হেডলাইটের কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার চুরমুর শব্দের সঙ্গে মিশে। ব্যাক সিটে জানলার ধারে অফিসের লোকদের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে বসে, বাঁ হাতটা জানলার বাইরে রেখে, সিগারেট খাচ্ছিল অমলেশ। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একটা পার্টি ছিল। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অফিস মানে যাকে বলে সি-এম-পি-ও'র উচ্চপদস্থ অফিসার অমলেন্দ্র মিত্র, জাপানের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছিল সকালে, সাত-সাতটা উড়ালপুল কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বসানো হবে কি হবে না, হলে ট্রাফিক জ্যাম কতটা কম হবে কিংবা আদৌ কম হবে কিনা, তাছাড়া কলকাতার উন্নতি আর কি কি ভাবে করা যেতে পারে, এসব আলোচনার মধ্যে লাঞ্চ। অল্প ড্রিঙ্কস। সব মিলিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে বেশ বিরক্তই ছিল অমলেশ। তার মধ্যে রাস্তার মাঝখানের ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে নিজেই হাসপাতালে চলে এল হঠাৎ। অফিসের লোকেরা সমবেদনার চেয়ে হাসাহাসি করছিল বেশী। এই কলকাতার উন্নতি। হাসপাতালে থাকার তৃতীয় দিনেই খবর পেল অমলেশ, জাপানের এক্সপার্টদের টিমটা সসম্মানে ফিরে গেছে। বলে গেছে— এরকম আনঅর্গানাইজড্ শহরের জন্য তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

কোঠারির ঝকঝকে লাউঞ্জে ঢুকেই বিরাট সুদৃশ্য রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখতে পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুব ভক্তি ভরে প্রণাম করল সুজাতা। ভাসুরের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করল নিশ্চয়ই। ঠাকুর দেবতা দেখলে আর থাকতে পারে না সুজাতা।....পিছন ফিরেই কমলেশকে দেখে অমলিন হাসি ছড়িয়ে গেল তার সারা মুখে ও শরীরে। ওমা, তুমি এসে গেছ! দেখ, আমি ঠিক ঠিক এসে পড়েছি একা একা। বলল। কমলেশ বলল না— একা কোথায়, অনীতা তো ছিল। বলল— চলো, ওপরে যাওয়া যাক। মেজদার বেড আটতলায়। অপরেশ মাকে নিয়ে এসেছে। জিনা ওদের নিয়ে গেছে আগেই। শুনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল সুজাতা—মা এসেছে? ঠাকুর পো এসেছে? বাহ্ অনেকের সঙ্গে দেখা হবে তাহলে। যেন আত্মীয়দের সঙ্গে সুজাতার দেখা হবে বলেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে অমলেশ।

জিনা, অপরেশ, মা, রুবি, নবারুন— সবাই অমলেশকে ঘিরে বসে ছিল, যখন সুজাতা কমলেশ আর অনীতা ঢুকল। সুজাতাকে বেড নাম্বার বলে দিয়ে চলে এসেছে নবারুন। সুজাতা বলেছিল, সে কমলেশ এলে একসঙ্গে যাবে। এখন কোঠারি

মেডিকেল সেন্টারের দুই বেড বিশিষ্ট অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুমওলা আটতলার ওপরের এই কেবিনটা মুহূর্তে পারিবারিক পুনর্মিলনের মেলায় পরিবর্তিত হয়ে গেল কমলেশরা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। জীবনের নিয়মে দীর্ঘকাল কারুর সঙ্গেই কারুর যোগাযোগ ছিল না। বস্তুতঃ নিজের মা-কেই কমলেশ বেশ কয়েক বছর পরে দেখল। মা থাকে ছোট ভাই অপরেশের কাছে। সাধারণতঃ। মাঝে মাঝে বিয়ে হয়ে যাওয়া দুই মেয়ের কাছে যায় যদিও। ছেলেদের কাছে খুব দরকার ছাড়া যায় না। বড় ছেলে তো থাকে সেই বিশাখাপত্তনমে। সেখানে অবশ্য ঘুরে এসেছে গত বছর।

সবাই কথা বলছে কলকল করে। এখানে মাছ-মাংস ঢোকে না, কিন্তু ডিম দেয়। সব ঘরে রাধাকৃষ্ণের ছবি। আলো-চালের ভাত। সঙ্গে রাজমা মেশানো। বিচিত্র সব তরকারি। পাশের বেডে বাংলাদেশ থেকে আসা পেশেন্ট। তার বিচিত্র ব্যবহার। সারাদিন পা-কাঁপানো। চিৎকার। কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় বত্রিশ হাজারের মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার জমা দিয়ে আর খোঁজ নিচ্ছে না। হঠাৎ ছুটি দিয়ে দিলে তার পক্ষে একা একা কৃষ্ণনগরে যাওয়াও হয়তো সম্ভব নয়! এসবের মধ্যে অমলেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল — আর কেউ আসবে কি? সবাই চুপ হয়ে গেল শুনে। কেন? এরকম কথা কেন? ছটা প্রায় বাজে। আজ আর কেউ আসবে না বলেই মনে হয়। অমলেশের বদলে জিনাই বলে দিল — ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জোর করে ছুটি করে নিয়েছে মেজদা। তোমরা আসবে বলে বসে আছে! সবচেয়ে বেশী হৈ হৈ করে উঠল রুবি—তুমি আমাকেও বলো নি! ওমা গো তুমি কেমন মানুষ গো? অমলেশ গম্ভীরভাবে বলল—নিচের কাউন্টার থেকে ব্যালান্সটা নিয়ে এসো। ড্রয়ারে রসিদ আছে। নিয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নবারুন— না না, তুই বোস। আমি যাচ্ছি। ভর্তি হবার পর থেকেই নবারুন ছোটাছুটি করছে প্রচুর। হাজার হোক, স্ত্রীর ভাই। যাকে বলে শালা। নিজের ভাইরা তো ভিজিটিং আওয়ারে দেখতে আসছে আর 'কেমন আছো' জিগ্যেস করে চলে যাচ্ছে। ছোট ভাই অপরেশ তো এই প্রথম এল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেমন যেন কাছের লোক হয়ে যায়। নিজের বাড়ির লোকেরা হয়ে যায় দূরের আত্মীয়।

হঠাৎ পাশের বেড থেকে বাংলাদেশের লোকটা বলল— এডা কি কলিকাতা টাউন?

বিভিন্নরকম হাসির হুল্লোড় ঘরের মধ্যে। সবথেকে বেশী হাসল জিনা। এতদিন ভর্তি হয়েছেন এখানে, আর আপনি এটাও জানেন না? অনীতা বলল, বাংলাদেশের রাজধানী যেমন ঢাকা, তেমনি এটা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। কমলেশের মা বলল— পাগল, না কি! অমলেশ বলল—ভর্তি করার সময় কেউ আপনাকে বলেনি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? লোকটা বলল—আমার তো সারা শরীলে জ্বালা করে, বিশেষ কইরা পা দুটো, আমি কিস্যু বুইতে পারি না! সুজাতা বলল— আহা রে। বেচারা। এমন বিপদেও মানুষকে ফেলে ঠাকুর! আপনার ফ্যামিলি নাই? লোকটা একই ভঙ্গিতে বলল—বউ আমারে দ্যাহে না! বাপের বাড়ির লগে.....।

মা বলল—ছেলে আছে? লোকটা অসুখে ভুগে ভুগে কি অসীম এক নির্মম নিরাসক্তি অর্জন করেছে? উদাসীন ভাবে বলল— আছে দুই এক খান, সব উয়াদের মায়ের আগুারে! আমারে মানে না! তার বলার ভঙ্গিতে হাসির রোল উঠল আবার।

শুধু হাসতে পারল না কমলেশ। 'আমারে মানে না'—কথাটা বুলেটের মত লাগল। লাগল মানে কি, বুকে বিঁধে গেল রীতিমত। শুরু হল সঙ্গোপন, নিভৃত, নীরব রক্তক্ষরণ। যা হয় মাঝে মাঝে, কারণে অকারণে। বারোটা বছর খুব একটা কম সময় নয়। ঊনত্রিশ থেকে একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করার নামে শুধু ঝগড়া করেছে কমলেশ, নিশি তবু তাকে মেনে নিতে পারল না, কথায় কথায় অশান্তি থেকে ডিভোর্স। তুলনায় সুজাতা কি অসম্ভব শীতল ও শান্ত, বাধ্য ও আনাড়ি—যা খুব স্বর্গীয় আশীর্বাদ মনে হত প্রথম প্রথম; বারো বছরের উত্তপ্ত, যদিও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ও নিস্ফল, নিঃসন্তান দাম্পত্যের পর—যা এখন, সম্পূর্ণ উত্তাপহীনতার কারণে নিতান্তই জোলো, ভেতো ও আরও অর্থহীন লাগে তার—যাকে শান্তি মনে হত প্রথম প্রথম। মানে, বিয়ের পরে। ছ-সাত মাস। ডিভোর্সের পর বছর দুয়েক একা ছিল কমলেশ। তারপর দেওঘর শিমূলতলার দিকে বেড়াতে গিয়ে নারীপ্রধান এক ভ্রমণদলের মধ্যে সুজাতাকে পেয়ে যায় কমলেশ—যাকে দেখেই মনে হয় রান্না করতে আর খাওয়াতে ভালোবাসে খুব; ঝগড়া করতে পারে না একদম, আর চালাকি জানে না, জানতে চায় না বলেই জানে না যেন, তবে বুদ্ধি নেই তা নয় কিন্তু। ঠিক যেমনটি সে চাইছিল। তখন কি আর জানতো, সুজাতাকে বিয়ে করার পর কয়েকমাসের মধ্যেই উবে যাবে তার এই শান্তময় দাম্পত্যের ক্ষণিক স্বপ্ন। শুধু খাওয়া আর শোওয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংলাপ নেই—সকালে শুধু মনে করিয়া দেওয়া ছাড়া—সারাদিন সংসারে কি কি লাগবে। কমলেশ যেন এনে দেয়। ব্যাস্। অশান্তির তো কোনো কারণ নেই।

মানুষের জীবন যে ঠিক কিরকম হবে তার যদি কোনো নির্দিষ্ট হিসেব থাকতো। গমক ও গতিবিধি থাকতো। কমলেশ তাহলে হয়তো এত হিসেব করতো না, জীবনে শান্তি কি ভাবে হয়। কি ভাবে হবে। এত ব্যর্থ বা হাস্যকরও সে হতো না। অন্ততঃ নিজের কাছে। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যায় না তাকে কিছুই। এমানেতে সে বেশ হাসিখুশি ও সামাজিক। সন্তান অবশ্য তার এবারেও হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে সুজাতার—চিকিৎসা চলছে। আপাতদৃষ্টিতে একজন সুখী ও স্বাভাবিক মানুষ হলেও ভেতরে ভেতরে সে এক নিরালম্ব শূন্যতার মধ্যে ঘোরাফেরা করে সব সময়।...

বিল মিটিয়ে ফিরে এল নবারুন। দু হাজার সাতশো বত্রিশ টাকা। এমন কিছু নয়। অমলেশ মাকে বলল—তুমি তাহলে আমার সঙ্গে চলো। এসে যখন পড়েছো।

জামাকাপড় গোছাচ্ছিল রুবি। রাগ রাগ চোখে অমলেশের দিকে তাকালো। অসুস্থ স্বামীর সেবা, ছেলেদের স্কুলের ভাত, তার ওপর শাশুড়ি। ভাবখানা যেন, কটা ঝি চাকর রেখেছো তুমি ঘরে!

জিনা বলল—দু সপ্তাহ পরে একবার ব্যাণ্ডেজটা পাল্টে নিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু লিখে দিয়েছে। আমি ছুটি পেলে চলে যাবো। ড্রেস করে দিয়ে আসবো। চিন্তা কোরো না।

অপরেশ বলল—মা কি মেজদার সঙ্গে চলে যাচ্ছো নাকি ?

মা বলল—কেন, তুমি দু একদিন রান্না করে খেতে পারবে না!

সুজাতা বলল—ছোড়দা, আপনি বিয়ে করে ফেলুন না!

অনীতা বলল—না না, বিয়ে ফিয়ে করবেন না। যতদিন ফাঁকা মাঠে ব্যাটিং করা যায় ততদিনই ভালো।

কমলেশ বলল—মা, তুমি আমার কাছে কবে যাবে ?

মা বলল—দেখি, ঠাকুর কবে নিয়ে যায়। রুবির গোছানো হয়ে গেছে। বলল—চলো।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাঁধের ওপর দিয়ে কোনোরকমে জামাটা চাপিয়ে নিয়েছে অমলেশ। সে বলল—হ্যাঁ, চলো।

সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে বাংলাদেশের লোকটা বলল—আমনারা চইলা যাইতেসেন ?

এতক্ষণ তার কথা খেয়াল ছিল না কারুর। প্রশ্ন শুনে এখন সবাই তাকে উপদেশ দিতে লাগল নানারকম। সে হাবা চোখে চেয়ে রইল শুধু। অমলেশ বলল— এদের মেসিন তো সারাতে সময় লাগবে বলছে। কি একটা ঠিকানা দিয়েছে না ? কাল তো ছুটি দিয়ে দেবে আপনাকে ? ভালো মেসিন যেখানে আছে, সেই ঠিকানায় দেখিয়ে নিন। ছুটি নিয়ে নিন কালকে।

লোকটা বলল—ছুটি ? মেসিন ? ঠিকানা ? কি জানি। আমনারা সাবধানে যাবেন গিয়া। কলিকাতা টাউনের রাস্তাঘাট—। জানালা দিয়ে দেখসি। সারি সারি গাড়ি যায়। কুথায় যায়।

অশ্রুহীন জন্মমৃত্যু

ঘুম ঘোরে, পাশ ফিরে শুতে গিয়ে অনাদি টের পায়, পাশে, এক রমণী রয়েছে, ঘুমন্ত। হঠাৎ মনে পড়ে না, এ রমণী কে, সে নিজেই বা কোথায় রয়েছে। জীবনের বহু রাতই, বহু জায়গায়ই তো কেটে গেল। পর পর তিন দিন, একসময়, এক বিছানায় শোওয়াই হত না। পরিস্থিতি প্রতিকূল ছিল। স্বভাবও। পাশের এ ঘুমন্ত নীরব রমণী যে কে, মনে না পড়ায় ঈষৎ বিস্মিত অনাদি, তার, সে রমণীর, মাথার চুল ধরে বিলি কেটে দেয়, মনে পড়ে—মদ কিছু কালও সে খেয়েছিল, তবু, এর বেশী অভদ্র বা তৎপর, সে, এ অবস্থাতেও হয়ে উঠতে পারে না। চুলে আঙুল চালিয়ে বড় মমতায়, অনেক স্নেহে, মমতা তার যেটুকু ছিল তখনও, তা ঢেলে দিয়ে অনাদি বলে ওঠে—কে, কে গো তুমি, কাদের মেয়ে গো। ধড়মড় কর ঘুম থেকে উঠে, সে মহিলা, অনাদির মা, বলে ওঠেন—কিরে, কি হল? স্বপন দেখিস্ নাকি। বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে যান শুতে। অনাদির অসহায় মনে পড়ে—ওঃ হো, তাই তো, সন্ধ্যেবেলা, মা এসেছিল। লজ্জায়, কুণ্ঠায়, ধিক্কারে—কেমন উপুড় হয়ে শোয় অনাদি, দু-হাত মাথার বালিশের দু-পাশে ছড়িয়ে, মুষ্টিবদ্ধ, অনাদি ডুকরে কেঁদে উঠতেও—না, সেভাবে পারে না। কেন যে। বোধহয়, ভুলে গেছে বলে। ভাল করে হাসা, ভাল করে কাঁদা—দুটোই, অনেকদিন হল, কেমন ভুলে গেছে অনাদি। কেন গেল।

মনে পড়ে, মা বলেছিল—আমি এ ঘরেই শুয়ে পড়ছি, সোফাটা খুলে দে। ও ঘরে শুলে, তোর অসুবিধে হবে। বেশী না হলেও কম বেশী মাতাল অনাদি কেমন জেদের সঙ্গে, জোর গলায় অথচ চাপা স্বরে বলেছিল—না। আমি এ ঘরে সোফায় শুচ্ছি তুমি বিছানায় যাও।

মনে পড়ে, মা তেমন আপত্তি করেনি। মনে পড়ে না যা, তা হল, সে কখন মায়ের কাছে উঠে গেল, কখন ইচ্ছে হল খুব—মাকে জড়িয়ে ধরে একবার ডুকরে কেঁদে ওঠে—যা, করে উঠতে না পেরে সে শুধু —'বাবা কেমন আছে'— পর্যন্ত বলে উঠতে পারে—ঘুমে জুড়িয়ে আসা চোখে কি যে বিড়বিড় করে মা, ভাল করে শোনার অবসর বা প্রস্তুতি বা মানসিকতা, অবশিষ্ট থাকে না তার আর। মদভারে চেতনা, সাময়িক অবলুপ্ত হয় অনাদির। মানে, হয়েছিল।

সব নেশাই, নেশাহীনতায় সমাপ্ত হয় যেমন, সব রাত্রিও পরিণত হয় প্রভাতে। এবং তখন, নিতান্ত অনিচ্ছায়, বিরূপতা, মাথা টিপটিপ, কপালে যন্ত্রণা, কোমরে

পুরনো বাতব্যাধিজনিত ব্যথাভার—সব মিলিয়েই ঘুম ভাঙে অনাদির, অন্য সব দিন, যেরকম ভাঙে, সেরকমই। তফাতের মধ্যে—কিচেন থেকে টুংটাং শব্দ আসে কেন, বুঝে উঠতে অনেক সময় চলে যায়। নতুন কোনো ঝি? না, তা তো সে রাখেনি আর, অনেকদিন হল। আড়াই বছরের এই স্ত্রী-পরিত্যক্ত, ডিভোর্সী, নিঃসন্তান জীবনে অন্তত তিন-তিনটে ঝি....নাহ্ আর না, তার চেয়ে নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার রাখা ভাল, নিজের রান্না নিজে করে নেওয়া, ইচ্ছে হলে....। স্বনির্ভর জীবন, সময়ও কাটে....প্রথম প্রথম বেশ বিরক্ত লাগলেও ক্রমশ কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে, ঘুম থেকে উঠে বাসন ধুয়ে, হ্যাণ্ডওভারের মাথায় একটু জল গরম করে এক কাপ লেবু চা অন্তত একদম নিজের মনের মত করে, ওই জিনিসটা অন্য কেউ করে দিলে অনাদির পছন্দ হয় না মোটেই কিন্তু আজ রান্নাঘর থেকে মহিলার উপস্থিতির শব্দ পাচ্ছে কেন সে? ওহ্ হো, শূন্য দুপুরে কড়াক করে বাজ পড়ার শব্দের মত মনে পড়ে—কাল, মা এসেছে। আজ সে বিছানায় বসে খুব সুন্দর লেবু-চা পেয়ে যাবে, একদম মনের মত। অবশ্য, অনেক অনেকদিন পরে।....মা তার এই অভ্যেসটার কথা সবচেয়ে ভাল জানে। কিন্তু, মা অনেকদিন পরে এল।.....

কেন এল? সাধারণত, বিশেষ দুর্যোগ ছাড়া কেউ তো তার কাছে আসে না। অসুবিধে কিছু একটা হয়েছে। সদ্যস্নাতা, ভারী স্নিগ্ধ পায়ে ঘরে এসে লেবু-চা দিল মা। হঠাৎ কেমন মানুষ-মানুষ লাগল নিজেকে অনাদির। এরকম দৃশ্য সে বস্তুত অনেকদিন দেখেনি। আত্মীয়-স্বজন দূর অস্ত, বয়েস হয়ে গেলে, চল্লিশ পেরোলে তো আরও—নিজেরই মা, বাবা, ভাই বোন, এসব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক কিরকম কমে যায়।

—বাবা কেমন আছে?

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্নটা করতেই, অনাদির মনে পড়ে, কালও সে নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় মাকে, একই প্রশ্ন করেছিল। লাভের মধ্যে ঘুমঘোরে, মা যে ঠিক কি বলেছিল— মদখোরে—তা সে শুনতেই পায়নি। কিংবা শুনতে পেলেও বুঝতে পারেনি।

—কেমন আবার থাকবে? যেমন ছিল তেমনই আছে। নতুনের মধ্যে দু-দিন হল পেটটা ফুলছে। পা ফুলছে। উঠে বসতে পারে না। কাল তো সব কথাই বললুম। কি অত ছাই পাঁশ গিলিস রোজ রোজ, কথা বললে শুনতে পাস না। বৌ চলে গেছে বলে রোজ মদ গিলতে হবে? আবার বিয়ে কর, আমি বলি কি, তোর বাবার দিন শেষ হয়ে এল...। যাবার আগে তোকে সংসারী দেখে যেতে পারলে শান্তি পাবে...।

মা ঝাঁট দিচ্ছে। ঘরের ধুলো যেমন হাতের ঝাঁটায়, অনাদির মনের বিভিন্ন ধুলোবালি তেমনি মায়ের মুখের কথায়, আস্তে আস্তে অপসৃত ও আলোড়িত হচ্ছিল।

শুনতে শুনতে, চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে, অনাদি কিরকম যেন টের পাচ্ছিল—

কয়েকটা দিন তার এবার বেশ অন্যরকম কাটবে। ডাক্তার, হাসপাতাল, কিংবা নার্সিং হোম, ল্যাবরেটরি, ব্লাড রিপোর্ট ... খারাপ না। কলকাতায় এই একা পুরুষের পাঁচালি—দিনের বেলাটা চাকরিতে চলে যায় তাই রক্ষে—নইলে সময় যে কি করে কাটতো। সন্ধে হলেই ঘুরে ফিরে মদের আড্ডা—মানুষের এইসব সর্বগ্রাসী আবিষ্কার—মদ বা ঈশ্বর — এসবে একবার ঢুকে পড়লে আর কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিক, সহজ ও সুন্দর জীবনযাপন বলে কি কিছু থাকবে না মানুষের ?

আলমারিতে যত টাকা ছিল, সব নিয়ে মাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল অনাদি। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে সোজা জনাই। বেশ অন্যরকম লাগলো। লোকাল ট্রেনের ভিড়ে অন্য সব সাধারণ গ্রাম্য লোকজরেন মধ্যে মাকে নিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনাদির মনে হল—এসব পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে মা একা একা চলাফেরা করে—এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও। নিজেকে নিয়ে, নিজের বারো বছরের ব্যর্থ, নিষ্ফল ও বন্ধ্যা দাম্পত্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে এসব ব্যাপার সে একেবারে খেয়াল করেনি। ইস্ ভারী ভুল হয়ে গেছে। ভুল মানে কি, অন্যায়। কলকাতা মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না, সে তো স্বতঃসিদ্ধ। স্বাভাবিক দাম্পত্যকেও কি কিছুটা আহত করে না কলকাতা। অনাদির আজ মনে হল—কলকাতা বোধহয় মানুষকে নিজের মা-বাবার কাছ থেকেও দূরে থাকতে শেখায়। সব দোষ অবশ্য কলকাতার ঘাড়ে চাপানোটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। অনাদি এরকমও ভাবলো—'কলকাতার লোক' ব্যাপারটা কি আলাদা নয় তবু, শেষ পর্যন্ত। এই যে বেহালা চৌরাস্তা ছাড়িয়ে একটা মোটামুটি শান্ত ধরনের পাড়ার ভেতর একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে অনাদি—তারপর এই দেশে যাচ্ছে, জনাই যাচ্ছে মা-কে নিয়ে, তা প্রায় সাত-আট বছর পরে তো বটেই। ....তা-ও বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে যে অসুখের চিকিৎসা জনাইয়ে হবে না, হচ্ছে না।.....ইদানীং নিজের ফ্ল্যাট, চাকরি, বন্ধুবান্ধব, ডিভোর্স-কেস, এসব নিয়ে এত জড়িয়ে পড়েছিল অনাদি, যে জনাই নামের একটা মফস্বল শহরে তার আদি বাসস্থান—এ তথ্য যেন ভুলেই গিয়েছিল সে।

তবু, ছোটবেলার জায়গায় পা রাখতেই কেমন একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া হল অনাদির। ট্রেনেই দু-একজন একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে থেকে অবশেষে বলেই ফেলেছে—তুমি অনন্ত মুখুজ্জের ছেলে না। এখন মা-কে নিয়ে একটা সাইকেল-রিকশায় উঠতে, চারপাশের সমবেত সাইকেল-রিকসার হর্নের শব্দের মধ্যে একটাই বাক্য শুনতে লাগলো অনাদি—কি গো, কবে এলে ? কবে এলে ? ভাল আছো ? ভাল আছো ?

বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই শরিকি সংঘর্ষের চেহারাটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। বিভিন্ন জানলা-দরজা দিয়ে কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ শুধু তাদের দেখলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করল কিছুক্ষণ। তারপর আবার সব বন্ধ হয়ে গেল।

মান্ধাতার আমলের সাতপুরোনো কোঠাবাড়ি। নোনাধরা দেওয়াল। দাঁত বের

করা মেঝে। ক্ষয়ে-যাওয়া বারান্দা। ভাঙাচোরা সিঁড়ি, ঘর দালান। এসব পেরিয়ে বাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই গা-টা কেমন শিরশির করে উঠলো অনাদির।

সাত-আট বছর সে বাবাকে দেখেনি। মাঝে মাঝে বাবার লেখা দু-একখানা পোস্টকার্ড পেত অবশ্য অনাদি কলকাতায় বসে। তাতে দু-একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ কি টনিক আনার অনুরোধ আর ভাল থাকার জন্য শুভেচ্ছা থাকতো। অনাদি সে সব চিঠি ভাল করে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বরাবর।

বাবাকে সে ক্ষমা করতে পারে না কিছুতেই।

যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি সারাজীবন একটু একটু করে বিক্রি করেছেন ভদ্রলোক, আর পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে বাতকম্ম করেছেন। মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন—ভালমন্দ খ'দ্যবস্তুর রসাস্বাদন করাই প্রাণধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেঁচে থাকার জন্যে খাওয়া নয়, খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকা। সেই কোন বালকবেলায় কলকাতার একটা চাটার্ড ফার্মে আর্টিকল ক্লার্ক করে অনাদিকে ঢুকিয়ে দিল. বাবা, কিরকম চেনাশোনা। অফিসেই থাকতো প্রথম প্রথম, পরে....। জনাইয়ের মুখুজ্জে বাড়ির ছেলে। বাড়িটা দূর থেকে দেখলে এখনও জমিদার বাড়ি বলে ভুল হয়। অচেনা কোনো লোক বাইরে থেকে দেখলে ভেতরের ছবিগুলো কল্পনাই করতে পারবে না।

অনাদি বাবার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ, অসহায়, নিরাশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কে ? ডাক্তারবাবু ?

পাশে দাঁড়িয়ে মা বলল—আজকাল কেউ ঘরে ঢুকলেই মনে করে ডাক্তারবাবু এয়েছে।

খাট বিছানা কিছু নেই ঘরের মধ্যে। মেঝের একপাশে মাদুরের ওপর শতরঞ্চ পাতা। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী ফুলে যাওয়া পেট ও পা, কোমরে একটা ময়লা ধুতি আল্‌গা করে জড়ানো, বুকের দিকটা ক্রমশ মাত্রাতিরিক্ত সরু হয়ে গেছে, চোয়াল বসা, চোখ-দুটি যথেষ্ট ঘোলাটে অথচ তীব্র, আকুতিময়। মানুষটাকে বাবা বলে মেনে নিতে কিরকম যেন অসুবিধে হচ্ছিল অনাদির।

—ডাক্তারবাবু নয়, আমি অনাদি। তুমি কি এখন আর নিজের ইচ্ছে মতন ওষুধ খাও না ? হঠাৎ তোমার এত ডাক্তার-ডাক্তার বাই হল।

অনন্ত মুখার্জির চোখগুলো হঠাৎ যেন নিভে গেল। বললেন—ওহ্ অনু। আমি ভাবলুম ডাক্তারবাবু।

মায়ের দিকে ফিরতে তিনি বললেন—রোজ একজন করে নতুন নতুন ডাক্তার চাই। এই এক নতুন বাতিক হয়েছে। ওষুধ তবু খাবে না কারুরই। শুধু বসিয়ে বসিয়ে বকর বকর করবে। এটা কি। ওটা কেন।

অনাদি বলল—ও, তাই বলো।

গাড়ি জোগাড় করে বাবাকে নিয়ে কলকাতা পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। কলতলা থেকে বেরোতে দেরি করার অপরাধে এক কাকা বাবাকে মাসখানেক আগে ঠেলে

ফেলে দিলে শিরদাঁড়ার নিচের দিকের হাড় ভেঙে যায়। তারপর থেকে উঠে দাঁড়াতে পারতো না বাবা। তিন চার জন মিলে ধরাধরি করে চেয়ারে বসিয়ে ট্যাক্সিতে তোলার সময় বাড়ির অন্যান্য লোকেদের একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গিয়েছিল। একজন লোককে হঠাৎ চেয়ারে বসিয়ে ট্যাক্সিতে তোলা হচ্ছে—দৃশ্যটা দেখার উপযুক্ত যেমন, ঘটনাটা ঘটল কেন, কারণটাও তো জানা দরকার সকলের।

কলকাতায় এসে অনাদির অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হল। দুটো সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্নি ডাক্তারদের ধর্মঘট। ইমার্জেন্সিতে কেউ নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, পেট ফুলে ঢোল, চার-পাঁচদিন কিছু খেতে পারছে না—এরকম একটা পেসেন্ট নিয়ে সেসব জায়গায় বেশী সময় নষ্ট করলো না অনাদি। মাকে বললো—কলকাতার হাসপাতালগুলোর এই হাল হয়েছে, আমি জানতাম না। কি করি বলো তো।

ট্যাক্সিওয়ালা বিরক্ত হচ্ছিল। মোটামুটি শস্তা একটা নার্সিংহোম পাওয়া গেল ট্যাক্সিওয়ালারই দৌলতে। আবার ধরাধরি, তবে এবার লম্বা লম্বা ডাণ্ডা-লাগানো চেয়ার পাওয়া গেল, পেশাদার লোকও পাওয়া গেল সহজেই। টাকা ফেললে কলকাতায.....।

দেড়শো টাকার কেবিন। ছোট্ট ঘর। আয়া পঁচিশ টাকা রোজ। ডাক্তার পার ভিজিট দুশো টাকা। সব ব্যবস্থা করে মা-কে নিয়ে বেহালার ফ্ল্যাটে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা।

অসুবিধাটা শুরু হল রাত সাড়ে এগারোটার পর। মন্দিরা চলে যাবার পর গত আড়াই বছর বলতে গেলে একটা দিনও অনাদি মদ ছাড়া ঘুমোয়নি। মন্দিরাবিহীন বিছানায় সে বিনামদে একা রাত কাটানোর কথা ভাবতেও পারে না। অনাদি মদ্যপ অবস্থায় থাকলে মন্দিরা অবশ্য ছেড়ে কথা বলতো না কোনদিনই। যতক্ষণ জেগে থাকতো হিস হিস করে বিষ ঢালতো অনবরত পাশে শুয়ে শুয়ে। নিজস্ব পুরুষদের বিভিন্ন দুর্বল জায়গাগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শান্তভাবে নিরন্তর অপমান করে যাওয়ার এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতা থাকে বাঙালি মেয়েদের। মন্দিরারও ছিল। একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। অনাদির মনে পড়লো—শেষদিকে রোজ স্বপ্নই দেখতো অনাদি—মন্দিরার সঙ্গে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। সেসব স্বপ্নের কথা সকালে মন্দিরাকে বললে হাসতে হাসতেই মন্দিরা বলতো—তোমার তো মোক্ষলাভ হয়ে গেছে দেখছি। রোজ নিজের বৌ-কে স্বপ্ন দেখো। তা-ও ঝগড়ার স্বপ্ন। ভাবা যায়। এসব কথা মনে পড়তে অন্ধকারে অনাদি হাবা শেয়ালের মত হাসলো। পাশের ঘরে মা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত।

রাত বাড়লে চিন্তা বাড়ে, ঘুম না এলে চিন্তারা দুশ্চিন্তা হয়ে যায়। এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় স্পষ্ট টের পেল অনাদি, পেটে মদ না পড়লে তার এই অস্থিরতা কাটবে না এবং মৃত্যুপথযাত্রী বাবার জন্যে তার বিন্দুমাত্র মনোকষ্ট হচ্ছে না। দীর্ঘ অদর্শনে, মা-বাবা সম্পর্কে যাবতীয় অনুভূতি কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে অনাদির। তবু, মা বেঁচে আছে, তাঁকে দেখা দরকার, বাবার শেষ চিকিৎসার জন্যে

প্রাণপণ চেষ্টাও করা দরকার। কিন্তু সব দায়িত্বই শুধু অনাদির ঘাড়ে কেন? বড়দা চণ্ডীগড়ে থাকে, তাকে টেলিগ্রাম করা দরকার। আর এক ভাই বেহালাতেই, তারাতলার ওদিকে থাকে। সে এত কিপ্পুস যে এক পয়সাও দেবে না, তবু তাকেও তো খবর দেওয়া দরকার। মাকে পাঠাতে হবে একবার। আর এক ভাই সন্ন্যাসী, অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের। বাবার খবর তাকে জানিয়ে অবশ্য কোন লাভ নেই। তার অন্য বাবা আছে।

বাবা মানে কি?

জন্মদাতা মাত্রেই যে বাবা হয় না, অনাদির নিজের বাবাই তার প্রমাণ। ভদ্রলোককে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কিছুতেই বাবা বলে মনে হল না। অন্তত 'বাবা'-এই শব্দটির মধ্যে যে বুক ভরে যাওয়ার একটা আশ্বস্ত অনুভূতি আছে, সেটা কোনদিনই পায় না অনাদি। কেন পায় না? বাবার মত কাজ ভদ্রলোক কোনদিন করেননি বলে? অলস ও আরামপ্রিয় ছিলেন বলে? ঘটি-বাটি সব বসে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে? পুরুষালি দাপট ছিল না বলে? কিন্তু সৎ ও ধর্মভীরু ছিলেন, ব্যবসার নামে ছিঁচকেমি করতে পারতেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও.....। অনাদি কিছুতেই তাঁকে ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারেন না। কিন্তু অসুস্থ, পেট-পা ফুলে যাওয়া মানুষকে নিয়ে এত বিচার চলে না, মানুষটা যখন সম্পর্কে বাবা, তখন তো চলেই না।

বিনিদ্র অনাদি উঠে বসে একটা সিগারেট ধরালো। কাল সকালে মনোহরপুকুরের নার্সিং হোমে ছুটতে হবে। এখন কিছুদিন অফিস যাওয়া যাবে না। সেটা ভালই লাগবে। জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। ঘড়িতে সময় দেখল অনাদি, পৌনে দুটো। পাশে তারিখটাও চোখে পড়ে গেল—তেইশ। আরে, কাল তাহলে বাইশ তারিখ ছিল। ইস্ খুব ভুল হয়ে গেছে। কাল সন্ধে ছটায় কাবেরীর সঙ্গে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, একদম ভুলে গেছে অনাদি। অবশ্য তখন বাবাকে নিয়ে মেডিকেল কলেজ, পি জি, নীলরতন এসব জায়গায় ঘুরছিল অনাদি—ডাক্তারদের স্ট্রাইক, সিট নেই, এসব দেখতে দেখতে কাবেরীর কথা মনে ছিল না। অমার্জনীয় অপরাধ, নিঃসন্দেহে। কাবেরী মন্দিরার কলিগ, মন্দিরার কাছে অনাদি সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে শুনতে প্রেমে পড়ে গেছে। ডিভোর্স পেয়ে গেছে শুনে বিয়ের দিকেই এগোচ্ছে ব্যাপারটা। কাল কিছু জরুরী কথা ছিল। খুব ভুল হয়ে গেল। কাবেরী কি ক্ষমা করবে এই অপরাধ? সিগারেট শেষ করে এক গ্লাস জল খেল অনাদি। বাবার অসুখের ওপর দিয়ে সব পার হয়ে যাবে।...

কিন্তু কাবেরীকে বিয়ে করা কি ঠিক হবে? কেমন লাগবে কাবেরীকে। বিয়ে হচ্ছে না ধরনের বাঙালি মেয়েদের তো কোন অভাব নেই এদেশে। কিন্তু তা বলে নতুন করে নিগোশিয়েশন করাও সম্ভব নয় এই বয়সে। তার চেয়ে অযাচিতাভাবে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই কি ভাল নয়। বিশেষ করে, দুর্বলতাটা যখন পাত্রীপক্ষেরই। নতুন করে প্রেমে বিগলিত হবারও বয়েস নেই অনাদির। আবেগের চেয়ে এখন মাথার মধ্যে হিসেবই কাজ করে বেশী। কাবেরী যৌথ পরিবারের মেয়ে, বাড়িতে

এন্তার লোকজন। সেদিক থেকে অনাদির ফাঁকা ফ্ল্যাটে থাকার আরামটা তার পক্ষে কম লোভনীয় নয়। অচেনা স্বামীর চেয়ে অচেনা পরিবারকেই মেয়েরা ভয় পায় বেশী। বিশেষত শাশুড়ি এবং অবিবাহিত ননদ থাকলে...। সেদিক থেকে অল্প মাতাল হলেও, কম বেশী দুঃখী মানুষ হলেও, মেয়েদের ওপর এমনিতে তিতিবিরক্ত হলেও—হাজব্যান্ড হিসেবে অনাদি কি বেশ সুবিধেজনক নয়। অনাদির দিক থেকে দেখলে, কাবেরী বেশ নরম মনের মেয়ে। মন্দিরার মত মেজাজি বা উগ্র স্বভাবের নয়। বিশেষত সে যখন মন্দিরার বন্ধু, জেনেশুনে যখন....।

ভাবতে ভাবতে অনাদির চু-চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল।

ক'দিন পরে, রাত্রে হিসেব করছিল অনাদি। আগেকার মত। দিনের হিসেব প্রতিদিন লিখে রাখার এই অভ্যেসটা করিয়েছিল মন্দিরাই। চিরকালের বেহিসেবী অনাদি, মন্দিরার চাপে কিছুটা হিসেবী তো হয়েছিল অন্তত। পরে আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। বহুদিন পর, হিসেব লিখতে বসে বেশ অন্যরকম লাগছিল। বাবার অসুখ—ওপরে লিখে আন্ডারলাইন করল আগে। জনাই থেকে ট্যাক্সি—চারশো বাইশ টাকা। নার্সিং হোম একশো পঞ্চাশ ইন্টু পাঁচ—সাতশো পঞ্চাশ। ওষুধ—একশো বিরাশি। ওখার্ডের রিপোর্ট—ব্লাড, ইউরিন, স্টুল, এক্সরে—তিন হাজার সাতশো পঁচিশ। বেহালা থেকে মাকে নিয়ে নার্সিং হোম অবধি ট্যাক্সিভাড়া—সকাল বিকেল—দিনে চারবার—গড়ে চল্লিশ টাকা করে—দিনে একশো ষাট টাকা ইন্টু পাঁচ মানে আটশো পুরো। তার মানে পাঁচদিনে প্রায় পাঁচ হাজার বেরিয়ে গেছে। আরও কত যাবে কে জানে। টাকাটা কি বাজে খরচ হচ্ছে না?

চণ্ডীগড় থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে দাদা এসে গেছে। প্রথম দিনেই ডাক্তারকে বললো—বাবার যে অবস্থা দেখছি তাতে তো মরে যাওয়াই ভাল মনে হচ্ছে। আপনার কি মনে হয়. কত দেরি?

চাকরিসূত্রে বাইরে থাকলে কি মানুষের মানসিকতা এইরকম হয়ে যায়? পাশে বসে অনাদি বেশ বিরক্ত হচ্ছিল। ডাক্তার কিন্তু স্মার্টলি বললেন—ডাক্তার বলে তো আর ভগবান নই আমরা। আপনার বাবা ঠিক কবে মারা যাবেন তা যেমন আমি বলতে পারি না, তেমনি—দু-এক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যাবেন—সেটাও বলবো না। কেসটা খারাপ। রিপোর্টে দেখছি—হার্ট লাং কিডনি ঠিক আছে। পেটে ফ্লুইড জমছে কেন, দেখা দরকার, ফ্লুইডটা এবার টেস্ট করবো। আশা করছি—লিভারে ক্যান্সার পাওয়া যাবে। ইন দ্যাট কেস, ক্যান্সার হসপিটালে না নিয়ে, যেহেতু বডিতে কোন প্রোটিন নেই, দিন পনেরো কিছু খেতে পারছেন না, আপনারা বাড়িতেই নিয়ে যেতে পারেন.....নুন চলবে না, দু-বেলা এই ইঞ্জেকসনগুলো....আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। ফ্লুইডটা টেস্ট করা হোক।

ক্যান্সার ছিল। ফ্লুইডের টেস্টে পরিষ্কার লেখা—ম্যালিগন্যান্ট সেল সীন। তারাতলায় যে ভাই থাকে, সে একদিনও আসেনি। উল্টে, হাসপাতালে না দিয়ে নার্সিং হোমে যাওয়ার জন্যে রাগ দেখিয়েছে। বাবার মৃত্যু বা চিকিৎসার চেয়ে তার

কাছে নার্সিং হোম না হাসপাতাল—এই বিতর্কের গুরুত্ব বেশী।

বাড়িতে·আনার পরে দাদা শুধু বাবার বুকে হাত বোলাতে লাগল, আর বলতে লাগলো—তোমার কষ্ট হচ্ছে ? তোমার কষ্ট হচ্ছে ?

বাবা একটা শূণ্যতাময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে বলতে লাগলেন—কতদিন কিছু খাইনি।

এইভাবে আরও পাঁচদিন কেটে গেল। মাসী, পিসি, কাকারা যাতায়াত শুরু করেছে খবর পেয়ে। এর মধ্যে বাবা একদিন চিঁচিঁ করে বললেন—অনু কোথায় ?

অনাদি কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেক কষ্টে অনন্ত মুখার্জি বললেন—তুই আবার বিয়ে কর। আমি দেখে যাই।

অনাদি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কাবেরীর কাছে গেল। সেখান থেকে কালীঘাটে। বন্ধুদের নিয়ে সামান্য মিষ্টিমুখ করে, হাতে রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে, নববধূর পোশাকে কাবেরীকে নিয়ে, নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে, কলিং বেল বাজাবার আগেই—ভেতর থেকে মায়ের আর্ত ক্রন্দন শুনতে পেল অনাদি—ওগো, তুমি কোথায় গেলে গো—

অনাদি দেখল—কাবেরী তার দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। অনাদির মনে হল—বাবা শুধু নয়, বাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক অনাদিও এই মুহূর্তে মারা গেল।

অনেকটা যেন সেই অন্য অনাদির শোকে, অনাদির দু-চোখ ভরে এল জলে।

এই প্রথম।

নতুন মানুষ

যতবারই দেখি, ততবারই নতুন দেখি তোমাকে। বিশাখা হাসলেন। গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। একসময় গোলাপের পাপড়ির মত ছিল, বোঝা যায়। এই অস্পষ্ট হাসিরও অন্যতর মাত্রা ছিল তখন। সুচেত জানে। তার মনে আছে। প্রলয় পালিত তখন এখনকার মত এতটা বিখ্যাত লেখক হননি। হালকা একটি ছিপছিপে ধরনের মিষ্টি চেহারা ছিল বিশাখার, প্রলয় পালিতের স্ত্রীর। সুচেত বিশ্বাস তখন নিতান্তই একজন অতি তরুণ কবি ছাড়া আর কিছু ছিল কি ? ছিল না। কবি হিসেবে প্রলয় পালিতের তখন বিশাল দাপট। দু তিনটে উপন্যাসও বেরিয়েছে। বিশাখা তখনও সন্তানের জননী হননি। প্রলয় অবশ্য পরের দিকে পুরোপুরি উপন্যাসেই ভিড়ে গেলেন। সে কি শুধুই পয়সার চাপে ? টাকা-পয়সা করার চাপ তো আসলে বিশাখার চাপ। দেখে কিন্তু বিশাখাকে— মহিলা হিসেবে খুব একটা স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন বলে মনে হয় না। অন্তত সুচেত বিশ্বাসের মনে হয়নি কখনো। তবে শুধু বাইরের চেহারা দেখে মহিলাদের বিচার করার তো কোনও মানে হয়না।

মোট কতবার দেখা হয়েছে জীবনে, সুচেতের সঙ্গে বিশাখার, মোট কতবার নতুন দেখেছেন বিশাখা সুচেতকে— সাত আটবারের বেশি নয় নিশ্চয়ই। তবু একই মানুষকে সাত আটবার এক জীবনে নতুন নতুন লাগা কি কম কথা। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ সারাজীবন একইরকম থাকে যেখানে। প্রলয়ের সঙ্গে যদিও অসংখ্যবার দেখা হয়েছে সুচেতের— কিন্তু প্রলয় কখনও এসব কথা বলেননি। এবং সুচেতেরও প্রলয় পালিতকে 'নতুন' কখনও লাগেনি। প্রলয়ের স্ত্রীর তাহলে সুচেত বিশ্বাসকে এত নতুন লাগে কেন।

প্রলয় পালিতের উত্থানটা অবশ্য চোখের সামনে ছবির মত দেখেছে সুচেত। অবিরাম লিখে যাওয়ার একটা অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আছে প্রলয়ের, সেই সঙ্গে আছে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা সহজাত দক্ষতা, বড় কাগজে ঢোকার পর দেখা গেছে— নিজের অস্তিত্ব প্রবলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কলকাঠিও তিনি নাড়তে পারেন বেশ নিপুণভাবেই। প্রথম দিকে, সমসাময়িক কয়েকজন কাবিকে একত্রিত করে 'বাল্মীকি' পত্রিকার সম্পাদনা— তারপর হঠাৎ বিদেশ চলে যাওয়া— ফিরে এসেই কলকাতার বৃহত্তম সংবাদপত্রে চাকরি— তারপর আর থামতে হয়নি প্রলয়কে।

শ্যামবাজার থেকে ঢাকুরিয়া, ঢাকুরিয়া থেকে গড়িয়াহাটের বিশাল বিলাসবহুল ফ্ল্যাট— প্রতি শারদীয়ায় পাঁচ-ছ'খানা করে উপন্যাস ছাড়াও সারা বছর দু-তিনটে ধারাবাহিক— এর সঙ্গে লেখার প্রতিযোগিতায় যাবার কথা অন্য কোনও লেখকই চিন্তা পর্যন্ত করেন না। নিজের গাড়ি, অসামান্য ভদ্রতাবোধ, রোজ অন্তত একশো দর্শনপ্রার্থীর বিভিন্ন আব্দার সামলানো— নাহ্, ভাবা যায় না। আর সুচেত? খড়দহের দর্মার বেড়ার ঘর থেকে কলকাতার মেস, ইংরেজি এম এ পরীক্ষার হল থেকে উঠে আসা— দমদম, উল্টোডাঙ্গা, বাঘাযতীন নানান জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত হয়ে বিরাটিতে ফ্ল্যাট— আর সরকারি চাকরির নিশ্চয়তা— এর বেশি কিছুই করে উঠতে পারেনি। লিখে যাওয়ার একটানা ধারাবাহিকতা অবশ্য তারও আছে। ছোট-বড় মিলিয়ে গোটা আষ্টেক কবিতার বই— চারটে গল্পের বই— একটা উপন্যাস— একটা প্রবন্ধের বই। সব মিলিয়ে নিজের সমসাময়িকদের তুলনায় সে সম্ভার নিতান্ত তুচ্ছ না হলেও প্রলয় পালিতের কাছে নস্যি। লাভ এই— তার নামটা সাহিত্য রসিকেরা জানে, এছাড়া...। সংবাদপত্রে চাকরি না করলে, কিংবা নিয়মিত কেঁদো কেঁদো উপন্যাস না লিখলে তো, এদেশে সেভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-একজন অধ্যাপকের কথা অবশ্য আলাদা। সুচেত সামান্য কেরানি।

তাছাড়া সুচেতের যাবতীয় বই বেরিয়েছে নিজের চেষ্টায়, বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরই গরজে এবং খরচে। সংসারে অভাব ছিল ঠিকই, তবে চাকরি পাবার পর সুচেতের প্রকৃত মনোযোগ ছিল নিজের বই বের করার দিকেই। কলেজ স্ট্রিটে, কফি হাউসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন কবি সম্মেলনে নিয়মিত যাতায়াতের কারণে সুচেতের পরিচিতির পরিধি বেড়েছে ক্রমশ। নিজের পয়সায় বের করা নিজের কবিতার বই বিভিন্ন মানুষকে সই করে উপহার দিতে বেশ ভাল লাগতো সুচেতের। প্রলয় পালিতের সঙ্গে তখন দেখা হত নানা জায়গায়। পত্রিকা দপ্তরে, কবি সম্মেলনে, বিভিন্ন সেমিনারে, মদের আড্ডায়। প্রলয়ের শ্যামবাজারের বাড়িতে কোনওদিন যায়নি সুচেত। ঢাকুরিয়ার বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলা ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছিল তরুণতর এক কবির সঙ্গে। প্রলয় বাড়ি ছিলেন না। বিশাখার সঙ্গে সেদিনই প্রথম আলাপ। শালোয়ার কামিজ পরা ফুরফুরে কিশোরীর মত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ও তো বাড়ি নেই ভাই, ফিরলে বলবো'খন, তোমরা এসেছিলে। তোমাদের নাম কি? এসব প্রশ্নের উত্তরে সুচেত বলেছিল— খাওয়াবেন? লেবু চা? ভারি মিষ্টি হেসেছিলেন বিশাখা। লেমন-টি আমিও খুব ভালবাসি। তোমরা বসো তাহলে। ওর ফিরতে অনেক রাত হয় তো। সন্ধেগুলোয় আমার কিছু করার থাকে না। তোমরা এসে খুব ভাল করেছ। বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।... দ্বিতীয় দেখা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটির প্রেস রিলিজ উপলক্ষে পার্টি। একশোজন লেখকের একটি করে গল্প প্রবীণ থেকে নবীনতম

পর্যন্ত। সুচেতের গল্প ছিল শেষ দিকে। প্রধান সম্পাদক প্রলয় পালিত। পার্টি যখন তুঙ্গে— একধারে ভ্যাবলার মত দাঁড়িয়ে থাকা সুচেতের দিকে হাতে ভদ্কার গ্লাস নিয়ে প্রায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এলেন বিশাখা পালিত— শুধু ভাল ভাল গল্প লিখলেই হবে? এত উন্নাসিকতা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। সুচেত কোনওরকমে বলল— না, মানে...। আমি ঠিক সকলের সঙ্গে অবান্তর কথাবার্তা সবসময় চালিয়ে যেতে পারি না। বিশাখার মাথাটা একটু বাঁদিকে কাত হয়ে থাকে সবসময়। সেই ভঙ্গিতেই আবাব হাসলেন বিশাখা। অচেনা মহিলার কাছে লেবু-চা চাইতে অসুবিধে তো হয় না? কি যেন ছিল সেই মুহূর্তে বিশাখার চোখে। অপমান করার ইচ্ছে, না মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা? কিছু না ভেবেই সুচেত বলে ফেলল— ওরকম লেবু-চা রোজ রোজ পেলে আমি অনেক বড় লেখক হতে পারতাম। এবার প্রায় হেসে লুটিযে পডলেন বিশাখা। শুধু লেবু-চা পেলেই? বলতে বলতে হাসতে লাগলেন সমানে। হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বললেন— তোমার গল্প পড়ে যেন মনে হয়, বাবার ওপর তোমার খুব রাগ। এত রাগ কেন? মাথা নিচু করে সুচেত বলল— আমার বাবা একটা অপদার্থ। বিশাখা বললেন— ছিঃ। ওভাবে বলতে নেই। সুচেত গম্ভীরভাবে বলল— আপনি তো আমার কথা কিছুই জানেন না। কেন শুধু শুধু...। এবাব অল্প বক্র হল বিশাখার ওষ্ঠ। আমাকে তুমি হাবাগোবা বডলোকের মেয়ে ভাবো, না? আমি জানি। গরীবদের একটা বিশ্রী অভিমান থাকে, অহংকার— বাজে। একপেশে চোখে জীবনকে দেখা কিন্তু একজন লেখকের পক্ষে ক্ষতিকর। বলেই অধিকতর বিখ্যাত লোকজনদের দিকে চলে গেলেন বিশাখা। ওভাবেই, ঘাড় কাত করে। এতক্ষণ চুপচাপ থাকলেও, এরপর একটু বেশিই মদ্যপান করে ফেলেছিল সুচেত বিশ্বাস। রঙিন চোখে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সুসজ্জিত লোকজন দেখতে দেখতে সুচেতের মনে হচ্ছিল, এই সন্ধেবেলায় খড়দহ সিনেমাতলায় একটা পানের দোকানে ক্রমাগত পান সেজে যাচ্ছে এক বৃদ্ধ, তার বাবা। কলকাতায় পালিয়ে না এলে আজ তাকে ওই পানের দোকানে বসে একই ভঙ্গিতে পান সাজতে হত। ...হল থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দি সিনেমার যেমন কিছুই মনে থাকে না, প্রলয় পালিতের উপন্যাসও তো আসলে তাই— অন্তত বেশিরভাগ। ভাষার প্রসাদ গুণ ছাড়া কি আছে প্রলয়ের? তার স্ত্রী হবার সুবাদে এত জ্ঞান দেবার সাহস পায় কি করে বিশাখা! বেশি বই পড়লেই কি বেশি জ্ঞান কিংবা বিচক্ষণতা হয়ে যায় মানুষের? একপেশে চোখে জীবনকে দেখা? জীবনের তুমি কি জানো বিশাখা পালিত। জীবনে সার্থক হয়ে ওঠার সূত্র হয়ত জানো। কিন্তু অভিজ্ঞতারও তো অন্য একটা দাম আছে। একজন লেখকের প্রকৃত সার্থকতা তো বোঝা যায় তার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে। এখন প্রলয় পালিতের যতই প্রতাপ থাক...।

চন্দননগরে এক মহিলা কবির বাড়িতে ঘরোয়া এক কবি সম্মেলনে একবার আমন্ত্রিত হয়েছিল সুচেত। সেখানে প্রধান আলোচক ছিলেন প্রলয় পালিত। সেই

মহিলা কবি অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে প্রলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুড়ঙ্গপথে তথাকথিত সার্থকতার তুঙ্গে উঠলেন— সেসব নেপথ্য রাজনীতির খবরাখবর তখন কিছু একেবারেই রাখত না সুচেত। আলোচনার মধ্যে সুচেতের কবিতা প্রসঙ্গে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলেন প্রলয় সেদিন। ফেরার পথে ট্রেনে খুব আড্ডা জমেছিল। হাওড়া স্টেশনে সকলে সমস্বরে 'উই শ্যাল ওভারকাম' গাইতে গাইতে, হাততালি দিয়ে দিয়ে একসঙ্গে টিকিট চেকারকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসা হল। চেকারকে ফাঁকি দেবার জন্যে, কোরাসে উই শ্যাল ওভার কাম শুরু করাটা ছিল পুরোপুরি প্রলয় পালিতের পরিকল্পনা। প্রলয় যে অনেক বড হবেন একদিন, এই সত্যের খানিকটা আঁচ সেদিনই প্রথম পায় সুচেত।

নিজের চেষ্টায় মানুষ যে অনেক দূর যেতে পারে সুচেত নিজেই তার প্রমাণ। তবে খুব বেশি কিছু করতে গেলে ভাগ্যেরও একধরনের সহায়তা দরকার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। আজ বোঝে সুচেত, অন্তত প্রলয়কে দেখে। বড় কাগজের সম্পাদক যাকে ডেকে উপন্যাস লিখতে দিয়েছিলেন, অফিসের কাজ বলতে যার দায়িত্ব ছিল স্রেফ অরণ্যদেব অনুবাদ করা, সে আজ কতদূর যে চলে গেছে। শুধু নিজের চেষ্টায় এতটা হয় না। সরকারি চাকরি করে কবিতা হয়তো লেখা যেতে পারে, সফল গদ্যকার কি হওয়া যায় সেভাবে? অন্তত এমন বিপুল পরিমাণ গদ্য কি লেখা যায়? সুচেত জানে না! কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প হয়তো বলা যেতে পারে। সুচেত তা লেখেও। কিন্তু বাংলায়, শুধু কবিতা আর গল্প লিখে এই গগনচুম্বী খ্যাতি অর্জন করা যায না। তার জন্যে উপন্যাস ও সংবাদপত্রের সহায়তা দরকার— অন্তত আমাদের দেশে. সেই সঙ্গে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়ানোর অফুরন্ত সুযোগ। সুচেত যা এই জীবনে পাবে না এমনিতে।

লেখক মহলে প্রলয়ের চেয়ে বেশি যোগাযোগ ও ক্ষমতা আর কারও নেই। টিউশনির টাকা জমিয়ে একবস্ত্রে পান-দোকানের মালিক উচ্চাশাহীন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সুচেত কলকাতায় পালিয়ে এসে আজ যেখানে পৌঁছেছে, সেখান থেকে তার ফেরা তো যায়ই না বরং এখন তাকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। এমন কিছু একটা তার করা উচিত, যাতে তার এই আপনজনদের পরিত্যাগ করে শহরে পালিয়ে আসাটা অর্থবহ হয়ে ওঠে। লেখাপড়া শিখে সরকারি চাকরি পেয়ে বিরাটিতে ফ্ল্যাট কেনা পর্যন্ত— অর্জন হিসেবে খুব সাধারণ নয় কি ? খড়দহের বাঙাল কলোনিতে সে ফিরে যেতে চায় না। মেয়েরা উচ্চাশার পরিপন্থী হয় বলে সে প্রেম বা বিবাহ করে উঠতে পারেনি। এসবের চেয়ে সে একটু বেশি কিছু করতে চায়। লেখা ছাড়া তার হাতে দ্বিতীয় কোনও উন্নতির অস্ত্র নেই। এই পরিস্থিতিতে, সুচেত খবর পেল, বিশাখা গোলাপফুল খুব ভালবাসে। এবং তার একমাত্র ছেলে খড়গপুর আই আই টি-র একজন নামকরা ছাত্র। এবং সন্ধেবেলা প্রলয় বাড়ি থাকেন না। প্রায়ই তাঁর বিভিন্ন সভাসমিতি, উদ্বোধন, ফিতে কাটা কি কবিসম্মেলন ইত্যাদি থাকে।

সুচেত একদিন সন্ধেবেলা নিউ মার্কেট থেকে নানা ধরনের গোলাপগুচ্ছ কিনে প্রলয়ের বাড়ি চলে এল। বিশাখা দরজা খুলতেই গোলাপের তোড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলল— আমার বাগানের। শুধু আপনার জন্যে। মনে মনে বলল— প্রলয় পালিতের অনুগ্রহ ছাড়া আমার পক্ষে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। এদের সুনজরে থাকতেই হবে।

গোলাপ পেয়ে বালিকার মত উচ্ছল হয়ে উঠলেন বিশাখা। নিজের হাতে চাউ রেঁধে খাওয়ালেন সুচেতকে। ছোটবেলার গল্প বললেন নিজের। ছেলে চিঠি দেয় না বলে জানালেন। প্রলয় অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর সকালে উঠে অফিস চলে যায়। প্রায় দিনই কথা পর্যন্ত বিশেষ হয় না, এমনও বললেন। তারপর সেই কথাগুলো বললেন। তোমাকে আমি যতবার দেখি নতুন দেখি। প্রথম দিন শুধু গোঁফ ছিল আর খু-উ-ব রোগা ছিলে। দ্বিতীয়বার যখন দেখলাম, মুখ ভর্তি দাড়ি আর অদ্ভুত অহংকারী ভাব, যেটা আগে ছিল না। তারপর দেখলাম, গোঁফ দাড়ি কিছু নেই— বেশ একটা নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়েছে, চোখে-মুখে কেমন যেন একটা চালাক চালাক কুণ্ঠা...। হঠাৎ কথা পাল্টে, আচ্ছা, তোমার প্রেমিকা আছে?

সুচেত অধোবদনে উত্তর দিয়েছিল— নাহ্।

আবারও বালিকার মত খিল খিল করে হেসে উঠলেন বিশাখা— ওমা, সেকি। প্রেম করো না? তাহলে লেখ কি করে?

এইখানে একটু ভুল করে ফেলল সুচেত। বলল— আমি তো প্রলয়দার মত বারান্দায় নীল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের সাজানো সুখ-দুঃখের কথা লিখি না।

সামান্য গম্ভীর হয়ে বিশাখা বললেন— দারিদ্র্যের অহংকারটা তোমার এখনও যায়নি দেখছি। জীবনের সব স্তরকে না জানলে কিন্তু বড় লেখক হওয়া যায় না।

'ধন্যবাদ।' বলে উঠে এসেছিল সুচেত। ভুল করেছিল। পরে একদিন কথায় কথায় প্রলয় যখন হঠাৎ বলেছিলেন— তোমার বাগানে আর গোলাপ ফুটছে না? সুচেতের নিজেকে বড় উলঙ্গ লেগেছিল তখন। মনে পড়েছিল, তার অনেক বন্ধুই প্রলয়ের কাছে যাতায়াত করে একই আশায় আশায়। তারা প্রায় সকলেই জানে সুচেত আসলে খড়দহের জবরদখল কলোনির এক পান-দোকানদারের ছেলে। তার গোলাপবাগান।

ক্রমশ বুঝে গেল সুচেত— অন্যেরা যে রাস্তায় তথাকথিত উন্নতির শিখরে ওঠে, সে রাস্তায় হাঁটা তার পক্ষে সম্ভব নয়! নিজের জন্য সে কাউকেই কিছু বলে উঠতে পারবে না।

গড়িয়াহাটের ফ্ল্যাটে, আর একদিন প্রলয়ের মুখোমুখি হয়েছিল সুচেত। অসম্ভব সাজানো-গোছানো সেই বিশাল ফ্ল্যাটে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সুচেত

প্রলয়কে বলেই ফেলল— এখানে, একজন কবি থাকে। এটা কি কবির ঘর? এখানে যে থাকে, সে কি কবি?

—কবি কি শুধু কুঁড়ে ঘরে থাকবে? ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর হাওয়াই চটি পরে ঘুরবে? তাও তো ঘুরেছি একদিন। জানো, কপর্দকহীন অবস্থায় বাঙলাদেশ থেকে পালিয়ে আসার সময়, রাত্রে, কারা যেন আমার গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে পালালো। শীতের রাত, ঠক ঠক করে কাঁপছি আর হাউমাউ করে কাঁপছি। মা বলল— কম্বল গেছে যাক্। তুই তো আছিস। আছে, তোমার জীবনে এবকম অভিজ্ঞতা?

মাথা নিচু করে সুচেত বলেছিল— এরকম নেই, অন্যরকম আছে।

প্রলয় বলেছিলেন— কবি কিরকমভাবে থাকবে, তার কোনও ধ্রুব সংকেত শেষ পর্যন্ত হয় না।

মনে মনে সুচেত কিন্তু ভাল লেখার সঙ্গে ভাল থাকার ইচ্ছেটাকে একসঙ্গে মেলাতে পারে না। সংবাদপত্রে চাকবি করতেই হবে, নামি দামি পত্রিকায় অন্তত শারদীয়া সংখ্যায় লিখতেই হবে, যেমন করে হোক? নাহলে তুমি কবি নও? প্রচার আর বিজ্ঞাপনই কি শেষ কথা? লেখার মধ্যে তেমন কিছু না থাকলে মানুষ তো একদিন তাকে ফেলে দেবেই। অযোগ্য মানুষের এই চোখ ধাঁধানো আপাত সার্থকতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে লাভ কি!

তবু কোথায় যেন একটা অসুবিধা হয়। মন ভোলানো মোটা মোটা উপন্যাস লিখে, সংবাদপত্রে চাকরি করার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, একজন লেখক ক্রমশ মোটা হয়ে যাচ্ছে— আর তার পাশাপাশি, আর একজন লেখক, সংবাদপত্রে চাকরি না করার কারণে প্রচারের সুযোগ বঞ্চিত, অবহেলা আর অবজ্ঞার পাহাড় ঠেলে ঠেলে যাকে জীবনের পথে এগোতে হয় প্রতিপদে—। শুধু 'ভাল লিখি' এই অহঙ্কার বুকে বয়ে বেঁচে থাকাটাই কি যথেষ্ট। সান্ত্বনার কথা, সৃষ্টিশীল মানুষেরা সাধারণত একটু অন্যরকম হয়ে থাকে।

একবার, হার্ট অ্যাটাক হল প্রলয়ের। নার্সিংহোমে গিয়েছিল সুচেত। কয়েকজন মহিলার সঙ্গে নার্সিংহোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বিশাখা। সুচেত অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, উদ্বিগ্ন হওয়া তো দূরের কথা, মহিলারা হাসি-ঠাট্টা করছেন নানা বিষয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল, বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা, প্রলয় শুয়ে আছেন অসহায় ভঙ্গিতে। বিছানার চারপাশে অনেক লোক দেখে বুকের ওপর হাতদুটো জড় করে প্রণামের ভঙ্গি করলেন। শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, আমি ভাল আছি। ভারি ভাল লেগে গেল সুচেতের। এত অসুস্থতার মধ্যেও ভদ্রতার বোধটুকু ঠিক আছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল— বারান্দায় একইভাবে মস্করা করছেন মহিলারা। এরা কি মনে করে নিজেদের? একজন মহিলা বললেন, এই বিশাখা, প্রলয়ের কাছে সবসময় যে নার্সটা থাকে, সে কিন্তু তোর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দরী। সুচেত বিরক্ত হয়ে

চলে আসছিল। বিশাখা হঠাৎ বললেন, আরে সুচেত এসেছো। তোমার কিন্তু চুল পাকছে প্রচুর। যেন সেটা প্রলয়ের হার্ট অ্যাটাকের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুচেত কোনও উত্তর দেয়নি।

তার পরের দেখা কবি ভক্তি ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে, কেওড়াতলা শ্মশানে। ভক্তি এই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি। প্রলয়ের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কলকাতার কবিকূল ভেঙে পড়েছিল শ্মশানে। হঠাৎ একপাশে বিশাখার সঙ্গে দেখা। ওমা, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ! কুঁজোও হয়েছে একটু। মাথার চুল এত পেকে গেল? তবে এবারও তোমাকে অন্যরকম দেখছি। যতবারই দেখি, ততবারই নতুন দেখি তোমাকে।

সেই ঘাড় কাত করা হাসি। প্রলয় ইতিমধ্যে একাদেমি পেয়েছেন। বয়স প্রায় ষাট। বিশাখার কি পঞ্চাশ পেরিয়েছে? বোধহয় পেরিয়েছে। শ্মশানে একটা মৃত্যুর গন্ধ থাকেই। মন খারাপ করা গলায় বিশাখা হঠাৎ বললেন— আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে? যদি হয়, তখনও কি নতুনরকম দেখবো তোমাকে?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সুচেত। মনে হল, এবার সে সত্যিই নতুন মানুষ হয়ে যাবে।

লেখক তো অনেকেই হয়। সে না হয় একটু মানুষ হবে। দেখলেই যাকে নতুন লাগবে আর একজনের।

মানুষের স্বভাবচরিত্র

দেখলি তো, আমি ঠিক ধরেছি। দেখেই বুঝেছি—বাউনের ছেলে। বিপাকে পড়ে মাইনষের কত কি হয়, তা বলে ঘেন্না করতে আছে। ওই জন্যে বললুম—কেউ না ছোঁয় না ছোঁবে, ওর কাজ আমি করব। আহা, কি চেহারা। এককালে বড় ঘরের ছেলে ছিল গো।

আয়াদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বাবার বেডের পাশে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল রুনু। যাকে নিয়ে গবেষণা তাকে গতকাল রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল স্থানীয় লোকজন। অচেতন, কর্দমাক্ত, অজ্ঞাতকুলশীল দেহটা মেঝেতেই লক্ষ করেছে রুনু।

আয়াদের কথাবার্তা ছেড়ে, বাবার বেড ছেড়ে, হাসপাতালের ওয়ার্ড ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল রুনু।

ঠিক তিন দিন হল বাবা কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারছে না। এতদিন তবু বলতে পারত—কিছু খেতে পারছে না। পাড়ার হাসপাতালে নিয়ে আসার আগে, কলকাতার নার্সিং হোমে একদিন ভিজিটিং আওয়ারে বেশ চেঁচামেচিই করে ফেলেছিল রুনু। সেখানেও একজন বৃদ্ধা আয়া ছিল, ভারি ভালমানুষ। বৃদ্ধা হলেও বেশ শক্তপোক্ত। অসীম দরদ নিয়ে বাবাকে দেখাশোনা করত। সেদিন বিকেলে—এখন কি কষ্ট হচ্ছে—জিগ্যেস করতে চিঁচি করে কোনরকমে বাবা সেই অনেকবার বলা কথাটাই আবার বলল—কিছু খেতে পারছি না। সেই বৃদ্ধা আয়াটি কেমন যেন খুশি খুশি গলায় জানাল—আজ তবু পেচ্ছাপ হয়েচে অনেকটা। তার দরদ দেখেই যেন হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেমন রুনু। নার্সিং হোমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠল—অনেক খেয়েছ তুমি সারাজীবন। আর খেতে হবে না। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অনেক নিয়ম আছে। সেসব তো আর মানলে না কোনওদিন। এখন চুপচাপ মরে গেলেই তো পারো। আমাদের এত ভুগিয়ে মারছো কেন।

রুনুর হঠাৎ চেঁচামেচি করে ওঠা দেখে বৃদ্ধা আয়াটি ছিটকে জানলার দিকে সরে গিয়েছিল। বাবা চোখ বুজে মুখ বিকৃত করে এমনভাবে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরলেন, হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে গেল রুনু। এভাবে মেজাজ হারিয়ে ফেলাটা ঠিক হল না। বুঝতে পেরে সচেতন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বাবার ওপরে রাগ তার আসলে অনেকদিনের। স্থানকালপাত্রের অপেক্ষা না করেই সেটা বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। ছোটবেলা থেকে বাবাকে সে নিজের মত

করে পায়নি কখনও। একটার পর একটা ব্যর্থ ব্যবসার চেষ্টা করতে করতে ভদ্রলোক সংসারের অন্য মেম্বারদের দিকে মনোযোগ দেবার সময় পাননি তেমন, দেওয়া যে দরকার, সেরকম ধারণাও ছিল বলে মনে হয় না, আজকাল রুনুর। ছোটবেলো থেকে সে দেখেছে, সন্তানদের কাছে ডাকবাব সময় বাবা চিরকাল ভুল নামে ডাকে। হয়তো ডাকতে চায় রুনুকে—মুখে বলচে—এই ঝুনু, এই টুনু, এই মুনু। তারা কাছে গেলে খিঁচিয়ে উঠতো—তোকে তো ডাকছি না আমি। আমি, আমি, আমি রুনুকে ডাকছি।

সারাজীবন কথাটা ভেবেছে রুনু। যে মানুষ নিজের সন্তানদের নাম পর্যন্ত মনে বাখতে পারে না, সে কেমন মানুয। অন্যদের বর্ণনামত তাকে সাদাসিধে বা ভোলেভালা ভাবতে সে খুব খুব চেষ্টা করেছে। কিন্তু —।

তারপর—ওই ব্যর্থতা। ব্যর্থ মানুষদের কোনাদিনই সহ্য করতে পারে না রুনু। নিজের বাবাকে একজন ব্যর্থ মানুষ ভাবতে তার একেবারেই ভাল লাগে না। অথচ মানুষটাব জীবনে সার্থকতা বলতে কিছুই নেই—এই সত্য রুনুর চেয়ে বেশি আর কে জানে।

প্রথমে, দাদুর হাতে তৈরি বিশাল কাপড়ের দোকানটা বিক্রি করে দেওয়া। তারপর, কলকাতার বাড়িটা। তারপর, গ্রামের জমিজমা। সবই নাকি, দেনা শোধ করার জন্যে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে, সংসার চালাবার জন্যে, বোনেদের ভাল ভাল পরিবারে বিয়ে দেবার জন্যে। সেসব তো রোজগার বাড়িয়েও করা যেত.....। মফস্বলের এই হাসপাতাল চত্বরে অনেক গাছ। সন্ধ্যের মুখে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে মনে মনে বাবার সঙ্গে কথা বলছিল রুনু. তার চির ব্যর্থ, অপদার্থ বাবার সঙ্গে—যে বাবা এখন মৃত্যুর অপেক্ষায়, অর্ধচেতন, অসুখটা ক্যানসার— অ্যাবডোমিনাল, কাল জানা গেছে। ম্যালিগনান্ট সেল সিন—রিপোর্টে লেখা ছিল। কলকাতার নার্সিং হোমের ডাক্তার জবাব দেবার পর—উত্তরপাড়ার এই জেনারেল হসপিটালে এনে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। ডক্টর নারায়ণ বলেই দিয়েছেন—ক্যান্সার হসপিটালে ট্রাই করে আর লাভ নেই। বাড়ি নিয়ে যান। আমি হলে তাই করতাম। এই ওষুধগুলো বরং—

আসলে তুমি খুব অলস লোক ছিলে বাবা। ভালমানুষ যে ছিলে তা ঠিক, তবে ভালমানুষ হতে হলে যে ব্যর্থ হতে হবে, অলস হতে হবে—তার তো কোনও মানে নেই। তুমি সৎ ছিলে তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ বোকাও ছিলে। সৎ হলেই যে বোকা হতে হবে—তারও তো কোনও মানে নেই। তুমি অত্যন্ত উদার ছিলে তা তো জানি—কিন্তু উদারতা দেখাতে গিয়ে যে সাধ্যের অতিরিক্ত দানশীল হতে হবে—তার তো কোনও মানে নেই। আসলে তুমি খুব আবেগপ্রবণ লোক এবং আবেগপ্রবণ মানুষদের যেন বিচক্ষণ হতে নেই কিছুতেই। নিজের অপদার্থতা ঢাকতে অন্যদের প্রতি অভিযোগপ্রবণ হতে হবে—এরও তো কোনও মানে নেই।

কাপড়ের দোকানটা যে চালাতে পারলে না—সে দোষটা কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চিত হয়ে রইলে সারাজীবন। তারা চোর। তুমি তাদের বিশ্বাস করেছিলে। তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা যদি তারা না রাখে, সে দোষ তোমার নয়। কিন্তু, প্রকৃত বাস্তবটা কি ? সারাদিনের কেনাবেচার হিসেব না মিলিয়ে তুমি নাইট শো-য়ে সিনেমা চলে যাবে—টাইপ শিখতে যাবে বুড়ো বয়সে শুধু এক যুবক টাইপিস্টের আঙুলের তৎপরতা তোমাকে হাইকোর্টের ফুটপাথে একদা মুগ্ধ করেছিল বলে— নিজের জীবনে কোনও প্রয়োজন না থাকলেও তোমাকে নিজের আঙুলে তুলে নিতে হবে সেই ঝড়—এই অদ্ভুত খেয়ালে তুমি মধ্যবয়সে চলে যেতে দোকান ছেড়ে টাইপ স্কুলে—কোনও মানে হয়। আর একবার—হঠাৎ একটা ফাংশন দেখে তোমার ইচ্ছে হল গান শিখবে। গানের মাস্টার ঠিক করে দোকান ছেড়ে দিয়ে রোজ গান শিখতে ছুটতে। কোনও মানে হয় ? মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক, সারাজীবন গানের ধার দিয়েও যিনি যাননি কখনও— রেডিওতে খেয়াল হতে শুনলে বন্ধ করে দিতে বলেন সঙ্গে সঙ্গে—তিনি হঠাৎ গান শেখার ঝোঁকে দোকানে ক্যাশ না মিলিয়েই রোজ যেতে লাগলেন গানের ইস্কুলে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এলেন—মেয়ের বিয়ে ? বেনারসী ? টাকা নেই ? চিন্তার কি আছে ? আমি তো আছি। নিয়ে যান না। দাম না হয় দেবেন পর সুবিধেমতন...এভাবে ব্যবসা হয়। একদিন মহাজনের থাকায় যা দেনার অঙ্ক দেখা গেল, দোকান বিক্রি না করলে সে দেনা শোধ করা সম্ভব নয় আর। ...তুমি ব্যবসায়ী যাকে বলে তা-ছিলে না ঠিকই—কিন্তু যতটা ভাল মানুষ সেজে থাকতে চাইতে, ঠিক ততটা তুমি ছিলে কি। ভালমানুষ থেকে অপদার্থতা কিন্তু খুব তেমন দূরের শব্দ নয়।

শ্রীরামপুরের ছোট পিসেমশাই আসছেন দেখে সিগারেট ফেলে দিল রুনু। গাছতলায় তাকে উদাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ বিরক্ত হলেন পিসেমশাই। এখানে কি করছ ? যাও যাও বাবার মুখে দুধ-গঙ্গাজল দিগে যাও।

এই পিসেমশাই ভদ্রলোক চারিত্রের দিক থেকে বাবার ঠিক উল্টো ধরনের মানুষ। যাকে বলে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানুষ।

বাবার ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। ছোটবেলায় এত আদরে মানুষ হয়েছেন ভদ্রলোক, পরিশ্রম করার অভ্যেসটাই গড়ে ওঠেনি। অবিবেচকদের মত সাত-সাতটা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে যাওয়া ছাড়া পুরুষত্বের আর কোনও প্রমাণ দেননি জীবনে।

রুনু তাই অনেকটা নিজের অজান্তেই যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছিল সেই কোন ছোটবেলা থেকেই—সে বাবার মত হবে না কিছুতেই। সবসময় সব ব্যাপারে চেষ্টা করত—সে যেন বাবার মত না হয়। ক্রমশ দাঁড়াল এমনই, যে বাবার সব কথার সব কাজের নিঃশব্দ প্রতিবাদ বা সমালোচনা না করলে ভাল লাগে না রুনুর। তার জন্যে নিজের চূড়ান্ত ক্ষতি যদি হয়ে যায় সে-ও ভাল। তবু সে বাবার মত হবে না।

চেষ্টা কিছু কম করেনি রুনু। ব্যবসা করতে গিয়ে বাবা লেখাপড়াটা করতে পারেননি ভাল করে। বাবার মত যাতে না হতে হয় তার জন্যে প্রচুর পড়াশোনা করল রুনু। বাবা নেশা করেনি কখনও। বন্ধুদের সঙ্গে ছোটবেলায় সিগারেট, বড় হয়ে মদ্যপান, মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে রুনু। একসময় রোজ বাড়িও ফিরত না। বন্ধুদের হস্টেলে শুয়ে পড়ত। জীবনকে নানাভাবে ছিনেছেঁকে দেখেছে রুনু। রাতে বাড়ি না ফিরে সারারাত হস্টেলে নেশা-আড্ডার শেষে সকালের দিকে সামান্য ঘুম দিয়ে বিধ্বস্ত রুনু যখন বাড়ি ফিরত—মা চেঁচামেচি করে উঠতো রীতিমত, আর বলতো—রাত্তিরে ফিরবি না সেটা বলে যেতে কি হয়? রুনু বলত—বলতে হলে তো বাড়িই ফিরতে হত। তোমার কি টেলিফোন আছে? বাবা বলত—বাড়ি না ফিরলে চিন্তায় ঘুমোতে পারি না সারারাত—রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। রুনু ঝাঁঝিয়ে উঠত—তোমার অত চিন্তার কি আছে? আমার কি হাত পা নেই, না বুদ্ধি নেই। বাবা বলত—ছেলে বাড়ি না ফিরলে বাবার যে কি হয়? সেটা বাবা হলে বুঝবি।

বাবা অবশ্য আজও হতে পারেনি রুনু। কাকা, জেঠা, মামা, মেসোমশাই, পিসেমশাই—সবই হয়েছে। শুধু বাবা বাদে।.....পিসেমশাই শব্দটা মনে পড়তেই মনে হল—আরে, রুনু যে আবার বিয়ে করছে সে কথা তো ছোট পিসেমশাই জানে না। বাড়িতে গিয়ে নতুন লোক দেখলে পিসেমশাই ঘাবড়ে যেতে পারে। বাড়ি পৌঁছবার আগে খবরটা দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে স্কুটারে স্টার্ট দিল রুনু। সাইকেল রিকশাগুলোর জন্যে জোরে চালানো যায় না। তবু ধরে ফেলল পিসেমশাইকে। স্কুটারে বসেই পাশে পাশে যেতে যেতে দুম করে কথাটা বলে ফেলল রুনু। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি পিসেমশাই। বাড়ি গিয়ে আপনি নতুন লোক দেখবেন। আমি আবার বিয়ে করেছি। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজটা করতে হয়েছে। তাই আপনাদের নেমন্তন্ন করার সময় পাইনি।

নতুন বৌয়ের হাতদুটি ধরে বাবার কান্নাকাটি করার কথা মনে পড়ল। আমার বাউন্ডুলে ছেলেটাকে তুমি দেখো বৌমা। ওকে থিতু হতে দেখলে শান্তিতে মরতে পারি আমি। একটা আজেবাজে মেয়ের পাল্লায় পড়ে ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল। ....চোদ্দটা বছর আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি, জানো বৌমা।........

সেসব কথা আর ভাবতে চায় না রুনু। আজকাল আশ্চর্য লাগে ভেবে, যাকে অনিবার্য ভেবে একদিন মা-বাবা-ভাই-বোন সব ছেড়ে এক কথায় চলে এসেছিল রুনু। চোদ্দবছর নিঃসন্তান অশান্তির দাম্পত্য কাটিয়ে একদিন সে-এ কেমন চলে গেল তাকে ছেড়ে।....এখন শুধু মনে হয় তাকে মেসোমশাই পিসেমশাই বলে ডাকবার লোকগুলো হঠাৎ পাল্টে গেল।

এরকম অভিজ্ঞতা অন্তত বাবার ছিল না। আলাদা থাকার সময় দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে রুনুর সঙ্গে দেখা করতে অফিসে চলে আসত বাবা। অফিসের লোকদের মাঝখানে মলিন পোশাকে বাবাকে দেখে কি-যে অস্বস্তি হত তখন। একদিন লুকিয়ে

বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলেছিল রুনু—চলো, তোমাকে একটা জামা করিয়ে দিই। ওভাবে ময়লা, জামাকাপড় পরে আমার অফিসে তুমি আসবে না।

বাজারে একদিন চোলাই মদওলা কিশোরী ঘোষের ছেলে বংশী বলেছিল—তোর বাবা তো মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সব ফুঁকে দিয়েছে। সেদিন রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল রুনুর। দু-একদিন পরে বাবা অফিসে দেখা করতে এলে ঘটনাটা বলেছিল রুনু। শুধু তোমার ছেলে বলে বংশীকে সেদিন মারতে বাকি রেখেছি। জানো ? বলেছিল। শুনে হেসেছিল বাবা। হাতে মেরে কি হবে ? বলেছিল—সবচে বড় প্রতিশোধ কি জানিস—শত্রুর চেয়ে তুই এত বড় হবি, সে যেন মাথা উঁচু করে তোকে দেখতে না পায়।...

সেদিন মনে হয়েছিল, এ যেন অন্য বাবার সঙ্গে কথা বলছে রুনু। এই বাবাকে সে একদম চেনে না।...

মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ঢুকে রুনু দেখল অনেক লোক, হঠাৎ মনে হতে পারে শোকের নয়, কাজের বাড়ি। যেন উৎসব হচ্ছে কোনো। বরানগরের মাসীমা এসেছে, মায়ের একমাত্র বোন। এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে দাদা এসেছে। পিসেমশাই যন্ত্রের মত মাঝে মাঝে বলছিলেন—মন শক্ত করুন বৌদি, চিরকাল তো কেউ থাকে না। মায়ের তাতে কিছু আসছে-যাচ্চে বলে মনে হল না রুনুর। দীর্ঘকাল কেউ অসুখে ভুগলে তাকে সবাই মোটামুটি খরচের খাতায় ধরে নেয় আসলে। ভাড়া করা লাল মারুতিতে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে বাবাকে যখন কলকাতার নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—ড্রাইভার ক্যাসেটে অনবরত হিন্দি গান বাজাচ্ছে বলে বাবা অত কষ্টের মধ্যেও বলেছিল—বাংলা নেই। মাসীমা এখন মাকে বলছে—তোমার মনে আছে দিদিমণি, শুভদৃষ্টির সময় জামাইবাবু তোমাকে না দেখে আমার দিকে হাঁ করে চেয়েছিল বলে আমরা কত হেসেছিলুম।

বাড়ির ভিতরে চারপাশের কোলাহলের মধ্যে চলাফেরা করতে করতে রুনুর মনে হল—নিজে অসুস্থ হয়ে বাবা তাকে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছে আবার। সে যাদের ছেড়ে দিয়েছিল একদিন, চোদ্দ বছর আগে, একজন মাত্র নারীর সঙ্গ পাবার লোভে। এই বাবাকে সে ঘৃণা করত। আরও মনে হল—বাবা যে মারা যাচ্ছে, এটা তেমন সত্যি নয়। মৃত্যুকে ঘিরেও এইসব মানুষেরা আসলে আনন্দে মেতে থাকতে চায়। এটা অনেক বেশি সত্যি। দুঃখে নয়, আনন্দে থাকাই মানুষের প্রকৃত স্বভাব।

নতুন বৌ সম্পর্কে পিসেমশাই কোনও আগ্রহ দেখালেন না, অনেকটাই যেন অনিমন্ত্রিত থাকার অভিমানে। মাকে বলতে লাগলেন—সবাইকে খবর দিন। জ্ঞানটা তো এখনও আছে টনটনে। সজ্ঞানে যেতে পারা—সবাইয়ের দুধ-গঙ্গাজল নিয়ে, অসীম ভাগ্যের কথা। হাসপাতালে তো হবে না, বাড়িতে নিয়ে এসে গীতাপাঠের ব্যবস্থা করুন না।....বোনকে ছেড়ে মা ননদাইয়ের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য

হয় কিছুক্ষণে জন্যে। ঘরে বসে খালি—একবার এ ওষুধ, একবার সে ওষুধ—এই করবে। আর রোজ ডাক্তার চাই—আজ এ ডাক্তার কাল ও ডাক্তার—তাও আবার ওষুধ দিয়ে চলে গেলে হবে না—সামনে বসে বকর বকর করতে হবে। ইদানীং বলত—ট্যাক্সি করে কলকাতা নিয়ে যাবে, রুনুকে বলবে—আমায় যেন উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে পোড়ায়। রুনুকেই ভালবাসত বেশি, বাউন্ডুলে তো।....

রুনু লক্ষ করল, মা এখনই অতীতকাল ব্যবহার করছে সব কথায়। বলতো, ভালবাসত।

একদিন, ফর্টি সেভেন বাসে বাবার দোকানের এক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা। সিট ছেড়ে উঠে বসতে দিয়েছিল। বাবুদের ছেলে না? আরে বড়বাবুর মুখটা বসান একদম। আমি দেখেই চিনেছি। আমার নাম দিলীপ—তুমি চিনবে না বাবা। বোসো, বোসো। বড়বাবু যে কি লোক ছিল, কেউ জানে না। রীতিমত কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল লোকটা ওই ভিড়ভর্তি বাসের মধ্যে। শালা চোর। বাড়ি হাঁকিয়েছে দমদমে। লোকটা বলেই যাচ্ছে—আমি কত বললাম বড়বাবুকে। কেন বিক্রি করছেন বড়দা, মাত্র এক লাখ টাকা দেনা, ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। আপনি শুধু ধার বাকি দেওয়া বন্ধ করে দিন—আমরা দেখছি। বড়বাবু কি বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন....দোকান না বিক্রি করলে আমার দেনাও শোধ হবে না। ছেলেগুলোও মানুষ হবে না—ছেলেদের মাথায় দেনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মরে যাব? তা কি হয়। আজকে এক লাখ টাকায় দোকানটা চলে যাচ্ছে যাক—একদিন দেখো, আমার এক একটা ছেলের দাম হবে একলাখ টাকা।

হঠাৎ একটা হাওয়া

বাবুকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে হবে পুলিশের হাতে, তারপর আবার ছাড়িয়ে আনতে হবে। অপুদাকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছে। খানিকটা যেন হিন্দি সিনেমার ভিলেনদের মত। ঠাণ্ডা মাথায় কঠিন কঠিন কথা যারা বেশ সহজে বলতে পারে। এসব কথা বলার সময় ভ্রূ পর্যন্ত কোঁচকালো না অপুদার।

অপুদাকে আগে কখনো দেখিনি। চিনতামও না। এ সবই বৈশালীর যোগাযোগ। থিয়েটার রোডের কুসুম গুপ্তার এই বিশাল বাড়ি। রেড লাইট এরিয়ার বাচ্চাদের ইস্কুল। ওখানকার মেয়েদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা। জবালা অ্যাকশন রিসার্চ প্রোগ্রাম। সত্যকাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। সব ওই রেডলাইট এরিয়ার 'কাজ' করার পরিকল্পনা। চাকরির পরেও বৈশালীর এত সময় থাকে। সোসাল কনশাসনেস। তবু তো লেখাপড়া শিখছে কটা সহায় সম্বলহীন বাচ্চা। বৈশালী বলে, শরীর বেচা মেয়েগুলো মস্তান আর পুলিশের উৎপাতে জেরবার হয়ে পচে মরা ছাড়াও জীবনের অন্য কোনও মানে শিখুক। এসব বলতে বলতে বেশ উত্তেজিত হয়ে যায় বৈশালী। আমার অবশ্য এসব নাগরিক শৌখিনতাকে বরাবর সন্দেহই হয়। তবু আজ সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বিশেষ করে কুসুম গুপ্তার মত ধনী অবাঙালি বৃদ্ধা কি করে...। স্বামীকে লুকিয়ে, বাড়ির লোকের অমতে...। কি দরকার ছিল তাঁর? থিয়েটার রোডের এই বিশাল বাড়ির বিলাসবহুল জীবন থেকে বেরিয়ে তিনি কোন নিষিদ্ধ এলাকার অবৈধ শিশুদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে চান। আমার তো কোনোদিন এরকম ইচ্ছে হয় না। তাছাড়া, ইচ্ছে হলেই বা উপায় কি। চাকরি করে, সংসারের সব দায়দাবি মিটিয়ে, এতসব সমাজসেবা করবার সময়ই বা কোথায়। বৈশালীর যদি ছেলেমেয়ে থাকতো।

জানলা দিয়ে তিনটে নারকেল গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে, হাওয়ায় দুলছে মাঝে মধ্যে। জানলাগুলো বেশ বড় বড়। থিয়েটার রোডের এদিকটায় এত গাছ আছে জানা ছিল না। এত বড় কোনো বাড়িতে এর আগে জীবনে ঢুকিনি। অফিস কামাই করে কুসুম গুপ্তার এই বিশাল বাড়িতে দুপুরবেলা বৈশালীর সমাজ সেবার আর্জেন্ট মিটিঙে আমার অন্তত বসে থাকার কোনো দরকার ছিল না। অফিস যাবার পথে বৈশালীর সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে...।

এক একদিন এমন এক একটা হাওয়া ওঠে। ব্রেবোর্ন রোডের রোজকার প্চা জ্যাম পেরিয়ে টি বোর্ড দিয়ে ঘুরে বাসটা যখন টেরিটিতে পোদ্দার কোর্টের সামনে এল, ততক্ষণে গেটে ঝুলতে ঝুলতে হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়েছি। মাটিতে পা রাখলেই রোজকার মত প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়-ওফ্, কোনো মানে হয় না। এইভাবে অফিস যেতে হবে। ট্রেন থেকে হাওড়ায় নেমেছি প্রায় চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। এদিকে দু-দিনের বেশি তিনদিন লেট হলেই একটা সি এল গচ্চা। ব্রেবোর্ন রোড জ্যাম তো সারাবছরই থাকে। চিরকালই কি তাহলে আমার ছুটি কাটা যাবে পর পর— লেট হবে, আর...।

বাস থেকে নামতেই এমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল গায়ে। আকাশে চোখ যেন আপনিই চলে যায় এরকম হাওয়া দিলে— হ্যাঁ, মেঘ আছে। তার মানে আজ গরমের তাপ অল্প কম থাকবে। অবশ্য বলা যায় না কিছু। আজকাল সবকিছুর মতন প্রকৃতিও এত এলোমেলো হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে পাল্টে যেতে পারে আবহাওয়া।

এই যেমন আজকের এই হাওয়াটা। সব গোলমাল করে দেওয়ার একটা মেজাজ ছড়িয়ে দেয় মনের মধ্যে। অফিস যাওয়ার কোনো বিকল্প তো সবসময় থাকে না। অথচ এরকম হাওয়া ছাড়লে কারই বা অফিসে ঢুকে ফাইল ঘাঁটতে ভালো লাগে। ঠিক তখনই টেরিটি বাজারের ফুটপাথ থেকে ভেসে এল বৈশালী। যেন আগাছায় ভরা ঘাটের দিকে নদীপথে ভেসে এল একগুচ্ছ কোনো তাজা ফুল। ফুটপাথের ফেরিওয়ালা, চারপাশের দোকানপাট, ভিড়, বাস, ট্যাক্সি, মিনি, ক্লান্তি— সব যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল মুহূর্তে। সাদা ধবধবে একটা কাকাতুয়ার মত মুখে একগাল হাসি ফুটিয়ে বৈশালী বলল, কিরে, এখানে? সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতিহীন বেরিয়ে এল একটাই উত্তর-আমিও তো সেটাই বলব ভাবছি। তুই, এখানে? এখন? বলতে বলতে দু'জনেই হেসে উঠলাম হাহা করে। যেন এর থেকে হাসির কথা আর কিছু হতে পারে না।

বৈশালী বরাবরই কথায় কথায় হাসে। বস্তুত, সে তার হাসিখুশি আড্ডাপ্রিয় স্বভাবের জন্যেই এত কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে একই সঙ্গে অনেকের। বহু ধরনের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ আছে বৈশালীর এবং যার সঙ্গে তার আলাপ থাকে, তারই সঙ্গে কেন যেন থাকে তার যথেষ্টরও বেশি অন্তরঙ্গতা। তাকে দেখেছি কলেজ স্ট্রিটে কফিখানায়, তাকে দেখেছি বইমেলায়, ফুরফুরে মেজাজে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে বক বক করছে অনবরত, ঘুরছে ফিরছে— এবং ওই, হাসছে যে কোনো তুচ্ছ কথায়, হাসির কথায় তো বটেই। সেই বৈশালী, এখানে, এই টেরিটি বাজারে। যতদূর জানি ওর অফিস তো সেই সল্টলেকে।

আমি বলার আগেই যেন মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে একটা কথা বলে ফেলল বৈশালী— কিরকম একটা মন খারাপ করা হাওয়া দিচ্ছে বল, অফিস যেতে একদম ভাল্লাগছে না...।

তোর সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল তখন আর চিন্তা নেই। আজ আমরা কেউই আর অফিসে যাবো না তাহলে...।

সারাদিন আড্ডা মারবো, পাতাল রেল চাপবো...।

—ওহ্ তোর সেই পাতাল রেল।

—হ্যাঁ, কলকাতার একমাত্র ভালো জিনিস। কিন্তু যদি কটকটে রোদ উঠে যায় হঠাৎ, যদি ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে, যদি এই হঠাৎ মন কেমন করা হাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়...।

—অতগুলো যদিও একসঙ্গে ভাবতে নেই। তাছাড়া আমরা তো আজ কোনো কাজ করবো না।

—আমার যে একটা ভীষণ জরুরি কাজ আছে। ঠিক দুটোর সময়, থিয়েটার রোডে।

—দুটো বাজতে এখন অনেক দেরি। এখন সবে সাড়ে দশটা। কিন্তু তুমি অফিস যাবে না কোনোমতেই, কথা দাও আগে। আমিও তাহলে যাবো না।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আমার খুব তেষ্টা পাচ্ছে। এখন চলো তো একটু জল কিনি। কলকাতার কলের জল যে আমি খাই না তুমি জানো নিশ্চয়ই।

—সে তুমি যা ইচ্ছে কেনো। আমি একটু কফি খাবো। পোদ্দার কোর্টের নিচে কোণের দিকে দারুণ একটা ম্যাড্রাসী রেস্টুরেন্ট আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। এরকম দিনে এইরকম কোনো সফি সফি দোকানে কফি খাওয়া খুব দরকার।

—অল রাইট। কিন্তু, আগে জল।

হঠাৎ এমন ভালো লাগতে শুরু করল তারপর থেকে। তুই থেকে তুমি, তুমি থেকে আপনি— বাক্যের প্রয়োজনমত সংলাপে সম্বোধন, এলোমেলো কথা, যা খুশি বলার মত অন্তরঙ্গতা— যা খুশি করার মত মনস্কতা—এরকম একটা পাগল করা হাওয়া ভরা দিন—খুব সহজে পৃথিবীতে আসে না। কফি খেতে খেতে, পারস্পরিক খবরাখবর নিতে নিতে, যেন অন্য ইস্কুলে বদলি হয়ে যাওয়া কোনো কিশোরীর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেছে তার আবালসঙ্গী কোনো কিশোরের— এভাবে কথা বলতে বলতে হাঁটাহাঁটি হল। বৌবাজারে পাতাল রেলের স্টেশন হয়েছে জানা ছিল না। বৈশালী জানালো। পার্ক স্ট্রিটে নেমে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে ঠিক দুটোয় এই থিয়েটার রোডে, কুসুম গুপ্তার বাড়ি। জরুরি মিটিং সম্পর্কে এতক্ষণ বৈশালী কিছুই বলেনি। এখানে এসে কুসুম গুপ্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় দুম করে বলে বসল— এর নাম বিমলেন্দু সেন। এ আমাদের অ্যাকাউন্টস্‌টা ঠিক করে দেবে। এ একজন সরকারি অ্যাকাউন্টান্ট। বলেই আমার দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল। যেন বলতে চায়— চুপ চুপ। যা বলছি কর। এখানে তোর থাকার একটা রেলিভ্যান্স দরকার তো।

গম্ভীরভাবে বলতে হল— দেখি, কি আছে আপনাদের খাতাপত্তর।

কুসুম গুপ্তা বেশ বৃদ্ধা, কিন্তু শক্তসমর্থ, রোগা, লম্বা, আর পাঁচজন অবাঙালি

মহিলার মত গোলগাল থপথপে নন। এতক্ষর নানারকম খাবার আনছিলেন পর পর, পরোটা, আচার, বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট, কফি। বৈশালীর সঙ্গে বিভিন্ন নিজেদের কথাবার্তা। আমাকে যেন দেখতেই পাননি। অ্যাকাউন্টান্ট শুনে একটা রসিদ বই এনে দিলেন। নার্ভাসভাবে হাসতে হাসতে বললেন, এই ব্যাপারটা আমরা একদম বুঝি না, জানেন? রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাচ্ছি তো। সামনের বছর অডিট হবে সব খাতাপত্র। বৈশালী আপনাকে ডেকে এনে খুব ভালো করেছে। আপনি সব ঠিক করে দিন।

রসিদ বইটার প্রথম পাতা উল্টেই দেখি, কে এক সীতা দেবীকে তিনশো টাকা দেওয়া হয়েছে গতবছর জানুয়ারি মাসে, কেন দেওয়া হয়েছে সেসব কথার নামগন্ধ নেই, সীতা দেবীরও কোনো সইসাবুদ নেই। গুছিয়ে জ্ঞান দেবার সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম সঙ্গে সঙ্গে। অফিসটা হঠাৎ অকারণে কামাই হয়ে যাবার জন্যে রাগও হচ্ছিল মাঝে মাঝে, সেটা যেন পুষিয়ে গেল খানিকটা। ধ্যানসে শুনিয়ে— বলে শুরু করলাম। হিসেব কিভাবে রাখতে হয় সেটা দৈবাৎ একজন অবাঙালি ধনী মহিলাকে শেখাবার সুযোগ পাওয়া গেছে— এ কি কম কথা। বৈশালী ততক্ষণে জনৈক অপুদার সঙ্গে বিরাট জরুরি কোনো বিষয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। যেন হিসেবনিকেশের মত তুচ্ছ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া তাকে মানায় না।

হিসেব রাখার পদ্ধতি বোঝাতে তো আর খুব বেশি সময় লাগে না। ফলে বৈশালীর দিকে ফিরতে হল। অপুদা লোকটা চশমা পরা গম্ভীর ধরনের ভদ্রলোক। কী করেন, জিগ্যেস করলে এক্সপোর্টের ব্যবসা বলেই বেশ গম্ভীর হয়ে গেসলেন একটু আগে। বৈশালীর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ হল সে প্রশ্নটা আর করা হয়নি যার ফলে। হাবভাব দেখে মনে হল, কুসুম গুপ্তার এই বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে প্রায়ই, অর্থাৎ এদের এরকম জরুরি মিটিং আগে অনেক হয়েছে। অ্যাকাউন্টান্ট হিসেবে আমার উপদেশদান পর্ব শেষ। আপাতত এদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনে যাওয়া ছাড়া আমার করণীয় কিছু নেই। জানলার বাইরে হাল্কা হাওয়ায় নারকেল গাছের পাতাগুলো দুলছে।

আমরা আসার খানিকক্ষণের মধ্যেই অপুদা এসে গেছে। বৈশালী, অপুদা আর কুসুমজির কথাবার্তা থেকে যেটুকু বোঝা গেল তা হল হাড়কাটার আটষট্টি নম্বর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে এরা বেশ্যাদের ছেলেমেয়েদের একটা অবৈতনিক স্কুল চালায়। সেটা ভালো করে চালাবার পক্ষে অনেক বাধা আসছে। প্রথম বাধা বাড়িওলা। তিনি পাকাপাকি কোনো স্কুল করতে দিতে রাজি নন। দ্বিতীয় বাধা পাড়ার মস্তান। তারা ব্যাপারটা পছন্দ করা তো দূরের কথা, বেশ্যা পাড়ায় এসব লেখাপড়ার কারবার কেন শুরু হল— বুঝতেই পারছে না। তৃতীয় বাধা 'সংলাপ' নামে আর একটা সমাজ সেবার দল— যাদের টাকা ও ক্ষমতা অনেক বেশী, যারা চায় না বৈশালীরা ওখানে 'কাজ' করুক; কারণ ওটা নাকি তাদের 'এরিয়া।' ফলে বিভিন্নভাবে তারা বাধার সৃষ্টি করছে। পাড়ার 'বাবু' নামে একজন মস্তানকে টাকা খাইয়ে বশ করে

বৈশালীদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই অপুদা বলছিলেন, বাবুকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে হবে পুলিশের হাতে তারপর আবার ছাড়িয়ে আনতে হবে। কথাটা শুনে নিজস্ব স্বভাববশত বৈশালীর যে খুব হাসি এসে গেছিল সেটা ওকে দেখেই বোঝা গেল। শুধু এটা আড্ডা নয় বলে, এবং গম্ভীর ধরনের একটা মিটিং বলে বৈশালী হাসিটা গিলে ফেলল পুরো, পরিষ্কার দেখলাম।

সমস্যা আরও আছে। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের রেভারেন্ড বিশ্বাস বলে একজন, হাত মেলাতে চান এদের সঙ্গে, দশ হাজার টাকা দানও করতে চান। কিন্তু তিনি বলে বেড়াবেন— রেড লাইট এরিয়াতেও 'আমার' একটা স্কুল চলছে— এবং এ ধরনের মন্তব্যে বৈশালীদের তীব্র আপত্তি তাই মোটা ডোনেশন দিয়ে তাঁর পার্টনারশিপের অফারটা অ্যাকসেপ্ট করা যাচ্ছে না। এবং সর্বশেষ সমস্যা— আগামী মাসের তেইশ তারিখে জ্ঞানমঞ্চ বুক করে দিয়েছে বৈশালী— সেখানে বেশ্যার ছেলেমেয়েদের দিয়ে ফাংশন করাতে হবে। করাতেই হবে, কিন্তু আজ এগারো তারিখ হয়ে গেল— প্রস্তুতি বলতে এখনও পর্যন্ত কিছুই নেওয়া হয়নি। এবং এব্যাপারে— বৈশালীর আকুল আর্তি— অপুদা, বাঁচাও। আমি একা কিচ্ছু সামলাতে পারছি না! ওরা কি কোনোদিন স্টেজে উঠে নাচ গান আবৃত্তি করবে না? ওদের অপরাধটা কি? হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বেশ চমৎকার ভঙ্গিতে বিড় বিড় করে ওঠে বৈশালী— জন্মেছি ভর্তৃহীনা অপালার ক্রোড়ে...।

এই জায়গায় নিতান্ত বেরসিকের মত আমি প্রশ্ন করি— তোর বরের খবর কি?

বম্বেতে অফিসের ট্যুরে গেছে। বলেই আবার অপুদার দিকে ফিরল বৈশালী— এই অপুদা, বলো না— অন্তত আধঘণ্টার একটা ড্যান্স ড্রামা তুলিয়ে দেবার মতন কেউ নেই তোমার হাতে?

বম্বেতে অফিসের ট্যুরে গেছে— কথাটা যেন কাকে এক পিস মাছ খেয়ে চলে গেছে— কী আর করা যাবে— এরকম ভঙ্গিতে বলল বৈশালী।

আমার স্ত্রীর একজন বান্ধবী আছে— আমি তাকে একবার বলে দেখতে পারি— মমতাশংকরের ছাত্রী ছিলেন একসময়। ইয়ে, রেভারেন্ড বিশ্বাসকে দলে নেওয়ার কোনো দরকার নেই— দশ হাজার টাকা যখন তখন তোলা যায়, ওটা কোনো ব্যাপার নয়। বাড়িওলার ব্যাপারটা— আচ্ছা— ওটা রমেন মিত্তিরের এলাকা না। বলতে বলতে ঘড়ি দেখলেন অপুদা— ইয়ে, আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ উঠি। তুমি পরে আমাকে একটা রিং কোরো, বুঝলে? কুসুমজি, আমি এক গ্লাস জল খাবো।

কুসুম গুপ্তা জল আনতে গেলেন।

শেষ কথাগুলো দ্রুত সেরে নিতে লাগল বৈশালী।

জানলা দিয়ে দেখলাম, রাস্তায় একটা লাল মারুতি দাঁড়িয়ে। একটু পরে অপুদা নিজেই ওটা স্টার্ট দিয়ে চলে যাবে।

থিয়েটার রোডের নারকেল গাছের পাতাগুলো আর দুলছে না।

সকালবেলায় যে হঠাৎ একটা হাওয়া দিয়েছিল, ভারী নির্মল ও নরম একটা হাওয়া; এই কুচক্রী পৃথিবীর গন্ধে সেই হাওয়াটা কি তাহলে থেমে গেল! এই পৃথিবী থেকে বিমর্ষ ভঙ্গিতে ফিরে গেল।

কিন্তু আজ সকালের দিকে আমি তো আর কোনোদিনই ফিরে যেতে পারবো না। এখন যে বিকেল হয়ে গেছে।

কেন মেঘ আসে

রোজকার মত দোকান খুলে সবে ঝাঁট দিচ্ছিল দিব্য, প্রবাল এল। আজকাল পাশের বাড়ির দোতলা থেকে সাড়া দেয় না রিমি আগের মত। যত কম বয়সেই বিয়ে হোক, বিয়ের পর পরই মেয়েরা কেমন যেন দুম করে অনেক বড হয়ে যায়। সন্তানসম্ভবা হয়ে বাপের বাড়িতে থাকতে আসার পর এখন তো রিমি ইচ্ছে করলেই আগের মত সারাদিন দিব্যর দোকানে কাটাতে পারে। দিব্যদা দিব্যদা করে জ্বালিয়ে যেতে পারে। রিমির এবারের আসার ব্যপারটা জেনে অনেকটা যেন সেরকমই আশা করেছিল দিব্য। কিন্তু রাত ন'টার আগে রিমি দিব্যর 'ইনডেকো'-তে পা-ই রাখে না। সারাদিন কি যে করে কে জানে। কথাবার্তার সুরও কেমন পাল্টে গেছে যেন। বিক্রিবাটা কেমন হল ? ব্যাঙ্কে কিছু রাখছে কি না। মাঝে মাঝে দুটো একটা শেয়ার কিনলেও তো পার। দিব্য হেসে ফেলেছিল। রিমির মুখে শেয়ারের কথা। মানুষের হল কি। বিয়ে করলে কি এতদূর অধঃপতন হয় মানুষের। সে তাহলে বিয়েটা এখনও না করে ঠিক কাজই করেছে। ঝাঁট দিতে দিতে নিজের মনে এসব কথাই ভাবছিল দিব্য। এ সময়ে প্রবাল এল।

প্রবালকে দেখলেই ভাল লাগে। প্রবালকে দেখলেই, একটাই শব্দ দিব্যর মনে পড়ে। অকৃত্রিম। সব মানুষের মধ্যেই আজকাল কিছু না কিছু কৃত্রিমতা থাকেই। চেনাশোনাদের মধ্যে শুধু প্রবালের মধ্যেই এখনও পর্যন্ত কোনরকম কৃত্রিমতার ছাপ পড়েনি। ঢুকেই একগাল হাসল প্রবাল। কি রে ? কেমন আছিস ?

দিব্য কেমন আছে সেটা দিব্য ছাড়া অন্যরাই বেশি ভাল জানে। দিব্য যে তেমন মাথা ঘামায় না থাকাথাকির ভাল-খারাপ নিয়ে, সেটাও সবাই জানে। আসল কথা হল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—সবাই দিব্যকে একইরকম দেখে, দেখছে। দিব্য তাই প্রবালের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল তাকে—এতদিন ছিলি কোথায় ? অনেকদিন আসিস না।

দীর্ঘদিন কাঠ বেকার ছিল প্রবাল। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার মত সঙ্গতি নেই। বাড়িতে বসেই ছবি আঁকা চালিয়ে যাচ্ছিল। দুটো একটা টিউশনি। তাও দিব্যরই দেওয়া। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ দিব্যরই বেশি। কাচের জিনিসপত্রের ওপর ডিজাইন করার কাজটাও জুটিয়ে দিয়েছিল দিব্যই। বেলেঘাটায় কারখানা। সেটাও প্রবাল খুব বেশিদিন করল না। মাইনে কম। সন্ধেবেলা ন'টার পরে দিব্যর দোকানে খদ্দের থাকে না সাধারণত।

বন্ধুরাই থাকে। সে আড্ডায় অনুত্তম একদিন বলল, কাঁদি ইউনিটে লোক দরকার। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। প্রবাল করতে পারে কাজটা। রিটার্ডেট চিলড্রেনদের একটা হোম করেছে অনুত্তম। সোসাল সার্ভিসের লাইনে ওর নানারকম যোগাযোগ। প্রবাল চলে গেল বহরমপুর। সেটাই কাল হল।

অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামের মেয়েদের বিভিন্ন সচেতনতা দিতে গিয়ে নিতান্ত এক গ্রাম্য কুমারীর প্রেমে পড়ে গেল প্রবাল। অর্থনৈতিক কারণে কিছুটা, আর খানিকটা মানসিকতার দিক থেকেও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার কোন উৎসাহ ছিল না প্রবালের এতদিন। একমাত্র ছোট বোনটা অসুখে ভুগে ভুগে 'ফট করে একদিন মারা যাওয়ার পর মেয়েদের দেখলে আরও কেমন গুটিয়ে যেত প্রবাল। এখন কর্মসূত্রে গ্রামের মহিলাদের সচেতনতার শিক্ষা দিতে গিয়ে তার প্রথম অনুভূতি হল, মহিলারা দূরে ঠেলে রাখার মত কিছু জিনিস নয়। বিশেষত মুর্শিদাবাদের এই প্রত্যন্ত গ্রামের অশিক্ষিত মহিলারা। এরা ভারি সাদাসিদে আর বোকা। জীবনের কোন সমস্যারই মোকাবিলা করতে পারে না। ব্যাঙ্ক কাকে বলে জানে না। ভোট দিলে দু-এক কেজি চাল পাওয়া যায়, এর বেশি কিছু জানে না ভোট সম্পর্কে। লেখাপড়া সম্পর্কে স্থির ধারণা—স্কুলে পাঠালে ছেলেমেয়েরা গুরুজনদের উপেক্ষা ও অসম্মান করতে শেখে। প্রবাল তাদের অক্ষর চেনায়, যাতে খবরের কাগজটা অন্তত পড়তে পারে কোনদিন। বিশেষত খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবেসে ফেলল প্রবাল। ক্রমশ জড়িয়ে পড়ল সবায়ের সঙ্গে। তারপর যখন জানতে পারল—

যা জানল তাতে নিজের অসহায়তা বেড়ে গেল বহুগুণ। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে দিব্যকে আড্ডায় সব বলত প্রবাল।

সুমিতার সঙ্গে প্রবালের সম্পর্ক নিয়ে প্রথম প্রথম ঠাট্টা ইয়ার্কিই করত দিব্য। তারপর ক্রমশ....।

কলকাতার রেড লাইট এরিয়াগুলোতে কয়েকটা ক্রেশ হয়েছে নতুন। সেসব ক্রেশের বাচ্চাদের নতুন জীবনের আলো পৌঁছে দিতে তাদের মধ্যে কাজ করে সংলাপ, জবালা, উন্মেষ—এরকম কয়েকটা সমাজসেবার সংস্থা। অনুত্তমের নিজের সংস্থাটা যদিও কলকাতার বাইরে, ভদ্রেশ্বরে, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের একটা আবাসিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র—সেখানে অনেক ধরনের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের যাতায়াত আছে; এবং একজন লোক দরকার বলে অনুত্তম প্রবালকে কাজটা পাইয়ে দিয়েছিল। তখন বলেনি যে কাঁদির ওই আবাসিক কেন্দ্রটির সব মেয়েগুলোই আসলে কলকাতার বিভিন্ন রেড লাইট এলাকার ক্রেশগুলো থেকে পাঠানো; যাদের মায়েরা ওখানকার নিমা বা গারুলিয়া জাতীয় গ্রাম থেকে কলকাতায় পতিতাবৃত্তি করতে বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে। যে গ্রামের মানুষেরা কলকাতায় মেয়েদের পতিতাবৃত্তি করতে যাওয়াকে কোনভাবেই 'খারাপ কাজ' বলে মনে করে না। এসব যখন জানল প্রবাল, তখন সে কাঁদির আবাসিক কেন্দ্রের সবচেয়ে প্রতিভাময়ী যুবতী হব হব ধরনের বালিকা সুমিতার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কলকাতা থেকে একদিন সুমিতার মা কাঁথিতে এসেছিল

মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তখনই — তার আগে দু-একবার আউটডোর ফিল্ড ওয়ার্কে নিমা-গারুলিয়া অঞ্চলে গিয়ে, সেখানকার মহিলাদের মুখ টিপে ফিক-ফিক করে হেসে ফেলা দেখে প্রবালের কথাবার্তা শুনে নিজেদের মধ্যে গা টেপাটিপি করা দেখেও বিশেষ কিছু বোঝেনি প্রবাল। চেষ্টাও করেনি। তেমন কিছু জানতও না। সুমিতার মাকে দেখে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মহিলার চেহারাতেই নিজের পেশার বিজ্ঞাপন প্রকট। মেয়েদের কাছে আসার জন্যে আলাদা করে ঘরোয়া সাজার কোন চেষ্টাই নেই।

দিব্য দোকানে ধূপ দেয় না কখনও, গণেশ পুজো বা পয়লা বৈশাখ করে না, এমন কি, দোকানের সামনে কোন ভিখারি এলে ভিক্ষা পর্যন্ত দেয় না। প্রবালও মোটামুটি একই ধরনের মানসিকতার মানুষ। হয়তো এসব কারণেই বয়সে বছর দশেকের ছোট হলেও ছোটবেলা থেকে দিব্যর সঙ্গে সহজ একধরনের বন্ধুত্ব হয়ে যেতে কোন অসুবিধে হয়নি প্রবালের। পুজো বা ভিক্ষা দেওয়াতে বিশ্বাস নেই বলে দিব্য বা প্রবালকে খুব একটা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। দিব্য আজও বাবার কথার অবাধ্য হতে ভয় তো পায়ই, বাবা হঠাৎ ডাকলে রীতিমত অস্বস্তি নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এখনও।

বেপাড়ায় যতই মস্তানি বা ওস্তাদি করুক, রাত সাড়ে দশটা বেজে গেলে বাড়ির বাইরে থাকতে পারবে না সে কিছুতেই—বাড়িতে না বলে। আর প্রবাল। স্কুলের বেড়া কোনরকমে ডিঙিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার তীব্র স্বপ্নটাকে গলা টিপে হত্যা করতে একরকম বাধ্য হয়েছিল শুধু বাবা আপত্তি করবে বলে।

বাড়ির ইচ্ছেমত বি কম পড়তে গিয়ে এক বছরের বেশি কলেজেই গেল না প্রবাল। স্বাভাবিক পথে চাকরি পাওয়ার আশা সেখানেই শেষ। ছবি আঁকাটা চিরকালের অভ্যাস ছিল বলে টিউশনিটা পেত। বেলেঘাটার কারখানায় কাচের ওপর ডিজাইন তোলার কাজটাও ভালই লাগছিল। টাকা যদিও কম পেত খুবই। তারপর এই মুর্শিদাবাদ-কাঁদি—পতিতাদের ছেলেমেয়েদের রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম—যাদের জীবনে টিভি বা ভিডিও ছাড়া সচেতন হওয়ার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই—তাদের একটু বিশ্ব দুনিয়াদারি শেখাতে গিয়ে...। নিজের দুনিয়াটাই আমূল পাল্টে গেল প্রবালের।

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সতেরোবার মেয়ের মুখে 'প্রবালদা' 'প্রবালদা' শুনে প্রবালকে ডেকে পাঠালেন সুমিতার মা। কত মাইনে পাও, বাড়ির ঠিকানা কি, এসব দু-একটা কথার পরই, হঠাৎ দুম করে বললেন—আমার মেয়েকে হাত করার চেষ্টা কোরো না, লাভ হবে না, প্রবাল খানিকটা ঘাবড়ে গেলেও ভদ্রতাবশত বলল, ঠিক বুঝলাম না। সুমিতার মা পান মুখে পুরে চপর চপর করে চিবোতে চিবোতে বললেন—না, মানে সামনের বছর পূজোর মুখে সুমিকে কারবারে নাবাতে হবে তো, তাই বলছি। বয়স কম আছে। ভিডিওতে সিনেমা দেখে দেখে প্রেম প্রেম রোগ হয়েছে বোধহয় তাই তোমাকে

নাচাচ্ছে। ভদ্দর লোকের ছেলে—সাবধানে থেকো।

তারপর থেকে প্রবালের মানসিক অবস্থা কিরকম হয়ে গেল তা লিখে বোঝাবার নয়।

দু-একদিন পর পাড়ায় ফিরে দিব্যর সঙ্গে এসব কথাই আলোচনা করছিল প্রবাল। সব শুনে দিব্য বলল—কাজটা ছেড়ে দে। নইলে বিপদ বাড়বে।

গুম হয়ে বসে ছিল প্রবাল। দিব্য দোকান বন্ধ করবে বলে উঠতে হল। চলে আসার আগে কোনরকমে বললে—কিন্তু সুমিতা.... ?

দিব্য বলল—এক্ষুণি তো তোর কিছু করবার নেই। ওরকম একটা মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করতে গেলে নাবালিকা হরণের দায়ে পড়ে যাবি।

প্রবাল এসব কথা ভাবছেই না। যে বাড়ির বিরুদ্ধে সে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার মত সামান্য কাজটাও করে উঠতে পারে না, সেই বাড়ির অমতে সে একটা আন্ডার-এজ মেয়েকে বিয়ে করবে ? তারপর ?

বাড়ি ফিরে প্রবাল বাকি বিপদটা বুঝতে পারে।

বদখত চেহারার কে একটা লোক এসে তারস্বরে চিৎকার করে মা-বাবাকে শাসিয়ে গেছে। প্রবাল যদি কাঁদিতে আর একবারও পা দেয়, তার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে। প্রবাল আজকাল লুকিয়ে বেশ্যাদের সঙ্গে মিশছে। তাদের ছোট ছোট মেয়েদের আরবে পাচার করে দেওয়ার তালে আছে।

প্রবালকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলেন তার মা। অসুখে ভুগে ভুগে মেয়েটা তো গেছেই। এখন যদি তোরও কিছু হয়ে যায়.....। আমরা কি নিয়ে বাঁচব ?

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন—পেনশনের যে কটা টাকা পাই, মাছ-ভাত হয়তো হবে না তাতে, তবে ডাল ভাত, তোমাকে খাওয়াতে পারব। এসব চাকরি তোমায় করতে হবে না। লোকটা কেন এসেছিল বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। তোমার এলেম আমি জানি।

আবার বেকার হয়ে গেল প্রবাল। অনুত্তমকে ঘটনাটা বলতে প্রবালকে তার স্যারের কাছে নিয়ে গেল অনুত্তম, বিরূপাক্ষ দত্ত। সল্টলেকে মাঝারি ধরনের বাড়ি। সব শুনে তিনি পাইপ টানতে টানতে বললেন—আমাদের কাজের ধারাটাই একটু রিস্কি। কাঁদিতে ভিজিট পড়লে আমি নিজে সুমিতার সঙ্গে কথা বলব। বাই দা ওয়ে—তুমি তো ছবি আঁকো ? রাঁচি যেতে পরবে একবার ? ওখানে একটা কনভেনশন আছে। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের টোটাল লিটারেচারটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে তুমি ছবিতে—মানে ইলাস্ট্রেশন করে করে এক্সপ্লেন করতে পারবে ? মানে ধরো— ল্যাঙ্গুয়েজ একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমাকে তো সারা ভারতের নানা প্রভিন্সে ভিজিটে যেতে হয়। টোটাল প্রোগ্রামটা যদি ইলাসট্রেট করা থাকে, তাহলে... আইডিয়া ছবি দিয়ে বোঝাতে অনেক সুবিধে হবে। রাঁচিতে যারা কনভেনশনে প্রেজেন্ট থাকবে তারা তোমাকে বুঝিয়ে বলে দেবে—ছবিগুলো মানে, ইলাসট্রেশনগুলো ঠিক কিরকম হবে....। ঠিক আছে ?

ছবি আঁকতে তো প্রবালের কোন অসুবিধে নেই কোনদিনই। উল্টে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশে চড়া হল, জীবনে প্রথম। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে হাতে বিপত্তারিণীর তাগা বেঁধে দিয়েছে মা। বাবা বলেছে, নতুন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে না, আশা করি।

ছবিগুলো আঁকতেও কোন অসুবিধে হল না। কোনরকমে বোঝাতে পারা নিয়ে কথা। সমস্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে যারা তাদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে—এই ছবিটা আঁকল একটা বিরাট গোল পাথরের চাঁইয়ের দিকে পিছন করে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে এক গ্রাম্য মহিলা— পাথরটার ওপর লেখা—'প্রবলেম'। পরের ছবি— পাথরটাকে সে ঠেলছে। এইরকম সব। মোট কথা ছবিগুলো দেখিয়ে কাজ করার প্রচুর সুবিধে হবে— সবাই এ কথাটা একবাক্যে মেনে নিল। যেসব কথা বোঝাতে অনেক বাক্য ব্যয় করতে হত, সেসব এখন অতি সহজে বোঝানো যাবে, এমন কি যাকে বোঝানো দরকার—তার ভাষা একদম না জানলেও কোন ক্ষতি নেই।

সেসব মাস-দুয়েক আগের কথা। আজকাল সে কাজের অভাবে ভদ্রেশ্বরের হোমটাতেই যাতায়াত করে, অনুত্তমের অনুরোধে। সময় কেটে যায় মোটামুটি। দেওয়ালগুলোতে কিছু ফ্রেস্কো করল কদিন ধরে। বাড়ি ফেরার সময় পায়নি। দিব্যর সঙ্গে সেসব কারণেই দেখা হয়নি কিছুদিন।

চমৎকার চেহারার এক মহিলা ঢুকলেন দোকানে। দিব্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু থেকে দোকানদার হয়ে গেল। প্রবালও কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে এল বাইরে। দেখল হাতে পাউরুটি নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে রিমি। পূর্ণ সন্তাসম্ভবা রিমিকে বেশ প্রাজ্ঞ দেখাচ্ছে। সুমিতাকে এই চেহারায় ইহজীবনে দেখতে পাবে না প্রবাল। প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিয়ে যাচ্ছে সুমিতা। যেগুলোর উত্তর দেওয়ার বিন্দুমাত্র সাহস নেই প্রবালের। তুমি আমাকে ধ্রুবতারা চিনিয়েছিলেন, মনে পড়ে? আজকাল ধ্রুবতারা দেখলেই তোমাকে নিজের মধ্যে অনুভব করি। একজন সাধারণ পতিতাকন্যা এরকম ভাষা ব্যবহার করতে শিখেছে— এটুকুই অর্জন প্রবালের।

বুক চাপা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে একটা সিগারেট ধরাল প্রবাল। লক্ষ্য করল, বাড়িতে ঢোকার আগে দিব্যর দোকানের ভেতর এক মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে পলকের জন্য থমকে দাঁড়াল রিমি। সম্ভবত জানতে চায়, মহিলা দিব্যর পরিচিত কি না। হলে কতটা পরিচিত। যতই পরস্ত্রী হোক, অন্যের সন্তানের জননী হোক, দিব্যর ওপর দুর্বলতা রিমি কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

সিগারেটটা ফেলে দেওয়ার আগে দেখল, অনুত্তম আসছে। হন্তদন্ত হয়ে অনুত্তম যা বলল— তা হল রাঁচিতে যে ছবিগুলো স্কেচ করেছিল প্রবাল, সেগুলোকে কনফার্ম করেছে উদ্যোগিনী বলে একটা সংস্থা, সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায়— পাঞ্জাব, বিহার, মাদ্রাজ, ওড়িশা—সব জায়গায় সব টিমের কাছে সেগুলোর এক সেট করে কপি পাঠাতে হবে ইমিডিয়েটলি—ওই রাফ স্কেচগুলো দিয়ে হবে না—ভাল

করে ঐকে দিতে হবে আর একবার—সব খরচ দেবে উদ্যোগিনী—ওদের হেডকোয়ার্টার দিল্লিতে—প্রবালের ফ্লাইট কাল সকালে। টিকিট বিরূপাক্ষ স্যারের কাছে ওরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এক্ষুণি প্রবালকে সল্টলেক যেতে হবে....।

জীবনের প্লেনে চড়া তো দূরের কথা, প্লেনে চড়তে হবে কোনদিন একথাও স্বপ্নে পর্যন্ত ভাবেনি প্রবাল....।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ সুস্বাদু কফিতে চুমুক দিতে দিতে প্লেনের জানলা দিয়ে প্রবাল দেখল—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘরাশি তার পায়ের অনেক নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখের ফেনার মত ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিজের বাবা-মা, দিব্য, অনুত্তম কিংবা বিরূপাক্ষ স্যার, সুমিতার মা কিংবা সুমিতা— ওই মেঘপুঞ্জের আরও কতখানি নিচে এখন কিভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে ঠিক বুঝতে পারল না প্রবাল।

ঠিকানা

—মা, আজ তোমার সই করা আছে।

মাসীমা গল্প বলছে। ঠাকুর্দার মায়ের গল্প। এসব গল্প শোনার ভাগ্য বা অবসর, সুযোগ বা মেজাজ, দৈবাৎ হয়। মামাতো বোনের ননদের বিয়ে বাড়ি। ভাগ্যিস্ হয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে মা আছে, ছোড়দিদা আছে, মামাতো বড়দির শাশুড়ি আছে, বোন আছে, বৌ। নানারকম শ্রোতা। যে বলছে তার পারিবারিক ঐতিহ্যও কম নয়। স্বাধীনতা দিবসে ভারতের যাবতীয় জাতীয় পতাকা সাপ্লাই করেছিল মেসোরা। বি সি নাগ অ্যাণ্ড ব্রস। এই মেসোমশায়ের জেঠামশাইয়ের নাম ছিল শেঠসাহেব। সাহেবরাও খাতির করত। লরি আটকাত না কোনো নো-এণ্ট্রিতে। মানে শেঠসাহেবের কোনো নো-এণ্ট্রি ছিল না জীবনে। টাকা গুনতেন না নিজের হাতে। শুধু হুকুম করতেন। তাঁর চোখের দিকে কেউ তাকাত না। পারত না আর কি। আসলে সামনে দাঁড়ালে সবাই মাথা হেঁট করেই দাঁড়াত। চোখের দিকে তাকানো তো দূরের কথা। সেই ফ্যামিলির বৌ। সোজা কথা! মাসীমা গল্প বলছে।

—তখন তো এত পেন টেন ছিল না। দোয়াত এল। কলম এল। আমরা সব ঘিরে বসলাম মাকে। মা মানে বড় মা। তোমার দাদুর মা। মানে মায়ের ঠাকুমা। বুঝলে? সইয়ের দিন সকাল থেকে আমরা চোদ্দবার মনে করিয়ে দিতাম। মা, আজ তোমার সই করা আছে। মা বলত— হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ। আমার মনে আছে। তা দোয়াত এল। কলম এল। কর্তারা ঘিরে বসল। কিসের দলিল, কিসের সই। আমরা তো সই দেখছি। মা— আ লেখ। মা লিখছে— আ। আ-আ-আ। হল? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো হল। এবার ত— তো? মা লিখছে— ত-অ। একদম বাচ্চাদের মত বলে বলে লিখত। এবার কি? র-তো? হয়ে গেলে কেমন দুলে দুলে বলত— আ হল, ত হল, র হল, অনেক হল, বল্? আর তো এট্টুখানি। হয়ে যাবো।

এসব গল্প তো জীবনে শুনিনি। আতরমণি দাসীর সই করার গল্প। ঠাকুর্দার মা। মামাতো বোনের ননদের— ভাগ্যিস্ বিয়েটা হল। মামাতো বোন দুটো— কল্যাণী আর ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর ননদ হাতে গাছ-কৌটো নিয়ে ঢুকল। কী রোগা। ওটা কি? বলল— বলে তো গাছকৌটো। ধরে থাকতে হয়। জামাই কি করে? পনেরোটা গরু কিনেছে। ডেয়ারি করেছে। চাকরি করে না বলে বিয়ে হচ্ছিল না। অনেক দিনের আলাপ। বাড়িতে রোজ আসত। দাদা এক লাখ টাকার গয়না দিয়েছে। দাদা মানে ইন্দ্রাণীর বর। ডাক্তার। ইন্দ্রাণীর দিদি কল্যাণী আসতে পারেনি। ছেলের

পরীক্ষা। তার শাশুড়ি এসেছে। আসলে ছোড়দিদা, কল্যাণীর শাশুড়ি, বুড়ি মাসী, সব দল একটা। সব জায়গায় একসঙ্গে যায়। টিকিট কেটে দিয়েছে কল্যাণীর বর। বুড়িরা দল বেঁধে বাসে উঠে সোজা চলে এসেছে রায়গঞ্জ। বিয়ে বাড়ি। আসলে বেড়ানো। চেঞ্জ। পরিবর্তন। রোজকার দৈনন্দিনতা থেকে পালানো আর কি।

হল কি, শনিবার সকালে মেসোমশাই এল। বড়লোক আত্মীয় হঠাৎ এসে গেলে ঘাবড়ে যেতেই হয়। খেতে বলতে হয়। উত্তরপাড়ায় সারা বছর ইলিশ চিংড়ি ওঠে। ইলিশ তবু কেনা যায়। দুশো আশি টাকার গলদা কেনার তো প্রশ্নই নেই। বেছে বেছে চার পিস্ কিনতে হল। ওজন হল সাড়ে তিনশো। আটানব্বুই, নব্বুই টাকায় রফা এল। আমরা স্বামী স্ত্রী একটা করে, মেসোমশাই দুপিস্। আসল কথা হল, আমার সময় হবে না। ছেলেরও অফিস আছে, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ছুটি নেই। মাসীমাকে নিয়ে রায়গঞ্জে যেতে হবে। বিয়ে বাড়ি। তুমি কাল বৌমাকে নিয়ে মাসীমার সঙ্গে দেখা করো। নেমন্তন্ন করে গেল মেসোমশাই। আসলে কার্যোদ্ধার। কি আর করা। প্রথম যৌবনে নার্সিং হোমে যেতে হয়েছিল তিনবার। সব টাকা দিয়েছিল এই মাসী। অতএব যেতে হল। কৃতজ্ঞতা। পারিবারিক দায়। মায়ের ছোটকাকিমা, বোন, কল্যাণীর শাশুড়ি, নিজের বৌ, নিজের বোন— মোট পাঁচজন, বিভিন্ন বয়সী মহিলাকে নিয়ে নাইট বাসে রায়গঞ্জ। সঙ্গে একমাত্র পুরুষ আমি। বোঝো ঠেলা। ছোড়দিদা আর কল্যাণীর শাশুড়ি আগে চলে গেছে। ... পরের দিন কি খাতির মাসীমার, বাবলু এলি? বাড়ি ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলি, বৌমা বলল, তা অনেকদিন না এলে অমন হয়। লুচি খাবি না পরোটা? সেই সেবারে, মনে আছে, আমি আসতে দেরি করেছি মাসীমা, আমার মাথাটা তুমি কেটে ফেলো— এইসব বলেছিলি, মনে আছে?

মনে কি থাকে কিছু? মনে পড়ে। মনে পড়ল সব। একটা বাচ্চা ছেলে কাজে ঢুকেছিল মাসীমার বাড়িতে। তাকে কি ভাল যে বাসত মাসীমা। চাকরকে কেউ স্কুলে ভর্তি করে? মাসীমা করেছিল। একমাত্র ছেলে বড় হয়ে গেছে। ভুতু আমার ছোট ছেলে। মাসীমা সবাইকে বলত। আর একটা ছেলে থাকলে ওর বয়েসীই তো হত। টমটমের সব বই তো পড়ে আছে। ঘরের কাজ শেষ করে ওর অনেক সময় থাকে। পড়ুক না। নিজেই পড়াত মাসীমা। মাঝে মাঝে টমটম। পড়াবার নামে ও অবশ্য চড় চাপড়ই মারত বেশি। ভুতুর চেহারাটা ছিল বেশ গোলগাল। মেরে আরাম। আর টমটম ছিল রোগা প্যাঁকাটি। যদিও অগাধ বড়লোক বাবা-মার যত্ন আত্তির কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু, যা হয়। খাবার দেখলেই হাত গুটিয়ে বসে থাকত টমটম। আর ভুতুটা ফ্যানাভাত পেটপুরে খেয়ে খেয়ে সেই যে মোটা হতে লাগল। নাদুসনুদুস ভুতুর পাশে সিড়িঙ্গে টমটমকেই মনে হত ভুতুর চাকর! ভুতুর পড়াশোনা নিয়ে তুমুল আপত্তি ছিল মেসোমশায়ের। চাকরের আবার লেখাপড়া কি!

সেসময় একদিন হু-হু করে খবর এল, সন্ধেবেলা, বাড়িতে কেউ ছিল না যখন,

কে বা কারা বাড়িতে ঢুকে, ঠাকুরঘরে প্রণামরতা মাসীমার মাথায় একটা মোটা ইস্পাতের মাছ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, আর টেবিলে ফেলে রাখা মাত্র চারশো টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ষোলোটা সেলাই হয়েছে মাথায়।

সবাই ছুটল মাসীমার বাড়ি। কি কারণে যেন সময় পাইনি শুধু আমি। দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধেবেলা গিয়ে দেখি, বাড়ি ভর্তি লোক। বড় মামা খুব চেঁচাচ্ছে। কি যে দিনকাল পড়ল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বিছানায় মিশে আছে মাসীমা। তখনই বলেছিলাম— আমি আসতে দেরী করেছি মাসীমা। আমার মাথাটা কেটে ফেলো। কেন না, আমাকে দেখেই মাসীমা চিঁচিঁ করে বলে উঠেছিল, এতদিনে সময় হল। আর ছাতের এক কোণে মুখ-চুন করে ভুতুকে বসে থাকতে দেখে, কাছে গিয়ে খুব নরম গলায় বলে ফেলি— কি রে, যে থাকতে দেয়, খেতে দেয়, লেখাপড়া করতে দেয়, তাকেই...। আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিল ভুতু হাঁউ মাউ করে— আমাকে পেটে প্যা দিয়ে মেরে ফেলো দাদাবাবু। দেশ থেকে মা খপর দিয়েছিল, পাঁচশোটা ট্যাকা চাই। মায়ের খুব অসুক। টেবিলের ওপর টাকাটা পড়ে আছে দেখে আমার কি যে হয়ে গেল।.... ততক্ষণে আবিষ্কারের আনন্দে আমি দুদ্দাড় করে নেমে এসেছি নিচে। মাসীমা, মাসীমা, আততায়ী গ্রেপ্তার। বড় মামা ভুতুকে ধরে এনে— আজ তোকে মেরেই ফেলব— বলে যেই পায়ের চটি খুলে শুরু করতে যাবে— মাসীমা লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে ভুতুকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। তুই আমাকে মুখ ফুটে বলতে পারলি না। বড় মামা বলল, থানায় দিয়ে দে ব্যাটাকে। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছিস্ এতদিন। মেসোমশাই বলল, হাতটা ভেঙে দাও তার আগে। যে হাত দিয়ে মেরেছে সেটা...। মাসীমা তখনো ভুতুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে যাচ্ছে। না, তোমরা ওকে কিচ্ছু বলতে পারবে না। ওকে আমি ছেলে বলেছি।

সেই মাসীমা। এখন মাঝরাত্তিরে রায়গঞ্জ রকেটের ড্রাইভারকে বলছে, বাস থামাও। আমি পেচ্ছাপ যাবো। হুহু করে রাত ভেঙে বাস যাচ্ছিল। জানলা খোলা রাখা নিয়ে এক চোট হয়ে গেছে এর আগে। ডাকাতি হলে জানি না কিন্তু— বলতেই ঝুপ করে জানলা নামিয়ে দিয়েছে মাসীমা। হঠাৎ মনে পড়েছে, বিয়ে বাড়িতে গিয়ে পরবার জন্যে গয়নাগাঁটি আছে কাছে। অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও, কিছু তো নিতেই হয়েছে সঙ্গে। রায়গঞ্জের হোটেলে সেসব নেবার কায়দা দেখিয়েছিল মাসীমা। শায়ার মধ্যে সেলাই করা বালা, হার। দেখাদেখি মাও— দুর্গাপুর থেকে ফেরার সময় একবার বড় ছেলের পুরো মাসের মাইনে আমি এরাম করেই পেটিকোটের মধ্যে এনেছিলাম!

হোটেল পছন্দ হতে সময় লাগল। রায়গঞ্জ হোটেল বাজে। আনন্দ হোটেলে ঘরের পাশে নর্দমা, পেচ্ছাপের গন্ধ। সারারাত জার্নি করে বাস থেকে নেমে কি বিয়ে বাড়ি যাওয়া যায়? হোটেলে উঠব। স্নান টান করে ফ্রেশ হয়ে তারপর তো কুটুমবাড়ি যাব। মাথায় চোট লাগার পর মাসীমা কেমন শুচিবায়ুগ্রস্থ হয়ে গেসল।

রাতদিন জল ঘাঁটে। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় বাথরুমে। আজকাল অবশ্য কমে গেছে। মেসোমশায় বলে কি, বেরিয়ে যায়— হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভারি অদ্ভুত গলায় বলে গেল— নারে, বাথরুমে থাকবে কি, আজকাল বেরিয়ে যায়।... সেই মাসীমার হোটেল চাই। বাসট্যাণ্ডের কাছে রিয়াজ। সেটার চার্জ বেশী। শেষমেষ সেই মোহনবাটির নটরাজ। বাহ্ বেশ পরিষ্কার। গরমজল দেবে তো? আমরা চান করব। চা দিতে হবে না। আমরা কফি করে নোব। আমাদের সঙ্গে ছোট্ট একটা ইমার্সন হিটার আছে।

হোটেলওলাকে এত কথা বলার যে কি আছে। এসব কারণেই বাড়ির ব্যাপারে থাকি না। তবে মন্দ লাগছে না কিন্তু সব মিলিয়ে। বেঁকা কোমর নিয়ে, বেল্ট বাঁধা মাসীমাকে এতদিন পরে এত কাছ থেকে যত দেখছি তত ভাল লাগছে। বিয়ে বাড়ি যাবার কি উৎসাহ। বয়স, তা প্রায় ষাট হল। মায়ের পঁয়ষট্টি। এই বয়সের মানুষদের নিয়ে তো কোথাও যাইনি কখনো।

হোটেলের ঘরে হিটার ডুবিয়ে এক গ্লাস গরম জল হল। চিনি কোন ব্যাগে? কফিটা? খেতে খেতে গরমজল হয়ে গেল স্নানের। চটপট পরপর স্নান সেরে রিকশায় সোজা কলেজপাড়া। ডক্টর ধীমান পাল। বিয়ে বাড়ি। পথে এক পুরনো বন্ধু। পাঁচ বছর অফিসের কাজে এসে অনেকদিন ছিলাম। তখনকার বন্ধু। কি ব্যাপার, কোথায়? এই কলেজপাড়া, বিয়ে বাড়ি। সন্ধেবেলা ইন্সটিউটে চলে এসো। সবাই থাকবে। আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। রিকশায় বসেই কথা হয়ে গেল। যাক, বিয়ে বাড়ির গ্যাঞ্জাম থেকে পালাবার একটা ব্যবস্থা হল। ওফ্। বাঁচা গেল।

বাপের বাড়ির লোকজন পেয়ে, বিয়ের পর থেকেই রায়গঞ্জপ্রবাসী ইন্দ্রাণীর সে যে কি আনন্দ। এই প্রথম কলকাতার আত্মীয়রা এল। ঘুরে ঘুরে বাড়ি দেখানো শেষ আর যেন হয় না। সকলের সঙ্গে আলাপ করানো। এটা দেওর, এটা ভাজ, এ হল বাবু। ছাদের সিঁড়ি ওই দিক দিয়ে। থাকতে দেবার কিন্তু জায়গা নেই। না না, আমরা হোটেলে উঠেছি। ও তাহলে ঠিক আছে। ওর গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবেখন। চলো ছাতে যাই। ওমা, চারপাশে কত নারকেল গাছ। সব তোমাদের? সব আমাদের। বিধবা ছোড়দিদাকে এখনো কি সুন্দর দেখতে। তাকে কি ক্লিওপেট্রা বলতাম, গাল টিপে আদর করি বুড়িকে। কেমন আছ ক্লিওপেট্রা? আ-হা হা, একদিনও তো যেতে পারো না। কলকাতার লোকের সঙ্গে রায়গঞ্জে খুনসুটি। ভাগ্যিস্ বিয়েবাড়ি পড়েছিল। ছাত থেকেই রান্নাবাড়ি দেখা যাচ্ছে। একপাশে মাংস কাটা হচ্ছে, দুটো পাঁঠা কাটা হয়ে গেছে, চারটে পাঁঠা বাকি। সেগুলো ব্যা ব্যা করে ডাকছে। আশেপাশে বাচ্চাদের ভিড়। ফুরফুরে একটা হাওয়া দিচ্ছে, ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় রায়গঞ্জের এই রোদ বেশ মনোরম। নিচে প্যাণ্ডেলের একপাশে চোখে কালো চশমা লাগিয়ে সিন্‌থেসাইজার বাজিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে একটা ছেলে— মেহেদি লাগাকে রাখনা। ডোলি সাজাকে রাখনা। তাকে ঘিরে আছে ব্যাণ্ডপার্টি। বাজনার আওয়াজে ডুবে যাচ্ছে গানের কলি। কথা বলতে হচ্ছে জোরে।

খাওয়ার পরে একটু গড়িয়ে নিয়ে সন্ধের মুখে 'আমি একটু আসছি' বলে বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি চুপচাপ। উকিলপাড়ার মুখে রায়গঞ্জের বিরাট কালচারাল ইন্সটিটিউট। ভেতরে কিসের যেন রিহার্সাল চলছে। বাইরের লাউঞ্জে একটা বড় টেবিল ঘিরে অনেক চেয়ার পাতা। জমিয়ে আড্ডা মারছে কয়েকজন, আর কি চাই।

সবাইকে অবশ্য চিনি না। অনেকের সঙ্গেই পরিচয় নেই। শুধু নীরদ, আশিস আর কিরণকে চিনি। যথেষ্ট। বাকিদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ঝটপট। রবিবারে পিকনিক কুলিক নদীর ধারে ফরেস্টে। কিন্তু আমি যে শনিবারে চলে যাচ্ছি। না না, যাওয়া হবে না, যাওয়া হবে না। বাসে যে টিকিট হয়ে গেছে। সে হোক গে। ওসব আমরা ঠিক করে দোব। রবিবার রাতের বাসে যাবেন। টিকিটের ব্যবস্থা নিমাইদা করে দেবে। কোনো চিন্তা নেই।

তিনজন যুবতী এল। পাপিয়া মীনাক্ষি আর তন্দ্রা। তারাও লেখালেখির মধ্যে আছে। তারাও পিকনিকে আছে। কলকাতা থেকে নতুন বন্ধু এসেছে শুনে তারাও খুশি। হঠাৎ পাপিয়া বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না ?

ভালো করে তাকাতে দুম করে সব মনে পড়ল। আরে এ তো বিকাশের বৌ। বিকাশ যখন শিলিগুড়িতে থাকত তখন ওদের বাড়িতে কত থেকেছি। ইস্ বিকাশের বৌকে চিনতে পারলাম না। মনে পড়েছে মনে পড়েছে, অনেকদিন দেখিনি তো। কলকাতায় থাকলে সব ভুলে যায় লোকে। তুমি তো বিকাশের বৌ। বুচুন ভালো আছে ? বিকাশ ?

সবাই চুপ করে গেল কেন। পাপিয়া মুখ নিচু করে বসে আছে কেন।

নীরবতা ভাঙল নীরদ।

—ইয়ে, তুমি তো জানো না, বিকাশ মাস চারেক হল মারা গেছে। সব নার্ভগুলো ড্রাই হয়ে গেস্‌ল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল পাপিয়া— আপনি একটু আসুন আমার সঙ্গে।

আমাকে ডেকে সোজা বাড়ি নিয়ে গেল পাপিয়া। শুধু বিকাশের কথা বলতে লাগল। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে ধ্বক করে উঠল বুকটা। বিকাশ ছবি হয়ে ঝুলছে দেওয়ালে। কোনরকমে বললাম— আমি কাল সকালে আসব। এখন যাই। বিয়েবাড়ির লোকজন অপেক্ষা করছে।

পাপিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে খুব নরম গলায় বলল— অনেক কথা আছে। ঠিক আসবেন কিন্তু।

বিয়ে বাড়ি অবশ্য গেলাম না তখনই। ইন্সটিটিউটে ফিরে এসে নীরদকে ডাকলাম— চল্। মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এখন মদ ছাড়া কিছু মাথায় ঢুকবে না।

—বিয়ে বাড়ি আছে তো।

—থাক্ গে। মামাতো বোনের ননদের বিয়ে তো আমার কি !

নীরদ তো তাই চায়। পুরনো পার্টনার।

বিয়ে বাড়ি পৌঁছতে দশটা বাজল। গিয়েই খেতে বসে গেলাম। মাথার মধ্যে বিকাশ ঘুরছে। তরল আগুনে মনটা ধাতস্থ হয়েছে কিছুটা, এই পর্যন্ত। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ধীমান, ইন্দ্রাণীর বর। বলল, সবাই আপনার জন্যে টেনশন করছে। চিরকালই করে— বলে খেতে বসে গেছি। ইন্দ্রাণী দেখা করে গেল। তাকে বলে দিলাম— আমি কাল যাচ্ছি না। একটা পিকনিক আছে। রবিবার রাতের বাসে যাবে।

শুনেই চলে গেল ইন্দ্রাণী। ভেতরে গিয়ে কি বলল কে জানে। বৌ এসে বলল— চলো, তোমার হচ্ছে।

ভাবলাম, কি আর হবে, এতো আর নতুন কিছু নয়। চিরকালই হচ্ছে। মুখে বলি— কি হবে?

বৌ বলল— বোন চেঁচাচ্ছে, মেজদার সঙ্গে কোথাও গেলে প্রেস্টিজ থাকে না।

বললাম— ওর খুব প্রেস্টিজ হয়েছে দেখছি।

হোটেলে ফেরার সময় গাড়ি দিল ধীমান। টিকিট নিয়ে, মানে ফেরার টিকিট, একচোট প্রাথমিক ঝামেলা হয়ে গেছে এস-টি-ডিতে, কলকাতা থেকেই। মাসীমার জন্য যাওয়া, সব কিছু করলাম আমি। আর ইন্দ্রাণীর এস-টিডি পেয়ে মাসীমা বলে দিল, আমার ফেরার টিকিট হয়েছে? আমাদের কথা একবারও মনে পড়ল না? এদিকে মাসীমা নিজেই বলছে— ওরা বলেছে, চারদিন আগে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের টিকিট ফুল হয়ে যায়। রায়গঞ্জ থেকে বাস ছাড়া তো গতি নেই! সব শুনে অফিসের লোকরাও বলল— এরাম লোকের সঙ্গে যাস্ না। যাচ্ছে তোর ঘাড়ে চেপে, আর ফেরার সময় শুধু নিজের টিকিট করাল। রাত্রে ফোনে ধীমানকে বলেই ফেলেছি— আমাদের টিকিট না করে শুধু মাসীমার টিকিট করলে? কথা না বাড়িয়ে ধীমান ইন্দ্রাণীকে ডেকে দিল। সে আবার বলে কি— তোমাদের আসা কি ফাইনাল? বোঝো কথা। যার ননদের বিয়েতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় মা-মাসী-বোন-বৌকে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, সেই বলছে— তোমাদের আসা কি ফাইনাল? এস টিডির বিল বাড়িয়ে লাভ কি। বললাম, হ্যাঁ। ইন্দ্রাণী বলল, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের টিকিটও করতে বলছি।

করেও ছিল। বিয়ে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ধীমান আগে চারটে টিকিট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, দাদা, আপনাদের টিকিটগুলো। হাত পেতে নিতে কি যে লজ্জা লাগছিল। অফিসের দিদিভাইয়ের মন্তব্য মনে পড়ল— সব ব্যাপারে লজ্জা পেতে নেই।

হোটেলে দুটো ঘর নেওয়া আছে। মা, মাসীমা আর বোন এক ঘরে। আর একটায় আমরা স্বামী স্ত্রী। আমি তো সোজা ঢুকে পড়লাম গরম কম্বলের তলায়। বোনকে শুধু বলেছি, খেয়েছি একটু ঠিকই, কিন্তু গোলমাল লাগাচ্ছিস তোরাই!

আমি কিন্তু কারুর সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনো অসঙ্গত ব্যবহার করিনি। বোন শান্ত গলায় বলেছে— যাও, শুয়ে পড়ো। কিন্তু বৌ আসছে না কেন ? মা মাসীর সামনে হোটেলে স্বামীর ঘরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। পেতেই পারে। কিন্তু কেমন মেজাজে থাকবে কে জানে! বিয়ে বাড়িতে একগাদা আত্মীয়ের সামনে মদ্যপ স্বামী। ছি ছি। বেশী কিছু গোলমাল হল না এই যা রক্ষে। বোধহয় বিয়ে বাড়ি বলেই হল না। হয়ত বলেই দিয়েছে— ও তো বাড়িতেও খায়। দু-তিন পেগ অন্তত। এসব ভাবতে ভাবতেই ঢুকল। অভিযোগ দূরের কথা, স্বর্ণকাতান খুলে দেখাচ্ছে— দেখ, কতখানি ছিঁড়ে গেছে!

যাক, বাঁচা গেল। শাড়ি ছেঁড়ার দুঃখে স্বামীর মদ্যপান মাফ। সব চাপা পড়ে গেল। জড়ানো গলায় বললাম, শুয়ে পড়ো। আবার কিনে দোব।

পাপিয়াদের বাড়ির দেওয়াল থেকে বিকাশের মুখটা মাথায় ফিরে এল। কত উদ্দাম কাল কাটিয়েছি বিকাশের সঙ্গে। মাথার মধ্যে আবছা হয়ে যাচ্ছে বিকাশ। ঢুকে পড়ছে পাপিয়া। কেন ? কেন ? কতদিন পর দেখা হল। পাপিয়া কি ভাবছে আমার কথা ? এখন ? এই মধ্যরাতে!

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কেন মনে হল, পাপিয়াকে ধরে আছি অনন্তকাল।

সকালে আবার বিয়ে বাড়ি। বিদায়পর্ব। রাতের বাসে সবাই চলে যাবে। মা, বোন, মাসীমা, দিদিমা। কল্যাণীর শাশুড়ি। আমাদের টিকিট দুটো পাল্টাতে হবে। কাল পিকনিক। থাকার জায়গারও ব্যবস্থা করতে হবে। হোটেল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক করে আসছি— বলে সোজা বিকাশের বাড়ি।

পাপিয়া স্কুলে যায়নি। শনিবার। তবু স্কুল ছিল। সাত সকালেই বাজার করেছে। রান্নাও শেষ। দেখা হতেই শুরু করে দিল কথা বলা। যেন চাপা আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে দিয়েছে কেউ। কতদিন কথা বলেনি ভাল করে। আজ আর কালকের মতো শোকমগ্ন নয় তার উপস্থিতি।

কখন যে বেলা একটা বেজে গেল কে জানে। বিয়ে বাড়িতে ফেরার তাড়া আছে। যদিও পাপিয়া বার বার বলতে লাগল, ওদের অনেক অনুষ্ঠান থাকবে নিশ্চয়ই। তুমি এখানেই খেয়ে যাও। তাতে কেউ কিছু মনে করত না ঠিকই! কিন্তু ইচ্ছে করল না আমারই। সন্ধেবেলা তো আসছি। বলে চলে এলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে শেষ কথা হল— হোটেল ছেড়ে দিয়েছি। রাত্রে—। পাপিয়া কথা কেড়ে নিয়ে বলল— আমার এখানে থাকবে। আজকাল অবশ্য কেউ আসে না...় তবে, তোমার সঙ্গে তো স্ত্রী আছে।

প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললাম, ভাগ্যিস আছে।....

বিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখি সত্যিই প্রচুর অনুষ্ঠান চলছে। কাদাখেলা। যজ্ঞ। খাওয়া দাওয়ার কোনো নামগন্ধ নেই। এসব ব্যাপারে মেয়েদের বাস্তব বোধ বেশি, মানতেই হবে। সবাই শুধু বলল, টিকিট হয়ে গেছে ? বললাম, হয়ে যাবে।...

খেয়ে উঠতে তিনটে বাজল। একটু গড়িয়ে নিয়ে সবাইকে বিদায় জানাতে যাব।

ইন্দ্রাণীর ঘরে দেখি বিপুল হাসাহাসি হচ্ছে। ছোড়দিদা হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ছে বিছানায়। মাসীমা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। জর্দার ছোপ ধরা দাঁতে চোপসানো গালে হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যাচ্ছে মায়ের। হল কি? ছোট বোন কোনরকমে বলল, বেগুন। বেগুন? মানে? ছোড়দিদা বলল— তোর মাসীর দাঁতে-ভাতে হবে। তাতে বেগুনপোড়া খাওয়াবে। বলছে আর হাসছে। কি ব্যাপার? দাঁতে-ভাতে? মাসীমা কিছু বলতেই পারছে না। এত হাসছে। বৌও তাই। কোনো রকমে মা বলল— মাসীমার হাওয়াই চটি হারিয়ে গেছে। এক পাটি বাঁধানো দাঁত হারিয়ে গেছে। তুই তো কিছু খুঁজে দিলি না! বললাম, আমি তো জানিই না। এরপর বোন বলল— সে তো গেছে। রায়গঞ্জের বেগুন খেয়ে মাসীমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বেঘোরের বেগুন না কি বলে। ইন্দ্রাণীদির শ্বশুর ব্যাগ ভর্তি দিয়ে গেছে; তাই নিয়ে কী কাড়াকাড়ি হল তুমি দেখলে না! বেগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি? কেন? মাসীমা এতক্ষণে বলল, এ কি যা-তা বেগুন, এ হল বেঘোরে বেগুন! বলে আবার হাসতে লাগল। শব্দটা বোধহয় শোনেনি আগে। ছোড়দিদা বলতে লাগল— আসল কথা কি জানিস। ওর বোধহয় ঘণ্টা বেজে গেছে। তাই সব জায়গায় যাচ্ছে। সারাজীবন তো কলতলায় কাটাল। এখন তাই হুটহাট বেরিয়ে পড়ে। জীবনে কল্যাণীর বাড়ী যায়নি। একদিন গেল। তোর বড় বোনের বাড়িও তো গেস্‌ল। সেই গ্যাংটকে। কোথায় বিয়ে বাড়ি দেখ্‌, রায়গঞ্জ! ছুটে এয়েছে কলকাতা থেকে। তাই বলছি, দাঁত হারিয়েছে বেশ হয়েছে। বাচ্চাদের মুখে-ভাতে হয়। মরার আগে তুই একবার দাঁতে-ভাতে কর। এই বেঘোরের বেগুনপোড়া দিয়ে। আমরা সবাই যাব আর এরকম করে হাসব।

মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাদের এ কি নির্মম হাসাহাসি।

ওদের বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল ধীমান। ঝামেলা খতম। সবাইকে বিদায় জানিয়ে, বোনকে— সাবধানে যাস্‌— বলে, বৌকে নিয়ে সোজা বিকাশের বাড়ি, সন্ধের আগে। দুজনকে রিকশা থেকে নামতে দেখে ঝলমল করে উঠল পাপিয়া। সামনের কোলাপ্‌সিবল গেট পর্যন্ত নেমে এসে দু-হাট করে দরজাটা খুলে ধরল— এসো। বৌকে বলে রেখেছি আগেই— চারমাস হল বর মরে গেছে। খুব বন্ধু ছিল আমার। এখনও শক্‌টা সামলাতে পারেনি। ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না। অফিসের কাজে এদিকে এলে আগে কত থাকতাম এদের বাড়িতে। সেই সূত্রে ডাকল। বলল, রায়গঞ্জে থাকবে অথচ আমাদের বাড়িতে উঠবে না, তা কি হয়। বিকাশ না হয় নেই, কিন্তু আমি তো আছি।

মনে মনে বলি, সমস্যা তো সেটাই। বিকাশ ছিল বিকাশ। বাবা ছিল আবগারী অফিসার। থলে ভর্তি মদ ধরে ঘরের কোণে রেখে দিত। আর বিকাশ একটা করে বোতল বার করে এনে বন্ধুদের খাওয়াত। আসলে তার প্রাণশক্তি ছিল বেশি। এত প্রাণ, এত ভালবাসা, খরচ করার জায়গা পেত না। নেশা করে করে সব নার্ভগুলো শুকিয়ে গেল। আসলে তো চেয়েছিল আনন্দ। আরো আনন্দ। সম্পর্ক

থেকে যা পেত না সে। চেষ্টা করত নেশা থেকে পেতে। বন্ধুসঙ্গ থেকে ট্যাবলেট গাঁজা চরস বাংলা মদ সব একসঙ্গে। তৃতীয় অবস্থাটা ভালবাসত। বেশি করে বাঁচতে গেলে যা হয়। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় জীবন।

তুলনায় পাপিয়া ঠিক উল্টো। মাপা জীবনযাপন। খেতে ভালবাসে খুব। নিজের চারপাশের পরিধির ওপর কর্তৃত্ব করতে ভালবাসে। মানুষকে নিজের প্রয়োজনের নিতান্ত পরিপূরক ভাবতে ভালবাসে। আমাকেও বোধহয় তাই ভাবছে।

বাস জার্নি, ঘোরাঘুরি, বিয়েবাড়ি— সবকিছুর জন্যেই বেশ ক্লান্তি জমেছিল। রাত্রের খাবার পাঠ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলল পাপিয়া। কাল পিকনিক।

বিছানাটা পেতে দেবার সময় প্রায় ফিস্ ফিস্ করে পাপিয়া বলল, ঠিক চার মাস পরে এই বিছানায় কেউ শুতে যাচ্ছে। ও মারা যাবার পর থেকে এটা তোলাই থাকত।

গা-টা শির শির করে উঠল। এই বিছানায় এক বছর শুয়ে ছিল একটানা, মৃতপ্রায়, মৃত্যুপথযাত্রী বিকাশ। আমার পুরনো বন্ধু।

লেপ মুড়ি দিয়ে আমাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আমার ভীতু ও ধার্মিক বৌ বলল, বিকাশ যদি আসে!

আমার ভয় অবশ্য ঠিক উল্টো। ভূতকে আমার কোনো ভয় নেই। আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থাতেই উঁকি মেরে দেখলাম, মাঝখানের দরজাটা খোলা। ও ঘরে পাপিয়া আর বুচুন।

মনে হল, পাপিয়া যদি আসে।

পিকনিকে, জঙ্গলে, কুলিক নদীর ধারে, শতরঞ্চ পাতা, একধারে রান্নার লোক রান্না করছে, গাছপালার মাথায় মাথায় চুয়ান্ন হাজার পরিযায়ী পাখি মাঝে মাঝে ঝটপট করছে ডানা। নিচে হাত-পা ঠোঁট নাড়ছে তিরিশ বত্রিশ জন মানুষ-মানুষী, কেউ যুবা, কেউ বয়স্ক, কেউ গৃহিণী, কেউ সেতারবাদিকা। কেউ আশিস। কেউ পাপিয়া।

শুধু বিকাশ নেই। থাকলে হুল্লোড় আরো জমে যেত।

আমি কলকাতা থেকে আসা অতিথি বন্ধু। আমাকে পেয়ে এরা খুশি, বার বার বলতে লাগলো। নীরদ অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। নাম মনে থাকছে না অনেকেরই।

পাপিয়া পরে আছে গাঢ় বেগুনি জর্জেট শাড়ি, ওর বুকের ওপরের অংশে মাছ ধরা জালের মত এমব্রয়ডারির কারুকাজ, তাঁর ফাঁক দিয়ে আরো প্রকট হয়েছে তার কাটা আপেলের মত গাত্রবর্ণ, ত্বক। সে খুব হাসছে। বান্ধবীদের নিয়ে চা খেতে চলে গেল ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে। আমার স্ত্রী স্বর্ণালির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেমন ভাবে দেখতে লাগল তন্দ্রা। আর ফিক ফিক করে মুখ টিপে টিপে

হাসতে লাগল। তাকে কি বলেছে পাপিয়া ?

স্বর্ণালি দাঁড়িয়ে আছে দূরে, একা, গম্ভীর। সে দীর্ঘাঙ্গিনী, শ্যামবর্ণা, তেমন সুন্দরী নয় খুব কিছু, কিন্তু ভারি শান্ত ও স্বাভাবিক। পাপিয়াদের হাসাহাসি দেখে অযথা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে স্বর্ণালি। পিকনিকের লোকেদের সে চেনে না কাউকেই। অসুবিধে তো একটু হবারই কথা। পিকনিকের নাম শুনেই বলেছিল— তার মানে তো মাল খাবে তোমরা পড়ে পড়ে। আমি আর কি করব গিয়ে। আমি বরং মায়েদের সঙ্গে চলে যাই। আশ্বস্ত করতে হল সঙ্গে সঙ্গে— না না, ওসব হবে না। কতরকম লোক থাকবে। ছোটরা থাকবে, কোনো চিন্তা নেই। মাথার ওপর মাইগ্রেটরি বার্ড থাকবে হাজার হাজার। তোমার ভাল লাগবে, দেখো। মাইগ্রেটরি বার্ড তুমি আগে কখনো দেখেছো ? স্বর্ণালি বলেছিল— দেখেছি। ছোটবেলায়। চিড়িয়াখানায়। সাইবেরিয়া থেকে আসে। সেই সুযোগে বলেছি— তাদের সঙ্গে একই জঙ্গলে বসে পিকনিক তো আর করোনি কখনো।

এখন কুলিকের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। বুচুন এসে বলল, কাকিমা— থুড়ি, জেঠিমা— মাছ ধরা দেখছে। একটু পরে আসবে বলল।

বুঝলাম, বেশ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে স্বর্ণালি।

ওকে ডাকাডাকি করে সমস্যা বাড়াতে ইচ্ছে হল না। এমন চমৎকার পরিবেশে কেউই বেশীক্ষণ মন খারাপ করে থাকতে পারবে না মনে হয়। এমনিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া, পিকনিকে একটা আনন্দের আবহাওয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সকলের মনে ছড়িয়ে যায়। এতজন মানুষের মধ্যে একা একা স্ত্রীর মানভঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়াটা ভাল দেখায় না। টিফিনের ডিম পাঁউরুটি কলাগুলো বরং খাওয়া যাক।

নীরদদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল। স্বর্ণালি কখন এসে রান্নার তদারকিতে লেগে গেছে দেখতে পাইনি। এতগুলো লোক খাবে, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, স্বর্ণালি স্থির থাকতে পারছে না। ভালই হল। হঠাৎ নীরদ বলল, পাপিয়ারা সেই যে চা খেতে গেল, আর আসছে না। একটু দেখো তো।

আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। সোজা উঠে হাঁটতে শুরু করলাম ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে।

শুকনো পাতা কুড়োচ্ছে কয়েকটা মেয়ে।

এরা এত গরীব, কিন্তু এদের স্বাস্থ্য এত ভাল হয় কি করে কে জানে! ক্ষুধা ছাড়া এদের আর কোনো সমস্যা নেই বলে ? কি জানি। পাপিয়া কোথায় গেল আমাকে দেখতে বলেছে নীরদ।

কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখি ছুটতে ছুটতে বুচুন আসছে। আবার কি হল ? স্বর্ণালি কিছু বলে পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই। দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক তাই। হাঁফাতে হাঁফাতে বুচুন বলল, জেঠিমা একটা পান আনতে বলল, আর তাড়াতাড়ি ফিরতে বলল। তার মানে স্বর্ণালি শান্তিতে নেই। না থাকারই কথা। বললাম, ঠিক আছে। এগোতে যাচ্ছি, বুচুন আবার বলল, মাকে বলবে, আমার জন্যে কিছু টেস্টফুল খাবার আনতে ;

হ্যাঁ? আমার এট্টু এট্টু খিদে পাচ্ছে। আবার বললাম, ঠিক আছে। বিকাশ যখন মারা যায়, বুচুন তখন বাবার বুকের ওপর শুয়ে ছিল। পাপিয়া বলেছে।

পরিযায়ী পাখিগুলো বেশ বড় বড়। ডানা ঝটপটাচ্ছে গাছের মাথায় মাথায়। দু-তিন মাসের মধ্যে এদের বাচ্চারা বড় হয়ে যায়। তারপর সদলবলে ফিরে যায় সাইবেরিয়ায়। দিক ভুল করে না কেন! মানুষ নয় বলে?

পাকা রাস্তার ধারে চাষের দোকানে ওরা কেউ নেই। খোঁজ করে জানা গেল ট্যুরিস্ট বাংলোর পিছনের জঙ্গলের দিকে গেছে। ওদিকটা বেশ নির্জন। পাপিয়া বলেছিল— পিকনিক স্পটটা বেশ হারিয়ে যাবার মত জায়গা, দেখো। হারিয়েই গেল নাকি!

আমাকে দেখেই মীনাক্ষি আর তন্দ্রা ফিস্ ফিস্ করতে করতে অন্য দিকে চলে গেল। পাপিয়া দাঁড়িয়ে আছে একা। চাপা গলায় বলল— এত দেরী করলে কেন।

যেন কথাই ছিল আমি আসব। কেমন যেন অপমান অপমান লাগল হঠাৎ। কি ভেবেছে পাপিয়া আমাকে।

যতটা সম্ভব গম্ভীর হয়ে বললাম— বুচুনের খিদে পেয়েছে। নীরদরা খুঁজছে তোমাকে।

—খুঁজুক। বলে খুব কাছে এসে দাঁড়াল পাপিয়া।

কিছু খেতে হলে সামনের পার্টির বাঁধানো দাঁতটা আমি খুলে রাখি। বাঁধানো দাঁত পরে খাবার খেতে অস্বস্তি হয়। ডিম-পাঁউরুটি খাবার সময় দাঁতটা খুলে রেখেছি পকেটে। পরে আর সেটা লাগানো হয়নি। মাসীমার দাঁত হারানোর কথা মনে পড়ে গেল। ছোড়দিদার ঠাট্টাও। মরার আগে তুই একবার দাঁতে-ভাতে কর। এই বেঘোরের বেগুনপোড়া দিয়ে।

পাপিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকবছর আগে হলে এতক্ষণ ডজনখানেক চুমু খাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু, এখন, বাঁধানো দাঁতটা অন্তত পরে নেওয়া উচিত তার আগে। এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে পাপিয়া! কি করে পরা যায়!

হঠাৎ বললাম— বেঘোর জায়গাটা কোথায় জানো? সেখানে নাকি ভালো বেগুন পাওয়া যায়?

প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে পাপিয়া বলল— হঠাৎ? বেগুন!

পাখিগুলো ডানা ঝটপটাচ্ছে মগডালে। এরা ঠিকানা হারায় না কিছুতেই। আমিই বা হারাতে যাব কেন!

বললাম— না, এমনি। ভাবছি কিছু নিয়ে যাব। আমার বৌ খুব বেগুন-পোড়া খেতে ভালবাসে। ধনেপাতা আর পেঁয়াজকুঁচি দিয়ে মেখে, গরম ভাতের সঙ্গে যা লাগে না!

একটা কালো ছায়া পড়ল যেন পাপিয়ার মুখে। মাথা নিচু করে বলল, বুচুনও খুব ভালবাসে।

—ওর খিদে পেয়েছে বলছিল।

—চলো, দেখি, কি পাওয়া যায়। শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল পাপিয়া।

পতনের কথামালা

দিনের বেলাটা যেমন তেমন করে কেটে যায়। সন্ধে হলেই সারা বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলতে আসে। দোতলায় তো জনপ্রাণী নেই। ছোট দেওর সেই যে নাগপুর চলে গেছে, ওদিকটা তো কবে থেকে তালা মারা, সেও আজ সাত-আট বছর হয়ে গেল, ওপরে ওদের দিকটাও তালা-মারা। বাড়ি ভাগ হওয়ার পর মেজোর ছেলেরা একতলার ওপাশটা নিয়েছে। ফাঁকা দোতলায় ওঠা-নামা করা অনেক ভয়ের। ন-ঠাকুরপো নতুন বিয়ে করে বুড়ো বয়সে সাপের পাঁচ পা দেখছে। ওপরে তো ওঠেই না, সব ঘরের চাবি যক্ষের মতন আগলে আছে। মরুকগে যাক। এই তিন-কুড়ি-দশ বছর বয়েসে এতো বড় এই শ্বশুরের ভিটেয় সব তালা বন্ধ ঘরের পর ঘর—এর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে একদিন পাকা চুলে কুঁজো বুড়ি হয়ে—কে জানতো। ছেলেরা যে যার চাকরি নিয়ে বৌ-ছেলে নিয়ে দূরে দূরে। শুধু ছোট ছেলেটা কাছে থাকে। এক কুড়ি পাঁচ তো হবেই বয়েস, এখনও কথার আড় ভাঙেনি ভালো, জড়িয়ে মড়িয়ে কি যে বলে সব সময় ভালো বুঝতেও পারি না, দু-বার জিজ্ঞেস করলে আবার রেগে যায়, এই এক জ্বালাতন, অল্পেতেই বড় রাগ হয়ে যায় ছোটবাবুর। কথা ভালো বলতে না পারলে আমি কি করবো? কথা বলতে না পারলে আড্ডা দেওয়া মুশকিল। তা বলে তুই অন্যদের আড্ডার সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি। নিজেদের কথা অন্য কেউ হাঁ করে দাঁড়িয়ে শুনলে তারা যদি রাগ দেখিয়ে কি বিরক্ত হয়েই কিছু বলে—তা; আমি কি করবো। বাড়ি ফিরে আমার ওপর মেজাজ নেওয়ার কি আছে। মা যদি না থাকতো। একদিন বুঝবি, যখন সত্যিই থাকবো না। চলে না গেলে মানুষ কি মানুষের দাম বোঝে, সহজে বোঝে না। তবে ছেলেটা বড় অবুঝ। যাবার আগে ওর অন্তত একটা ব্যবস্থা করে যেতে না পারলে...।

ব্যবস্থা আর আমি কি করবো। একরকম করবো হবে আর একরকম। বড় মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে গেলাম, ফল হলো উল্টো। এখনও তাকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি। মাসে একবার অন্তত জামাই খবর পাঠাবে। আমার নাইট ডিউটি—মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, আপনি না এলে...। গেলে খারাপ লাগে না। নাতি-পুতিদের নিয়ে একরকম কেটে যায়। মেয়ের তো পোয়া বারো, মা এলে সে আর কুটোটি নাড়বে না, মানে নাড়তে চাইবে না। মায়ের যেন সে বয়েস

আছে। এই তিন-কুড়ি-দশ বছর বয়েসে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ঝি-গিরি করতে ছুটতে হবে। কপাল। জামাইও তেমনি। নামেই সুবোধ। কিছুতেই লোক রাখবে না একটা। সব মেয়ের ঘাড়ে। এদিকে দুটো বাচ্চা। বড়টা অবশ্য ক্লাস ফোর হয়ে এল। ছোটটা পেটে এল যখন, কত করে বললুম জামাইকে— রাখতে হবে না, এই বাজারে একটার পর একটা ঝামেলা। তা কে শোনে কার কথা। দেখতে দুটোই একেবারে বাপের হাবভাব বসানো। মেয়ের কিছুস পায়নি গা।

দশ নম্বরে হরিপাল, তাও মুখপোড়া বাস টাইমে কি আসবে কোনওদিন। কথায় কথায় বন্ধ। কি যে দিনকাল এল বাবা, কি জানি। হরিপাল থেকে শেওড়াফুলি, সেখান থেকে গাড়ি পাল্টে আবার উল্টোদিকে চুঁচড়ো। তারপর আবার মাইলটাক হাঁটা, জামাই আর বাড়ি করার জায়গা পেলুনি গা। তা ওদের বাড়ি করার রোগ আছে। দর্জিপাড়ার বাড়িতে জায়গা কম. বড়দা বাড়ি করেছে ডানলপে—সেই বড়দার বাড়ি থেকে বিয়ে হলো, বছর ঘুরতে না ঘুরতে জামাই বলে—ও বাড়িতে আর না। ছোট বড় কথা বলে বৌদিরা। সস্তায় জমি খুঁজতে সেই চুঁচড়ো— এ পারে আধমাইল দূরে এই ব্রিজের ধারে। তা ওরা পারে বাবা। কোথায় সস্তায় কাঠ পাওয়া যায়, সুবোধ খুঁজে খুঁজে সেই নিমতলার কাঠের আড়ৎ থেকে কাঠ কিনে দরজা-জানলার পাল্লা করলে। তারপরে কোথায় লোহার রড পাওয়া যায়, কোথায় গ্রিল পাওয়া যায়....আমার ছেলেরা বাবা এতসব পারবে নে, পারেও না। তারা সব যে যার বৌ নিয়ে নিজের মতন থাকে....। অসদ্ভাব নেই অবিশ্যি। গেলে সবাই খুব খাতির করে। সেটা কিন্তু মুখের খাতির নয়। সেজোর ছেলেগুলো তো জ্বালিয়ে খাবে। গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আর বলবে—ঠাম্মা তুমি এলে কেন, তুমি এলে কেন? আর দু-চারদিন পরে যখন চলে আসবো তখন বলবে—ঠাম্মা তুমি চলে যাচ্ছো কেন? তুমি থাকো না, তুমি থাকো না। অনেক বয়েস অবধি ওরা তো জানতোই না, কে ওদের দাদু, কে ওদের ঠাকুমা। সংসারের এই এক ছিরি হয়েছে আজকাল, স্বামী-স্ত্রী, আর একটা কি বড়জোর দুটো বাচ্চা, ব্যস। আমাদের কালে এমন ছিল না বাপু। আমার শাশুড়ির তো নটা ছেলেমেয়ে, আমার অবশ্য সাতটা। শাশুড়ির মায়ের তো আঠারোটা ছিল। হাসপাতালেও যেতে হতো না। আজকাল তো নার্সিংহোম ছাড়া চলে না। গেলেই দেবে পেট কেটে। সামলাও ঠেলা। বড় ছেলেটার দুটো ছেলে, বৌমাকে নাকি অপারেশন করে দিয়েছে, আর হবে না। কতরকম হয়েছে আজকাল। মেজছেলেটার তো কিছুই হলো না। বারো বছর ঘর করে বৌটা পালালো। যত্তোসব। চাকরি আর বাপের বাড়ি—এই করলে সংসার থাকে। হাসপাতালের নার্স—কি ট্যাকটেকে কথা! মেজবৌমা অবশ্য ছোট মেয়েটাকে নার্সিং-এ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। উপকার পেলে সেটা তো মানতেই হবে। মাস গেলে দু-তিন হাজার পাচ্ছে। ওর জন্যে চিন্তার কিছু নেই। উল্টে ওর হাসপাতালে বাবা-মার চিকিৎসা ফ্রি। তাও যদি দুদিন আগে হত। ওর বাবা চলে গেল ক্যান্সারে। তখনও তো

পাশ করে নি। পাশ করে গেলে বিনা পয়সায় বাবার চিকিৎসা হতে পারতো। বড় ছেলে থাকে সেই চণ্ডিগড়ে। তাকে তার পরে আনা হল, সে তো কেঁদেই অস্থির। যা করবার সব ওই মেজছেলে। হাসপাতালে ভর্তি করা, সবরকম টেস্ট, রোজ যাওয়া-আসা, সবাইকে খবর দেওয়া, সব সব। মেজোর নতুন বৌটা বেশ ভালো—ঠাণ্ডা, ঘরোয়া। পাঁচজনের জন্যে করে খুব। সেজো ছেলেটা স্বার্থপরের হাঁড়ি, একদিনও বুড়ো বাপটাকে দেখতে পর্যন্ত গেল না। যদি টাকা দিতে হয়! ক্যান্সার ধরা পড়েছে শোনার পর এল। হাসপাতালে রেখে আর কি হবে—বাড়ি নিয়ে যাও—উপদেশ দিয়ে চলে গেল। খরচের বেশিরভাগ সব ওই মেজো ছেলের ওপর দিয়েই গেল। বড় অবশ্য হাতে করে যা এনেছিল সবই দিয়েছে। দু-ছেলেকে নিয়ে বড় বৌমা যখন এসে পৌঁছালে তখন সব শেষ। ন-ছেলেটা সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গেছে বছর বারো হল। সেও এসেছিল শ্রাদ্ধশান্তির দিনে। গ্রামের বাড়িতে সেকি ভিড়। সন্ন্যাসী ছেলে বাড়ি ফিরেছে। সে যে ঘন্টাখানেক থেকে আবার চলে যাবে কে জানতো। পাঁচ ছেলে বিধবা মাকে নিয়ে গ্রুপ ফটো তুলিয়ে রাখলো। সন্ন্যসী ছেলে দাদাদের বলে গেল— মাকে দেখো। ছোট ভাইকে দেখো। আরও কত ধর্মের কথা। উপদেশ। উপলব্ধি।

মেজোকে নাকি কত্তা কবে বলেছিল অসুখের কষ্টের মধ্যে—মোটরে করে কলকাতা নিয়ে যাবি, ভালো হাসপাতালে দেখাবি, উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে পোড়াবি। তখন অবিশ্যি হাসতে হাসতে ছেলে এসব বলছিল আমাকে, উত্তরপাড়ার বাড়িতে বসে—বলতে কি মেজোটাই বাড়ি করেছে এই বয়েসে, অথচ ওই ছিল সবচেয়ে উড়নচণ্ডী, অল্পবিস্তর মাতাল, ভবঘুরে। বড়টা থাকে বাইরে, সেজো তো সময়ই পায় না। ন ছেলে সন্ন্যাসী, ছোটটা কোনও কম্মের নয়, দেশের বাড়ি খাঁ খাঁ করছে, এর মধ্যে হাত পা ফুলতে লাগলো, পেটটা ফুলতে লাগলো, কিছু খেতে পারে না। খালি এ ডাক্তার ডাকো, ও ডাক্তার ডাকো, আর বসে বসে ঘরদোর নোংরা করছে। হাইড্রোসিল, ব্লাড-সুগার, অরুচি। তখন তো কেউ জানতো না, লিভারে ক্যান্সার আছে। এর মধ্যে ছেলের বাড়ি কি কোথাও যেতে হলে একা ফেলে রেখেই যেতে হয়, কি করবো। ন-ঠাকুরপো বাড়িতে আছে খেয়াল করেনি। সদরে ছিটকিনি দিয়ে বাজারে রাখালের দোকানে গেছে কাগজ পড়তে। তখনও হাঁটতে পারতো আস্তে আস্তে—আর ওই এক রোগ বরাবরের—সব কটা কাগজ পড়া চাই আগামুড়ো—তা দুপুরের ঘুম থেকে উঠে ন-ঠাকুরপো বেরোতে পারছে না, বাইরে থেকে ছিটকিনি—আর অত বড় বাড়ি কে শুনতে পাবে। শেষকালে জানলা দিয়ে লোক ডেকে সোজা রাখালের দোকানে গিয়ে এক ধাক্কা। চিৎকার চেঁচামেচি। কোমরের হাড়খানাই ভেঙ্গে গেল। খরচাও দিল ওই। ভ্যানরিক্সায় হরিপাল। ডাক্তার এক্স-রে ব্যান্ডেজ। হাঁটাহাটি বন্ধ। শুয়ে শুয়ে চেঁচাতো — কোলে পিঠে করে ভাইদের মানুষ করিচি এইজন্যে...। বাজারে একগাদা লোকের সামনে আমাকে ঠেলে ফেলে

দিলি..। তোর দাদুর নামে বাজার...। যেন নিজের কোমরের হাড় ভাঙার চে' সে কষ্ট বেশি।

মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেলেও তার ইতিহাস তো আর নিঃস্ব হয় না। ইতিহাস একই রকম থাকে। পেঁপে আনতে গেছি রায়েদের বাগান থেকে একদিন, কত্তা গাছ থেকে পাড়া ডাব কাটছিল। বললে— বড় বৌদি। একখানা কাগজ পেলুম আজ সকালে। তোমার স্বামীর দাদু আমাকে দোকান করে দিয়েছিল যখন, তখনকার আমলে অরবিন্দ মিলের এক জোড়া কোরা ধুতির দাম ছিল চার টাকা। বংশানুক্রমে আমাদের সাইকেলের দোকান। আমার বয়স তখন তেরো হবে। সব কিছু কিনে দিয়ে ঘর বসিয়ে থাকতে দিয়ে বললে — এ গাঁয়ে সাইকেলের দোকান নেই। কালে দাম হবে। দোকান কর। বাঙালি তো ব্যবসায় যায় না। আমি থাকতে তোদের অসুবিধে হবে না।

এখন তার কাছে গাছের পেঁপে চাইতে যেতে হয়। বাগান, বাড়ি, দোকান মিলিয়ে এখন ওদের সম্পত্তি আমাদের চে' বেশি। বেচে খেলে আর কদিন থাকবে। এ বাড়ির লোকেরা তো কেঁউ খেটে খেতে শিখলো না। সব সময় জমিদারী চাল। শুধু হুকুম করছে একে ওকে। হুকুম তামিল করবার লোকেরা যে গত পঞ্চাশ বছরে যে যার কেটে পড়েছে নিজের নিজের আখের গুছিয়ে—সে খেয়াল নেই। বাড়িটা তো গোডাউন। ধ্বসে যাওয়া দেয়াল থেকে দাঁত বের করা ইটগুলো কি শুনবে তোমার হুকুম? তারা হাসবে। নিজেদের ক্ষয় রোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই ঠিক—সে খেলা প্রকৃতির। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিতে যে পতনের কথামালা চিরকাল লেগে থাকে তা বাইরে থেকে দুঃখের হলেও আসলে তা খুব মজার নয় কি। মাটি থেকে ইঁট তৈরি করে বাড়ি গাঁথে যে মানুষ, তারই সুদিন দুর্দিন দেখে একদিন আধাভাঙা সেই ইঁট কাঠগুলিই নিঃশব্দে দাঁত বের করে অসহায় বিদ্রূপের হাসি হাসে। এই নাকি মানুষের পরিচয়। যখন ভূমিষ্ঠ হল শিশু, তখন তাকে নিয়ে কত আদিখ্যেতা, কাড়াকাড়ি, বাড়াবাড়ি। চল্লিশ বছর পরে সেই শিশুটিই হয়তো নিজের পিতাকে হুঙ্কার দিয়ে বলে—তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারো না? এত ডাক্তার-বদ্যি, ওসুধ-ইঞ্জেকশন আসবে কোত্থেকে? পয়সা সস্তা।

বড় ছেলের মানি-অর্ডার আসতে দু-দিন দেরী হলে গাঁয়ের নতুন পিওনকে ডেকে অস্থির করি—কিগো ছেলে, বুড়ির কতা কি ভুলে গেলে। তা সে ছেলে ভারি শিক্ষিত। একদিন বলে—আপনাদের পিথিবি বিখ্যাত বাড়ি—আপনাদের কতা কি ভোলা যায় ঠাকুমা। মনি-অর্ডার চিঠিপত্তর যাই আসুক, ও আমি ঠিক দিয়ে আসবো, আপনার কোনও চিন্তা নেই।

ছেলেটা নতুন তো। শুনেছে সব। কথাটা ভুল নয়। যে কোনও এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারকে যে বই পড়তে হয়, সার্জারির টেক্সট বই—সে তো আমার কত্তার ছোটকাকার লেখা। সে-না হয় আজকাল থাকে না এখানে, শহরে তার তিন চারটে

বাড়ি। কিন্তু এটা তার আদি বাসস্থান তো বটে। এ বাড়িতে সে বাচ্চা বেলায় ল্যাংটো পোঁদে ঘুরেচে। লোকে দেখলে বলে জানো ওটা অমুকচন্দ্র অমুকের বাড়ি। ওই যে গো সার্জারির বই আছে— ডাক্তার কে পি দাস। বিধান রায়ের প্রিয় শিষ্য। ....ওকে ডাক্তার করার জন্য বড় মা একগাদা গয়না রেখে গেসলেন। বিয়ের পর পর বাড়ির ব্যাটাছেলেরা কলকাতায় কাজে কম্মে থাকতো—সন্ধে হলেই পুরো ভুতুড়ে হয়ে যেত সারা বাড়িটা—আর শাশুড়ি মা ঘরে খিল দিয়ে আমার সাথে খেলতো—আর বলতো—কিগো কলকাতার মেয়ে, জীবনে এসব দেকেচো ? ছুঁয়ে দেখা তো দূরের কতা, চোখে দেকেচো ? ওই রতনচূড় আর কৃষ্ণচূড়টা মোট কত ভরির জিনিস জানো ? আর মান্তাসাটা ?

এই বাড়িতে। এই তো ক-বছর আগে, বড়ি তখন গমগম করতো। সব কথায় বড়-বৌ। জন চাষীরা খেতে আসবে, বড় বৌ। খড় কাটতে গিয়ে আঙুল কেটেছে দুলাল খুড়োর, তার ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে...বড় বৌ। ঢেঁকিতে চাল ছাটা হচ্ছে, ঢেঁকির পাড়ে পা দেবে কে ? বড় বৌ। প্যারালিসিসে ভুগে শ্বশুরের বেড সোর...ঘা পরিষ্কার করবে কে ? বড় বৌ। সব ব্যস্ততা ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল ক-বছরে। কোথায় গেল সব লোক লস্কর ? ইতিহাস হয়ে গেল ? মানুষ কত তাড়াতাড়ি ইতিহাসে চলে যায়। পৃথিবীর মাটিতে তার কদিনের চলাফেরা ? বিয়ের আগে কলকাতার ছিদাম মুদি লেনে—এঁদো গলির স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে মুক্তির আকাশ মানে গানের মাস্টারের হাসি— রিড ক্ষয়ে যাওয়া হারমোনিয়ামে সুর তুলে—চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে...উছলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো-ও-ও। কলতলা নিয়ে কাড়াকাড়ি। দাদার বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা। সেখান থেকে এতো বড় আকাশের মাঝখানে — সত্যি সত্যি, যাকে বলে গোলাভরা ধান গোয়াল ভরা গরু...। তাও সব ভ্যানিশ হয়ে গেল এক পুরুষেই। ছেলেরা চাকরির ধান্ধায় চলে গেল এদিক ওদিক, আটচালায় বলির মাটি শুকিয়ে ফুটি ফাটা হয়ে গেল। হাত ভাঙা টিউবওয়েল একা দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। ...পাঁচিল ভাঙা পাতকুয়োর কপিকলে আজ দড়ি নেই কবছর হল মনে পড়ে না। ...বেচে খেলে আর কদিন থাকবে বিষয়-আশয়। কিছু বলতে গেলেই কত্তা বলতো—ছেলে মেয়েগুলো তো মানুষ হল।

ছেলে মেয়ে। ননদের ছেলে ইলেকট্রিক অফিসে কাজ পেয়েছে, তাকে ধরে করে গ্রামের বাড়িতে মিটার বসালুম। সেসব দরকারে শ্রীরামপুরে একদিন ট্রেন থেকে সবে নেমেছি, মেজো-ছেলের কি চেঁচামেচি। এই বয়েসে তুমি এভাবে ট্রেনে-বাসে কেন ঘুরে মরছো ? আমরা কি বেঁচে নেই ? বাড়িতে লাইট আসবে তার জন্য তোমাকে ছোটপিসিমার ছেলের কাছে ছুটতে হবে ? কী অবস্থা।...হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বলে এত কথা! মায়ের খবর তুই কত রাখিস্। সেই যে বিয়ে করে বৌকে নিয়ে কেটে পড়লি-তার পর থেকে তো...। বারো তেরো বছর পরে—না

হল ছেলেপুলে, না হল কিছু—বৌটাও পালালো—তারপর আবার সেই মা-মা-মা। তোমার কলকাতার চাকরি, উত্তরপাড়ার গঙ্গার ধারে ফ্ল্যাট —আড্ডা—সব ছেড়ে গ্রামে মায়ের ঘরে আলো জ্বলছে কিনা দেখার সময় আছে তোমার। বুড়ি হয়েছি তো কি হয়েছে? মা তো বিছানায় পড়ে নেই। নিজেই যদি পারে ব্যবস্থা করতে, তোদের সে বলতে যাবে কেন?

বড় ছেলে ট্রান্সফার হল হিমাচলে। সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসতে তার কাছে যেতে হল। দু-ছেলে নিয়ে বড়-বৌমা একা হাতে সব কাজ সামলাতে পারে না। হিমালয়ের কোলে, দোতলা বাড়ি। বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকলে মনে হয় হিমালয় পাহাড়ের, অনেকখানি আমার পায়ের তলায়। মানুষের কত অহংকার। একদিন নাকি এই পুরো হিমালয় পাহাড়টাই সমুদ্দরের নিচে ছিল। কী করে যে থাকে। মানুষের ভাগ্যও বোধহয় এরকমই—খেটে না জাগালে সাত হাত জলের তলায় পড়ে থাকে। পচে মরে। মাস খানেক যেতে না যেতেই বড়-বৌমা বলে কি—ছোট ছেলেটা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছে একা একা। টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিলে আপনি একা একা যেতে পারবেন না?

তা পারবো। পৃথিবী থেকেই তো চলে যাবার সময় হয়ে এল। একাই তো যাবো। কেউ কি সঙ্গে যাবে? এত দুঃখ, এত অভিমান—সব ফেলে চলে যেতে হবে। ভাবলে কেমন যেন লাগে।

এই ভোরবেলাকার আলো, সন্ধেবেলার তুলসীতলা, সারাদিনের এতরকম আকাশ, মান অভিমানের কত রকম লোকজন, সব সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। একজন তো দিব্যি ফেলে রেখে চলে গেল, কই—তার কোনও অসুবিধে হল না তো। বেঁচে থাকতে তাকে গালমন্দ করেছি কত—রোজগারের নামে অষ্টরম্ভা, খালি জমি-জমা বিষয়-আশয় বিক্রি করে করে....এখন ছেলেরা টাকা পাঠালে তবে....অসুখে ভুগে এই যে হঠাৎ চলে গেল .... সে কি তারই প্রতিবাদ। হাতিবাগানে দোকান থাকতে একটু ফুটো-ফাটা হয়ে গেলে বিক্রি হতো না বেনারসী, দামি মাল লোকে নেবে কেন। মহাজনকে ফেরৎ না দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতো—নাও পরো। কতদিন বেনারসী পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। সে দোকানে দেনা হল দেড় লাখ টাকা। হবে না? অত ভাল মানুষি করলে ব্যবসা চলে? সব লোককে বলতো, নিয়ে যান না, পরে দেবেন খন সুবিধে মত। ধার দেবে। মহাজনের খাতায় দেনা বাড়তে বাড়তে এমন হল, দোকান না বেচে দিলে শোধ হবে না। কলকাতার পাট চুকলো। গ্রামের বাড়িতে চাষবাস? অত খাটবে কে, শুয়ে বসে খাওয়ার দোষ, রক্তে, সব ভাগে দেওয়া জমিতে সম্বৎসর যা পাওয়া যেত তা আর বলার নয়। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন সব শেষ।

বসে বসে জলের দরে সব কিনলো ন-ঠাকুরপো। শাশুড়ি আর ছোট দেওরেরটা তো আগেই কিনেছে, সেজো তো দানপত্র করে দিয়ে চলে গেছে কবে। পুলিশের

বিরাট অফিসার। পোড়া গাঁয়ের জমি-জমায় তার দরকার কি। মেজো-ঠাকুরপোরও তো এই বসে খাওয়া বেচে খাওয়া কারবার। সব কিনলো ওই ন-ঠাকুরপো। আইবুড়ো যক্ষ। বুড়ো বয়েসে আবার বিয়েয় বসেছে। বলে— এতসব খাবে কে। দেখবে কে। মাঠেঘাটে ছোটাছুটির ক্ষমতা কমেছে। সব বেচে বুচে ফিক্সড করে দিয়েছে ব্যাঙ্কে। সুদে খায়। সারাদিন বেরোবার দরকার নেই, ঘরে বসে আধবয়সী বউয়ের খিদমত খাটছে। উনুন ধরাচ্ছে, বাটনা বেটে দিচ্ছে, তরকারি কুটে দিচ্ছে। মরণ। দুপুরে ভাত খেতে বসেছে, একদিন দেখি বউয়ের গা খোলা। বরানগরের কোনও বস্তির মেয়ে তো। এর বেশি আর কি হবে। রাত দিন ঘরদোর বন্ধ করে রান্না করছে। কি যে করছে।

জীবনের কতরকম মায়া।

মায়ায় জড়িয়ে মানুষের যে কী অবস্থা হয়। সাধুর লেংটি ইঁদুরে কেটে দিয়েছে বলে বেড়াল পোষা হল, বেড়াল দুধ খায় বলে গরু এল, গরু খড় খায় বলে ধান চাষ...। তারপর শেষে নাকে দড়ি দিয়ে ছোটাছুটি। ...শ্বশুরমশাইকে দেখেছি, তিন বছর প্যারালিসিসে ভুগে কী কষ্ট পেয়ে যে গেল— অথচ এই লোকই ক'বছর আগে কারুর খাজনা এক পয়সা ছাড়বো না। কী দাপট। মরবার সময় সারাদিন বাড়ির সব লোকের নাম ধরে ধরে পরিত্রাহি চিৎকার করে ডাকলেও কেউ শুনতো না। পতনের অনিবার্য কথামালা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে। যে ন-ঠাকুরপোকে খাইয়ে না দিলে থেকে পারতো না সে আজ বৌয়ের উনুন ধরিয়ে দিচ্ছে, বাটনা বেটে দিচ্ছে, রুটি বেলে দিচ্ছে, সারাদিনে একবারও তার বড় বৌদি বলে ডাকবার সময় হয় না। ওদের কথা যেমন তেমন, নিজের পেটের ছেলেরা দুদিনের জায়গায় তিনদিন গিয়ে থাকলে বলে দেয়— মা, তুমি অমুকের বাড়ি অনেকদিন যাওনি। একবার ঘুরে এস না।

যেন এই সত্তুরে বুড়িটা তাদের সব পয়সা খেয়ে নিলে।

বিচ্ছিন্ন

গাড়িটা ফিরে পেয়ে সোজা তোমার কাছেই গেলাম কিন্তু। জয়ের কথা, আনন্দের কথা, কাউকে তো বলতে হবে! অন্য কারও কথা মনে পড়েনি, তোমার কাছেই যাবার কথা মনে পড়ল, ইচ্ছেও হল। যদিও জানতাম, তোমার তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না, এবং আমার বেশ খারাপই লাগবে, সব মিলিয়ে। হস্টেলে, অন্যদের সামনে, অবশ্য চুপচাপ ছিলে বেশ; ডেকে পাঠাবার আগেই তুমি এসে গেলে, অত্যন্ত সেজেগুজে কোথায় যেন যাচ্ছ— চমৎকার ম্যানেজ দিলে পুরো ব্যাপারটা— যেন আমার সঙ্গেই কোথাও যাচ্ছ, যেন আমি আসব বলেই তৈরি হয়ে বসেছিলে; অন্তত সবাই তাই ভাবল! লিফ্‌ট দিয়ে নেমেই কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলে— আমি যে সঙ্গে আছি, সেটা যেন কোনও ঘটনাই নয়! যেন তুমি জানতেই, যে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তো যাব। যেতেই হল, তুমিও হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে বললে— আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি, তুমি তো গাড়ি পেয়ে গেছ, বাড়ি চলে যাও।

কী সংক্ষিপ্ত, কী সহজ— সে উত্তর। মনের আবেগ মনের মধ্যেই চেপে রেখে আমি সোজা বাড়ি চলে এলাম।

এগারো বছর সংসার করার পর, নিঃসন্তান বন্ধ্যা দাম্পত্য করার পর, কোনও স্বামীকে কোনও স্ত্রী যে এত গুরুত্বহীনভাবে নিতে পারে— তোমাকে না দেখলে বোঝা হত না আমার। চাকরি করার অহংকারে হস্টেলে চলে গেলে— আমার জন্যে রেখে গেলে স্মৃতি বোঝাই অপমান আর অসহ্য পুরুষালি একাকিত্ব। মেয়েরা একা হয়ে গেলেও ঠিক ম্যানেজ করে নেয়; তারা যে রান্নাটা করতে পারে অন্তত, তাছাড়া আত্মীয়স্বজনের বাচ্চা-টাচ্চা নিয়ে কাটিতে দিতে পারে। একজন পুরুষমানুষ শুধু নিজের জন্যে রোজ একা একা রান্না করছে— এতটা এখনও ভাবা যায় না। কেউ কেউ যে পারে না তা নয়। কী করে যে পারে।

তুমি চলে যাবার পর একটার পর একটা দুর্যোগ যাচ্ছে। শুনবে? প্রথম প্রথম তো নিজেই দুধভাত, আলুভাতে-ডিমসেদ্ধ করে নিচ্ছিলাম। একতলার পাঞ্জাবিদের ফ্ল্যাটের যে কুকটা, সে একদিন নিজেই অ্যাপ্রোচ করল— দাদা, আমি সব শুনেছি; আমি যদি আপনার রান্নাটা করে দিই দুবেলা, আপনার কোনও অসুবিধে হবে?

তুমি চলে যাবার পর একটার পর একটা দুর্যোগ যাচ্ছে। শুনবে? প্রথম প্রথম তো নিজেই দুধভাত, আলুভাতে-ডিমসেদ্ধ করে নিচ্ছিলাম। একতলার পাঞ্জাবিদের ফ্ল্যাটের যে কুকটা, সে একদিন নিজেই অ্যাপ্রোচ করল— দাদা, আমি সব শুনেছি; আমি যদি আপনার রান্নাটা করে দিই দুবেলা, আপনার কোনও অসুবিধে হবে?

শুনে বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তোমার ওপর রাগ করে নিজেই নিজের খাবার ব্যবস্থা, জামাকাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, একা থাকা, সব সয়ে নিতে পারব— এই ঘোরটা কেটে যেতে চারদিকে রান্নার লোকের খোঁজ করেছি— একা থাকি শুনে কেউ রাজি হয়নি, আর এই মেয়েটা বলে কী? বললাম— অসুবিধে তো আপনার হবে! আমি একা থাকি...। মেয়েটা বলল— ওসব আমি পরোয়া করি না। এখানে মিস্টার ওয়ালিয়াও তো একা থাকেন প্রায়ই। ... আমি আবার বাড়িতে ভালোমন্দ খাবার খেতে লাগলাম। মেয়েটার কাছে তোমার ডুপ্লিকেট চাবিটা দিয়ে রাখলাম। রাত্রে বাড়ি ফিরে রোজ দেখতাম খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। তারপর— বিপদ এল দুটো দিক থেকে। একদিন সকালে মেয়েটি বলল— বৌদি ফিরে এলে আমাকে কিছু বলবে না তো?

ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি।

বললাম— কী বলবে, না বলবে তা তো জানি না। তবে ফিরে আসবে না সহজে সেটা জানি।

—তাহলে আপনি আবার বিয়ে করে নিন।

—বিয়ে করাটা কি মুড়িমুড়কি নাকি!

—কেন, আমাকে কি দেখতে খারাপ, না আমার রান্না খারাপ?

ওহ, এই ব্যাপার! পরিচারিকা হয়ে এসে গৃহিনী হবার স্বপ্ন দেখছে! আমি কি এতটাই ব্যক্তিত্বহীন! সেই প্রথম মেয়েটাকে ভাল করে দেখলাম। যতটা সম্ভব গম্ভীরভাবে বললাম— নিজের কাজ করো। মেয়েটা সামনে থেকে সরে যেতে যেতে বলল— খুব খারাপ কথা কিছু বলিনি। আপনি লোক খারাপ নন আমি জানি। বৌদি একটু বেশি মেজাজি ছিল— আমি তা-ও জানি। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে লোকের বাড়ি রাঁধুনির কাজ করছি— তা ব'লে আমি ফালতু ঘরের মেয়ে নই, মনে রাখবেন!

এরপর থেকে খুব সাবধানে থাকতাম, জানো! মেয়েটা এত ভাল রাঁধে যে তাকে কটু কথা বলতে খারাপ লাগল। দু-একদিন পরেই আর এক কাণ্ড! মেয়েটা নাকি দুধ বসিয়ে দিয়ে নীচে চলে গেছল। পুরো দুধ পুড়ে গিয়ে, বাটি অব্দি জ্বলে গেছে। ফ্ল্যাট বাড়ি, ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে আমার রান্নাঘরটা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে মিলে চিৎকার, চেঁচামেচি। মেয়েটাকে মিস্টার ওয়ালিয়া শুধু মারতে বাকি রেখেছে। ... তারপর থেকে আর আসে না। চাবিটা ফেরত দিয়ে যাবার সময়

বলে গেল— আপনি না খেতে পেয়ে মরে যান, আমি দেখতে যাব না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

আবার সেই অফিস-ক্যান্টিন। রাত্রে হোটেল। তোমার ওপর যত রাগ বাড়ে তত তোমার অনিবার্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়! মনে মনে বলি— যত খুশি মেজাজ দেখাও, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু ফিরে এসো!

...তারপর অবশ্য দোতলার মাসিমা আর একজনকে দিল। সে বেশ ভাল। এখনও পর্যন্ত কোনও গন্ডগোল করেনি।

বেশ চলছিল। মাঝে মাঝে হস্টেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তুমি কথা বল ঠিকই, শুধু ফিরে আসার কথাটা বাদ।

তারপর একদিন, গাড়িটা বেহাত হয়ে গেল। দু-চাকার ওপর পাবলিকের এমনিতেই রাগ থাকে। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে পড়ল বোকার মতো। অনেক কষ্টে বাঁচালাম তাকে। ধন্যবাদ দেওয়া দূরের কথা, উপস্থিত জনতা থানায় নিয়ে গেল, সামনেই ছিল থানাটা। পাক্কা একশো টাকা না দিলে ছাড়া যাবে না। ...একপয়সাও দোব না বললাম। গাড়ির কাগজপত্র কোথায়?

বাড়িতে। ব্যাস্। আর যায় কোথায়। চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলাম! চারশো এগারো সি আর পি সি। সোজা লক-আপে। রাত তখন সাড়ে দশটা। বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে...। পায়খানার গন্ধ, বড় বড় ছুঁচো... আরশোলা...। তুমি বাড়িতে থাকলে নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে— লাইসেন্সটা নিয়েছ তো?... পরের দিন বিকেল চারটের সময় জামিনে বেরোলাম, নিজের গাড়ি নিজেই চুরি করার অপরাধে! সাব-ইন্সপেক্টরকে দিয়ে সব কাগজপত্র দেখিয়ে ডিসচার্জ-রিপোর্ট লেখাতে দুশো টাকা, কোর্ট-অর্ডার বার করতে আরও দুশো টাকা— আর জামিন বারোশো— মোট ষোলোশো টাকার ধাক্কা। শুধু তুমি বাড়ি নেই বলে! বউ বাড়িতে না থাকলে যে এতরকম বিপদ হয় কে জানত! অগ্নিদগ্ধ হতে হতে বেঁচে গিয়ে, থানাপুলিশ লক-আপ কোর্টঘর পুলিশভ্যান ইত্যাদি করে গাড়ি ছাড়িয়ে এনে— তোমাকে যখনই কিছু বলতে যাই, তুমি নিজের কথা বলো, একই কথা, এক অভিযোগ, এক অভিব্যক্তি— আমি কিছু আর বলতেই পারি না। ...তোমার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না, তুমি এখন এসো— এসব শুনলে কি আর বসে থাকা যায়! আর একদিন, ছোট পিসিমার বাড়িতে নেমন্তন্ন, পিসতুতো ভাই টুটুলের ছেলের অন্নপ্রাশন— টুটুল তো বৌদি-বৌদি করে মাথা খারাপ করে দিল, কেন তুমি বৌদিকে নিয়ে আসোনি! পিসেমশাই থেকে শুরু করে যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন তো আছেই। বউমার কী এত কাজ থাকে— একটা দিনও কি ছুটি নিতে পারে না। কাউকে কিছু বলার আগেই সব শুনে যেতে হচ্ছে। কোনও রকমে খাওয়াদাওয়া সেরেই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়তে হল প্রায়, চক্ষুলজ্জার হাত থেকে বাঁচতে, তোমার সম্পর্কে

বিভিন্ন জনের নানারকম প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচতে। আমার কাছে থেকে তুমি চলে গেছ,— তাতে তো আমার কিছু করার নেই, মাঝখান থেকে আমি পারিবারিক প্রীতি-অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনদের মুখোমুখি হতে পারছি না প্রশ্নের ঠেলায়। এসব ঠিক কী ধরনের শাস্তি ?

আসলে শাস্তিরই বা কী আছে! একটা অবস্থা, তোমার কাছে যদি মুক্তি হয়ে আসে, আমার কাছে তাহলে তা শাস্তি হতে যাবে কেন ? মুক্তিতে আমার তো কোনও অনীহা নেই। একা থাকার অসুবিধে যেমন অনেক, সুবিধেও কি কিছু নেই ?

তুমি চলে যাওয়ার পর আমার কী কী উপকার হয়েছে জানো ?

প্রথমত, নিজেকে নতুন করে চিনতে শিখেছি। তুমি চলে না গেলে, তোমাকে যে কত ভালবাসি, বুঝতেই পারতাম না। এগারো বছর ধরে যত ঝগড়া করেছি, তার মূল বিষয় তো একটাই— তুমি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে না আমার ব্যাপারে— আমি যেমনভাবে চাইতাম ; আমার ইচ্ছে অনিচ্ছেকে কোনও গুরুত্ব দিতে না, তোমার অফিস আছে, বাপের বাড়ি আছে, নিজের বোনেদের সঙ্গে আড্ডা আছে— শুধু আমার কাছে এলেই তুমি যেন কীরকম প্রাইভেট ফার্মের মালিক হয়ে যেতে— আমি যেন অধস্তন কর্মচারী কিংবা অর্ডার সাপ্লায়ার, তোমার হুকুম মেনে চলা ছাড়া যেন আমার আর কোনও অস্তিত্ব থাকতে নেই। তুমি চলে যাবার পর— এই প্রথম আমি বুঝলুম— আমিও প্রায়ই কোনও মনোযোগ দিতাম না তোমার ব্যাপারে, যেন ধরেই নিয়েছিলাম তুমি সবসময় আমার জন্যে তো আছই— নতুন করে তোমার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সুযোগ পেলেই অভিযোগ করছি অনবরত— অভিযোগবিনিময় করেছি দুজনে আজীবন বলতে গেলে! এভাবে কি বাঁচা যায় ? আমার মা-বাবা-ভাই-বোনের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখলে তুমি রেগে যাবে, আর তুমি দিনরাত বাপের বাড়িতে পড়ে থাকলে আমি কিছু বলতে পারব না। এভাবে হয় ? মাঝে মাঝেই বিভিন্ন নারীসঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি— তখন ভাবতাম, সেসব তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করার কারণে যেহেতু আমি জানতাম তুমি স্বভাবত খুব হিংসুটে! তুমি চলে যাবার পর বুঝতে পেরেছি— সবই অজুহাত, আসলে, পরিতৃপ্ত হবার মতো সঙ্গ আমি কোনদিনই কারও কাছ থেকেই পাইনি ; না ঘরে, না বাইরে। মাঝখান থেকে তুমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছ ক্রমশ। মনের বিরক্তি মনে চেপে রেখে, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে, চিৎকার করে, 'তুমি কেন'-র তালিকা বাড়িয়ে— দিনের পর দিন জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে— এই কি ভাল হল না ? তুমি তোমার মতো থাকো, অফিস, বাপের বাড়ি আর নিজের মেজাজ নিয়ে ; আমি আমার মতো থাকি— আড্ডা, কাজ আর লেখাপড়া নিয়ে— খারাপ কী ? অবলম্বন হিসেবে, এগারো বছরের দাম্পত্যের স্মৃতি তো কম কথা

নয়। তবু তো সন্তান নেই, থাকলে, তার মানসিক অবসাদের জন্যে দায়ী হতাম আমরা।

বরং এই যে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, নিজেদের ভুলগুলোকে আমরা নতুন করে চিনতে শিখছি— এইসব আবিষ্কার দিয়ে যদি বাকি জীবনটা নতুন করে তৈরি করে নিতে পারি আমরা, ক্ষতি কী। ভাল থাকার অজস্র উপকরণ তো মানুষের হাতেই আছে— অযথা খারাপ থাকতে যাব কেন? তুমি যদি একা থাকলে ভাল থাক, আর আমি যদি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি, আমারই তো উচিত— তোমার একা থাকার ব্যবস্থা করা! নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কাউকে কাছে টেনে নিঃশেষ করে দেওয়া তো ভালবাসা নয়! আর, আইনসঙ্গতভাবে, শারীরিক ভাবে, দূরে চলে গেলেই কি দূরে যাওয়া যায়?

মনে আছে, একবার, তখন হরিপালে থাকি, কী কারণে যেন অফিসে যাইনি, সারাদিন শুয়ে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছি— তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে কোনও কারণে, মফস্বল শহরে কথা বলার মতো লোক কম; টুকটুক করে গিয়ে মোহন সিনেমায় হেমামালিনীর কী একটা পুরনো ছবি দেখতে ঢুকে পড়েছি— ইন্টারভাল হবার আগেই গেটম্যান এসে আমায় বলল— আপনাকে বৌদি ডাকছে! সিনেমাটা তুমি দেখতেই দিলে না। বাড়ি ফিরে তালা-দেওয়া দেখে সোজা সিনেমাতলায় চলে এসেছিলে। ... অফিস না গিয়ে একা একা সিনেমা দেখবে— আর আমি কাজ থেকে ফিরে বন্ধুহীন এই মফস্বলে একা ঘরে বসে থাকব, তা হতে পারে না! ... তোমার সে উত্তাপ, এখন, স্মৃতি হয়ে গেছে। ইদানীং খুব ঝগড়া হয়ে যাচ্ছিল। কথা বললেই। যখন তখন।

আজকাল ভেবে দেখেছি— সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আমাকে দেখতে না পেয়ে সিনেমা হল থেকে ডেকে আনার পেছনে, ভালবাসার উত্তাপ যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আত্মঘোষণা, আমিত্বের অহংকার, ফাঁকা ঘরে বসে তুমি আছ আর আমি নেই— এ যেন হতেই পারে না; অথচ আমি একা একা থাকতেই পারি, তোমার কাজ থাকলে তুমি ঠিকই চলে যাবে, তা সে যতই তুচ্ছ কাজ হোক! আমার কোনদিনই অত ইগো নেই— ছোটবেলা থেকে এত এলোমেলো দিন কাটিয়েছি— একা একা, শুয়ে শুয়ে সেসব ভাবতে বেশ ভালই লাগে; তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার পরে আমাকে ডিসিপ্লিনড করার চেষ্টা— তোমার প্রাণপাত পরিশ্রম, বেশ ভালই লাগত। তখন বুঝিনি, সেটাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত! বাইরে ঘুরে বেড়ালে অর্থ ও স্বাস্থ্যের অপচয়, তোমার কাছে না থাকলে যেন তোমার অস্তিত্বের অপমান— একদিন মায়ের কাছে গেলে সাতদিন ধরে তোমার খচখচানি— বাড়ি গিয়েই থাকো তাহলে, আমার কাছে আসার আর দরকার কী... ? আমাকে নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ থেকে সরিয়ে এনে, সুপরিকল্পিতভাবে

নিজের কুক্ষিগত করে ফেলে, তোমাদের যেহেতু ভাই নেই— অনেকগুলো বোন— সবায়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে ফেলে— আমি যে কত আরামে আছি— সেসব বুঝিয়ে— আমাকে নিঃশেষ করে ফেলছিলে তুমি ধীরে ধীরে। আর আমি, ভালবাসা পাওয়ার সুখে, বাড়তি তৃপ্তি ও আনন্দে থাকার আশ্লেষে, তোমার হাতে তুলে দিচ্ছিলাম আমার সমস্ত উপার্জন। ক্রমশ আমার আত্মনিবেদন এত নিঃশর্ত হয়ে গেল, তুমি যেন জেনে গেলে— আমার ব্যাপারে তোমার আর ততটা মনোযোগী থাকার দরকার নেই! প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও আমি হারিয়ে ফেলেছি। বেশির ভাগ দিন, তুমি নিজের বাড়িতেই থাকো, আমি কিছু বলতে গেলে বল— দরকার ছিল!

একজন ছাড়া বাকি চার জনই তোমার চেয়ে ছোট, মা-মরা মেয়ে সব, সবাই কম বেশি মেজাজি ও অসামাজিক, পাড়ায় মেলামেশা নেই কারুর সঙ্গে, তাদের যত কথা সব ওই মেজদির সঙ্গে। আমার সংসারে আমরা দু-জন, সেখানে আর কত কথা থাকতে পারে! তুমি বেশি স্বস্তি পেতে ওদের কাছেই, সে তো জানি। তবে, চাকরি পাবার, বিয়ে করার পরেও— নিজের বোনেদের সঙ্গে, নিজের বাড়ির সঙ্গে এত মিলিয়ে জড়িয়ে থাকতে, আর কাউকে দেখিনি! পুরুষ হিসাবে, আমি ততটা বিষয়ী নই বা সংসারী নই বলে— হাটবাজার বাসনপত্র কেনাকাটি হেনাতেনা সবই তুমি নিজের হাতে করতে বলে— হয়তো সেভাবে শ্রদ্ধা করতে পারোনি আমাকে, কোনোদিনই। ...করিৎকর্মা পুরুষদের মেয়েরা পছন্দ করবে— সেটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো কোনদিনই সেরকম কাজের লোক নই। সারাদিন শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পারলে বেঁচে যাই। আসলে, তুমি নিজে এত করিৎকর্মা, তৎপর কাজের মানুষ— যে আমাকে কিছু করতেই দিতে না। ...যে খাটে বেশি তার দাবিও বেশি হয়। ...আমার সংসারে তাই আমি-ই থাকতাম অতিথির মতো।...

তুমি চলে যাবার পর, রান্নার গ্যাস, ফ্রিজ, ডাইনিং টেবিল, বইপত্র, তোমার জামাকাপড়— সব নিয়ে চলে যাবার পর— একদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে, বাগরি মার্কেট থেকে চুয়াল্লিশ টাকা দিয়ে একটা জনতা স্টোভ কিনলাম। মাসখানেক বাইরে বাইরে খেয়ে কাটিয়েছি, যদিও। সকালে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়তাম। অফিস-ক্যান্টিনে ভাত, রাত্রে পাড়ার হোটেলে ডাল-রুটি। ফাঁকা ফ্ল্যাটটা যেন বিভীষিকা। তালা খুলে ঢুকলেই ডাইনিং হলের শূন্যতা, দেয়ালের প্লাস্টিক পেন্ট— যেন তাড়া করে আসত। টিভিটা ভাগ্যিস নিয়ে যাওনি। ঘরে ফিরি টিভি চালিয়ে সোফায় এলিয়ে পড়া ছাড়া করার কিছু নেই। ...স্টোভটা কিনতে পেরে মনে হল— এই প্রথম আমার সংসারযাত্রা শুরু হল! এতদিন তো নিজের হাতে কিছুই করিনি। আর, মজার কথা হল, স্টোভ কেনার দিন দুয়েক পরেই, নীচের ফ্ল্যাটের রান্নার মেয়েটা যেচে বলল— আমি যদি আপনার রান্নাটা করে দিই দুবেলা, আপনার কি অসুবিধে হবে? সে চলে গেল, আর একজন

এল ; একদিন মা এল বাড়িতে, আর ফিরে গেল না। ছোট ভাইকেও এনে রাখলাম। মায়ের খোঁজ করতে বাবা এল, বাবাও আর ফিরে গেল না।

চণ্ডীগড় থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে দাদা এল সপরিবারে— ভাইপো ভাইঝি, বাড়ি একদম জমজমাট। আমার ছোট ফ্ল্যাটে পারিবারিক মিলন-মেলা, যাকে বলে। নতুন করে যেন হঠাৎ ছোটবেলাটা ফিরে পেলাম আবার। শুধু তোমার জন্যে— একজন মানুষের জন্যে, আমি এতজন মানুষকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার জীবন থেকে।...

তুমি নিজে চলে গিয়ে, এই যে এতজনকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলে আমার কাছে, এর জন্যেও তো আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার, তোমার কাছে— কী বলো ?

অলকা ও ভুল মানুষের পৃথিবী

আমার গল্পটা তেমন বলবার মতো কিছু নয়। চমকপ্রদ কোনো ঘটনা নেই আমার জীবনে। খুব ছোটবেলায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম একবার। কোনো আশাই ছিল না বেঁচে ওঠার, প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিল সবাই, তবু কেমন করে যেন বেঁচে গিয়েছিলাম সে যাত্রা, বোধহয় সারা জীবন ধরে প্রত্যেক মুহূর্তে একটু একটু করে মরতে হবে বলেই। তা, সেই হঠাৎ বেঁচে যাওয়াটা চমকপ্রদ ছিল কিনা আমি অন্তত জানি না, তবে ব্যাপারটা যে একটা ঘটনা হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত, পরে বড় হয়ে মায়ের কাছে অন্তত হাজারবার শুনেছি। কিন্তু সে তো অন্যদের কাছে। আমার কাছে আমার বেঁচে ওঠাটা তো তেমন কোনো ঘটনা নয়, মানে তখন ছিল না, আসলে তখন আমি এতই ছোট ছিলাম যে, কোনো বোধই ছিল না, ঘটনা কি, ঘটনা কাকে বলে, এ সব ব্যাপারে। এখন যেমন আছে। এখন বুঝতে পারি—কোনটা ঘটনা, কোনটা ঘটনা নয়। এই যে গত একুশে নভেম্বর আমি একত্রিশ পেরিয়ে বত্রিশে পা দিলাম, এটা আমার কাছে অবশ্যই একটা ঘটনা। অথচ সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক দিন কত অজস্র ঘটনাই যে ঘটে যাচ্ছে, নিহত হচ্ছে কত অসংখ্য মানুষ, পদত্যাগ করছে কত মন্ত্রী, মিছিল করে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে কত প্রতিবাদী জনতা, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কত চালু কলকারখানা। এ সব আসলে আমার জীবনে, আমার কাছে, কোনো ঘটনাই নয়। সারা পৃথিবীতে কোথায় কী হচ্ছে, তাতে কি আমার আদৌ কিছু যায় আসে? অন্যায় আর অবিচার এত জলভাত হয়ে গেছে আজকাল, কোনো কিছুতেই আর মানুষের কিছু আসে যায় না। নির্মম কোনো বীভৎস বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেও, কেউ আর আশ্চর্য হয় না আজকাল। বরঞ্চ কেউ হঠাৎ কোনো প্রতিবাদ করে ফেললে, সবাই তার দিকে— 'এমা, কি বোকারে বাবা'— এ রকম ভাব করে তাকায়।

এ সবের মধ্যে একত্রিশটা বসন্ত, একত্রিশটা শীত, একত্রিশটা গ্রীষ্ম, একত্রিশটা বর্ষা আমি পেরিয়ে এলাম। আমি সেই রকম এক সাধারণ রোগা শ্যামলা ময়লা মেয়ে, যাদের কিছুতেই বিয়ে হতে চায় না। বিয়ের বাজারে আমার যে কোনো দাম নেই, সেটা আমি বুঝেছিলাম কলেজে উঠেই। মেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক হৈ-হুল্লোড় ইত্যাদি বাদ দিলে, অন্য সবাইয়ের মতন কোনো দিন ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারিনি আমি। সুযোগ যে একেবারেই পাইনি তা বলবো না— তবে

কেমন যেন হাল্কা লাগতো, খেলো মনে হত, এ কি! একজন যে কোনো যুবককে কেমন অক্লেশে নিজের সর্বস্বে টেনে নেয়। এরা কেউ কেউ তো 'তু' করে ডাকলেই ছুটে যায়। অনেকে আবার এক সঙ্গে তিনচার জনের সঙ্গে আড্ডা জমাতে না পারলে নাকি ঘুমোতেই পারে না! আমার ওসব ভালোই লাগতো না। সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী না হতে পারি, তা বলে যে শস্তা হয়ে যেতে হবে আমাকে, এমন তো কোনো কথা নেই।

তখন থেকেই আমি ঠিক করেছিলাম আমি চাকরি করবো। ততোটা স্বনির্ভরতার কারণে নয়, যতোটা রান্নাঘরে ঢোকার ভয়ে। মাকে দেখেছি, সারা জীবন, প্রতিটি সকাল, প্রতিটি সন্ধে শুধু রান্নাঘর থেকে কথা বলে গেল। আড্ডা নেই, উপুড় হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া নেই, বন্ধুর বাড়ি যাওয়া নেই, এমন কি সিনেমা দেখতে যাওয়া পর্যন্ত, মায়ের জীবনে তেমনভাবে ছিল না। মায়ের আমলে এত টি-ভি, এত রান্নার গ্যাসের ছড়াছড়ি তো ছিল না। তা সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ঠিক করেছি, আমার জীবনে রান্নাঘর যেন না থাকে, দরকার হয় না খেয়ে থাকবো, তবু রান্নাঘরে ঢুকবো না— অন্তত নিজের জন্যে তো নয়ই। ব্যাপারটা যে হুবহু সত্যি হয়ে যাবে এমনভাবে আমার জীবনে তা কে জানতো। এরা দুবেলা খাবার দিয়ে যায় আমার ঘরের টেবিলে, তাও সবদিন খাওয়া হয় না হয়তো, ইচ্ছেই থাকে না সব সময়— একা একা খাওয়ার একটা আশ্চর্য ক্লান্তি আছে, কেউ ঠিক কাছে দাঁড়িয়ে তদারকি কিংবা মমতাময় দেখাশোনা করছে না বলেই বোধহয়— সব সময় ভালো লাগে না একা একা খেতে, ইচ্ছেই করে না, যেমনকার ঢাকা দেওয়া তেমনই পড়ে থাকতে দেখে অনুযোগ শুনতে হয় সকালবেলা— কি দিদিমণি, আপনি...

টুকটাক মিথ্যে বলে এড়িয়ে যেতে হয় তখন। অবশ্য এরা খুব ভালো, এই যারা আমায় থাকতে দিয়েছে, মফস্বলের ব্যাঙ্কে চাকরি পাবার পর পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে চাই— একলা অবিবাহিতা যুবতী, যদিও খুবই রোগা আর ময়লা রঙ—, সামান্য লম্বা, তবু কেউ রাজী হয়নি। মফস্বল তো... এখানে সাহায্যের চেয়ে সমালোচনার চল বেশী। তা এরা বেশ ভালো- পাঁচিল ঘেরা দোতলা পাকা বাড়ি, সম্পন্ন চাষী, দু-তিনজন চাকরিও করে, স্কুলে কিংবা কলকাতায়। বাড়ির ভেতর অনেক গাছ, এপাশে পায়ে চলা মাটির রাস্তা, পেছন দিকে পুকুর যা ডোবা বলার মত তত ছোট নয়, উঠোনে টিউবওয়েলও আছে, জল তুলে নিয়ে স্নান করার মত মেয়েদের কলঘর। বেশ ভালোই লাগে আমার বাড়িটা। তবে মফঃস্বল তো... বিনা ধান্দায় কেউ কিছু সহজে করে না। প্রথমে বাড়ির বেকার ছেলেকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার অনুরোধ পরে লোন বের করে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি— অবশ্য সে সব আমি পেরিয়ে এসেছি বেশ সহজেই। আর শারীরিকভাবে আক্রান্ত হবার মতো শরীরই আমার নেই। নিশ্চিন্ত।

মা মারা যাবার পর আমাদের বাড়িটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। বাবা বাড়ি ফিরেই ক্লাবে চলে যান তাস খেলতে, ফেরেন অনেক রাত্রে। দাদারা যে যার মতো দিন কাটায়। রান্নাঘরের দায়িত্ব বড়দির হাতে। ইংরেজিতে এম-এ পাশ কিন্তু কর্পোরেশনের টাইপিস্টের চেয়ে ভালো কোনো চাকরি তার কপালে জোটে নি। চাকরি সামলে, সংসার সামলে, তারও অবশ্য বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি আর, সে যদিও আমার মত ক্ষীণস্বাস্থ্য ছিল না ততটা। দাদারা আস্তে আস্তে টুক টুক করে চাকরি পেতে লাগল, বিয়ে করে ফেলতে লাগল টপাটপ। বড়দির কারণে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেল সংসারটা— এখনও তাই যাচ্ছে- তবে বাচ্চাকাচ্চায় ভরে গেল ঘরবাড়ি। তাদের দায়িত্ব অনেকটাই বড়দির। বৌদিরা সব এক একখানি সাজুগুজু ডল পুতুল। আমার বাড়ির কথা বসে বসে ভাবতে আমার একদম ভালো লাগে না। অন্য সাধারণ আর পাঁচটা যৌথ পরিবার যেমন হয় তারাও তেমনই, অনেকগুলো লোক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এক সঙ্গে থেকেও সবাই আসলে মনে মনে আলাদা থাকে, থাকতে চায়।

শুধু মেজ বৌদির ভাই অবিনাশ যদি...।

তখনও অবশ্য চাকরিটা পাইনি। গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেকার বসে আছি। বাড়িতে থাকলে মেয়েদের সময় যে কিভাবে কেটে যায়, মেয়েরা নিজেরাও তা জানতে পারে না। তবু এই সময়টা মাঝে মাঝে মনে হত, খুব বিশেষ কেউ যদি আমার মনের খবর নিতে চাইত, বেশ হত, খুব খারাপ হত না ব্যাপারটা— আর তখনই অবিনাশ আস্তে আস্তে কখন যেন চলে এসেছিল আমার মনের খুব কাছাকাছি। মেজ বৌদির হাসিঠাট্টা ইয়ার্কিও এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। শুধু অবিনাশ যদি একটু মর্যাদা দিত আমাব বিশ্বাসের— যদি অনেক যৌতুক নিয়ে একটু মোটাসোটা একটা গাবলু-গুবলু মেয়েকে বিয়ে করে না ফেলতো। অবিনাশ, তোমার অলকা...।

না। অলকানন্দা মুখোপাধ্যায়, সংক্ষেপে মিস অলকা মুখার্জি, তার একদা ও একমাত্র প্রেমিক অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের কথা আর ভাববে না। শেষ দিকে হাতও পেতেছিল অবিনাশ; নতুন বাড়ি শেষ করা যাচ্ছে না—হাজার কুড়ি টাকা যদি কোন রকমে-। মায়ের দেওয়া কিছু গহনা ছিল অলকার কাছে, নিঃশর্তে এক কথায় অলকা....।

অবশ্য একজন মানুষকে দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের বিচার করা যে ঠিক নয়, স্বাভাবিক নয়, আমি তা জানি। বাগানের দিকের বারান্দায় চেয়ারে বসে ভাবছিল অলকা, রোজ যেমন ভাবে। সারা দিনটা অফিসে বেশ সহজভাবে কেটে যায়। ছোট ব্যাঙ্ক। কাজের চাপ বলতে তেমন কিছু নেই। অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা কাজ মিটে গেলে এক ধারে বসে আদিরসাত্মক আলোচনা করে রোজ। অলকা খেয়াল করেছে, এটাও একটা মফস্বলী চরিত্র, কারণে অকারণে যখন তখন আদিম রসের আলোচনা করা, অহেতুক, অনবরত। সে সব আলোচনার দু-একটা টুকরো যে

ছিটকে কানে আসে না তা নয়। লজ্জা পাবার বদলে কেমন একটা অস্বস্তিতে গা শিরশির করে ওঠে। জানলা দিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়া কোনো বোলতার মত, অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা ভাবনা মনের মধ্যে গুনগুন করে, অবিনাশও কি, আসলে—।

শ্বশুরের পয়সায় লরী বার করেছে অবিনাশ। তার মোটা বেঁটে বৌ অনেক গয়না গায়ে দিয়ে সিনেমা দেখতে যায়, অবিনাশকে নিয়ে নাইট শোয়ে। তখন অলকা মুখার্জি হয়তো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবে-আজ আর রাত্তিরে কিছু খাবে না।

বারান্দায় বসে যে গাছগুলো দেখা যায়, অলকা তাদের নাম রেখেছে নানা রকম। একটা বুড়ো বটগাছের যেমন নাম রেখেছে, বাবা, তেমনি বড়দা মেজদা ইত্যাদি, বাড়ির কাজের লোক রামুদার নামেও নাম দিয়েছে একটা গাছের, বেশ বড় সড়, চমৎকার একটা কোটর আছে গাছটার মধ্যে। একটা জবা গাছের নাম দিয়েছে বড়দি। এ-রকম বড় বৌদি মেজ বৌদি। আর কোণের দিকের একটা বাবলা গাছের নাম দিয়েছে অবিনাশ, যার ভেতর দিয়ে রোজ সূর্যাস্ত দেখে অলকা।

সবুজ যে কত বিচিত্র রকমের হয়, তা এই মফস্বলে এই প্রায়-নির্বাসিত জীবন না কাটালে জানতেই পারতো না। ভোর বেলাকার গাছের পাতার সবুজের চেহারা এক রকম, বেলা গড়িয়ে এলে সেই একই গাছের একই সবুজ সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যায়। আবার বিকেল বেলায় তাকেই নানা রকম লাগে। আবার একটা সময়ে এক একটা গাছের সবুজের রূপ এক একরকম। কোনোটা ঘন গাঢ়, কোনোটা হাল্কা মায়াবী, কোনোটা পাঁচ মিশেলি ধরনের। অথচ সবাই তারা সবুজ।

জীবনের একত্রিশটা বসন্ত পেরিয়ে এসে, আজ অলকা জানে, মানুষও আসলে ওই রকম, সবুজেরই মত, বাইরে থেকে এক রকম লাগলেও আসলে অনেক আলাদা, একই মানুষ সারা জীবন এত রকম রঙ বদলাতে পারে। অবশ্য পুরুষ মাত্রেই যে অবিনাশ হবে তার কোনা মানে নেই, অলকা তাও জানে। এই যেমন মানিকেশ্বর, সংক্ষেপে মানকেশ্বর— ব্রাঞ্চের লোকেদের কাছে 'মান্‌কে', গ্রেড ফোর স্টাফ, যে যা বলে মেনে নেয়, কারও কোনো কথাতেই প্রতিবাদ করে না, আর সব সময় আকর্ণবিস্তৃতভাবে হাসে, সে হাসি দেখলে পরিস্কার বোঝা যায়, এই মানুষের মনে কোনো মলিনতা নেই। এক গাল হেসে সামনে এসে দাঁড়ায়, ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। টাকার টানাটানি থাকলে বলে, ল্যাভেন্ডিস ইন কেলেজিরে। শরীর টরীর খারাপ থাকলে বলে— লাফিং স্টক ভেনেজুয়েলা। কোথা থেকে যে কথাগুলো খুঁজে পায় কে জানে। একদিন তো অশৌচের পোশাকে একই রকম হাসতে আসতে এসে বলল, গনফত লটারী ফার্স্ট প্রাইজ মাই মাদার। মা মারা গেছে।

ম্যানেজার সঞ্জয় শিকদার কিন্তু কিছুতেই ওইভাবে হাসতে পারবে না। এইভাবে কেন, মনে হয় লোকটা কোনোভাবেই হাসতে পারে না। সব সময় জটিল হিসেবের

মধ্যে ঢুকে থাকতে থাকতে মুখটাই কেমন কোঁচকানো হয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয় নাক মুখ কুঁচকে কি এক গভীর দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত—কেউ কি ঠকিয়ে নিচ্ছে কিছু। একবার অলকাকে বিবাহ প্রস্তাব পর্যন্ত। ভাবা যায়। শুধু টাকার জন্য।

তার চেয়ে বারান্দায় বসে গাছেদের দিকে এই চেয়ে থাকা অনেক ভালো। ওই বাবলা গাছটা, অলকা যার নাম রেখেছে 'অবিনাশ', ওটা রোজ একই রকম থাকে, বাড়েও না, কমেও না। আকাশমনি গাছটার পাশে একটা স্থলপদ্ম গাছ আছে, বৃষ্টির পরও অনেকক্ষণ ধরে তার পাতাগুলো দিয়ে টুপ টুপ করে জল ঝরে, মনে হয় যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে।

ডাক্তারখানা যাওয়া ছাড়া আর একটা কাজই তো তোমার, ভালো লাগে, সেটা হল ঘুমনো। এখনও তুমি জেগে আছো কেন অলকা, ঘুমোও। এই ভুল মানুষের পৃথিবীতে খুব বেশীক্ষণ জেগে থাকতে নেই।

বাঘের ঘরে

'বাঁচতে ইচ্ছে করে?'

খাটের বাজু ধরে কেমন যেন বেঁকে দাঁড়ালো যূথিকা, যেভাবে মেয়েরাই দাঁড়াতে পারে এঁকেবেঁকে। আঁচল যেভাবে এলায়িত হলো, শাড়ির পাড় বুকের ওপর দিয়ে যেমনভাবে নেমে গেল নিচের দিকে— কোমরের একটা দিক বেশ স্পষ্ট হলো তাতে। যূথিকার কোমর কালো। তাতে ভাঁজ পড়া চর্বির চকচকে মাংসল আকর্ষণ নেই। সাধারণ ঘরকন্নার একটা পেলব চেনা চেনা ঢল আছে মাত্র।

অরবিন্দ মুগ্ধ হয়ে দেখলো কিছুক্ষণ।

কোনো কোনো মানুষের যাবতীয় প্রাণশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে চোখে। যূথিকার চোখ সেরকম। নেমে যেতে যেতে নাতিদীর্ঘ মাঝারি কেশরাশি এক জায়গায় হঠাৎ যেন থেমে গেছে। কথা বলতে বলতে চোখের পাশ দিয়ে দু-এক গুচ্ছ নেমে এলে ভারি ভালো লাগে। কালো গোল ধরনের মুখে বিরাট সিঁদুরের টিপটা মন কাড়ে সবচেয়ে বেশি। বেশি ফাঁক না হওয়া সিঁথিতে সরু লম্বা করে সিঁদুরের টান দেওয়াটাও মিষ্টি লাগে। অথচ যূথিকা নাকি ক্রিশ্চান। স্বামী পরিত্যক্তা। তিনি বিয়েও করেছেন আর একটা। মানে, যিনি যূথিকার স্বামী ছিলেন একদা।

রাস্তার ধারে, একতলা বাড়ি। উঠোনের পেয়ারাগাছটা ঘর থেকেই সবটা দেখা যাচ্ছে। কাঁঠালগাছের গোড়ায় তিনটে সাইকেল। দাদার মক্কেল এসেছে। বৌদি রান্না করতে করতে উঠে এসে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

'এদের জন্যে করে'। উঠে দাঁড়ালো অরবিন্দ।

যূথিকা দাদার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে অরবিন্দর খুব কাছে এসে দাঁড়ালো।

অরবিন্দ দেখলো— যূথিকার কানের পাশ দিয়ে দেয়াল আলমারির কাচের পাল্লা। সেখানে অনেকগুলো উত্তমকুমারের পিকচার পোস্টকার্ড। দাদা ভালোবাসে।

'আজ চলি, অনেকক্ষণ এসেছি।'

যূথিকার চোখের পাতাগুলো খুব বড় বড়, কেমন যেন মঙ্গলময়। সিঁদুরের টিপটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঘুম পায়।

বাঁকার টিভির দোকানের সামনে দাঁড়ালো অরবিন্দ। রাস্তার উল্টোদিকের নিচু দেয়ালে সাইকেল রেখে চাবি দিলো। চিত্রহার হচ্ছে বলে দোকানে বেশ ভিড়।

কাউণ্টারে বসে টাকা গুনছিল বাঁকা। সুদে টাকা খাটায়। চেহারাটা কিন্তু বেশ টান টান, পরিষ্কার। নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি। হাল্কা করে ছাঁটা গোঁফ। কথা বলার

সময় চোখগুলো চকচক করে। অন্য সময় কেমন যেন ঝিমোয়।

অরবিন্দ কাউন্টারে দু'হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললো, 'সিগারেট দিন। অনেক নোট গুনছেন তখন থেকে।'

নোটগুলো গুছিয়ে থাক থাক কবে গার্টার দিয়ে আটকে ড্রয়ারে রেখে চোখ তুলে তাকালো বাঁকা। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি বয়স নয়। প্রায় আমারই বয়সি আসলে। অরবিন্দ ভাবলো।

'হ্যাঁ দাদা, কী বলছেন বলুন। সিগারেট খাবেন ? টিভি কেমন চলছে ?' আবার ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো বাঁকা। গোঁফের আড়ালে এক ধরনের ক্লান্ত অথচ চতুর হাসি। 'চা খান।'

'না।' সিগারেট নিতে নিতে অরবিন্দ বললো, 'এই খেয়ে এলাম।' যূথিকার কাছে— কথাটা ঠোঁটে এসে গেছিলো প্রায়। 'আপনার মেকানিক কোথায় ?'

'কেন, আবার খারাপ হয়েছে নাকি !'

'ওই যে, ট্রানজিস্টর না কি বলে— আবার কেটেছে মনে হয়। সাউন্ড আসছে না।'

'বলছি স্টেবিলাইজার লাগিয়ে নিন। পাওয়ার যা ফ্লাকচুয়েট করে তাতে—'

'দুমাসের মধ্যে তিনবার ট্রানজিস্টার কাটলো। কী একটা উল্টোপাল্টা মাল দিলেন। ভিপট্রন বলে কোনো টিভির কোনোদিন নাম শুনিনি।'

'বললাম না, সব টিভিরই স্পেয়ারপার্টস বাইরে থেকে আসে। শুধু লেবেলের তফাৎ।' খট করে চালু টিভিটা বন্ধ করে দিলো বাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন তুলে দোকানের ভেতরের ভিড়টা হালকা হয়ে এলো। 'ক্যাসেট পর্যন্ত চালাবার উপায় নেই। ভিড় লাগিয়ে দেবে দোকানে।'

'মেকানিক কবে পাঠাবেন ?' অরবিন্দ দৃঢ় হবার চেষ্টা করে।

'দেখি। একটু চাপ আছে। দু'একদিন দেরি হবে। আপনি স্টেবিলাইজারটা লাগিয়ে নিন। কোনো কমপ্লেন হবে না।'

'সে তো অন্তত আড়াইশো টাকার ধাক্কা।'

'মিনিমাম। আমাদের কাছ থেকেও নিতে পারেন। অটোমেটিক হলে একটু বেশি পড়বে।'

'না না। কলকাতা তো রোজই যাচ্ছি। কিনে নেবো।'

'চিন্তার কিছু নেই। ম্যানুয়ালই নেবেন। ওতেই আপনার কাজ চলে যাবে। সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের মাল ভালো। অন্য অনেক কোম্পানিও আছে।'

'মেকানিক করে পাঠাবেন ? একটু তাড়াতাড়ি হলে ভালো হয়।'

'ঠিক আছে। দেখছি চেষ্টা করে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'নতুন টিভি খারাপ হয়ে পড়ে থাকলে কি মেজাজ ঠিক থাকে ? আচ্ছা, ঠিক আছে, চলি। আপনি একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করবেন বাঁকাদা।'

'আপনি ভাববেন না। তবে যা বললাম, স্টেবিলাইজারটা কিনে নিন।'

চাবি খুলে সাইকেলটা টেনে নিলো অরবিন্দ। আরও একটা কাজ বাকি। গ্যাস লাইটারটায় গ্যাস ভরতে হবে। মিস্তিরিটা আবার সপ্তায় একদিন আসে। আজ না ভরে নিলে আবার সাতদিন পড়ে থাকবে। কলকাতায় কিছুতেই সময় হয় না।

জামা খুলতে খুলতে শুক্লাকে বললো অরবিন্দ— 'স্টেবিলাইজার লাগাতে বলছে।'

খাতা দেখছিল শুক্লা টেবিলে বসে। ঘ্যাচ করে একটা পুরো পাতা কেটে দিয়ে বললো, 'তখনই বলেছিলাম সোনোডাইন কেনো। কলকাতা থেকে দুজনে গিয়ে নিয়ে আসতাম। তোমার খালি রূপালি রেডিও....'

প্যাণ্ট ছেড়ে লুঙ্গি গলাতে গলাতে অরবিন্দ বললো, —'কতবার বলবো, এই যে যখন তখন হাতের কাছে মেকানিক পাচ্ছি, কলকাতা থেকে কিনলে কি আর সেটা পেতাম?'

'খারাপই হতো না। গ্যারাণ্টি থাকে—'

'গ্যারাণ্টি তো বাঁকাও দিয়েছে। তাছাড়া টিভির পার্টস ইণ্ডিয়ায় এখনও তৈরিই হয় না। সব বাইরে থেকে আসে। শুধু বাইরের খোলটার তফাৎ।'

'ওসব তোমার বাঁকার শেখানো কথা। আমার পাল্লায় পড়লে টিট হয়ে যেতো।'

এবার কথা বাড়ালেই আস্তে আস্তে গরম হবে শুক্লা। অসুবিধে হলেই শুক্লা 'তখনই বলেছিলাম' দিয়ে শুরু করে। শুক্লার আর একটা প্রিয় কথা হচ্ছে— 'আমার পাল্লায় পড়লে....।' এইটুকুতেই যথেষ্ট অপামনিত বোধ করে অরবিন্দ। আগে করতো না। আজকাল করে। আগে বুঝতেই পারতো না শুক্লার উদ্দেশ্য কী, শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ছ'বছর বিয়ের পরে এখন অরবিন্দ জানে 'আমার পাল্লায় পড়লে'.... কথাগুলোর একটাই স্পষ্ট মানে হয়, যেটা হলো— অরবিন্দ কোনো কম্মের নয়। অরবিন্দকে দিয়ে কোনো কাজের কাজ হয় না। অরবিন্দকে যে কাজের ভার দেওয়া হবে অরবিন্দ তাতেই একটা না একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে আসবে ঠিক, আর শেষকালে শুক্লাকে যেতে হবে সে জট ছাড়াতে। সার কথা, শুক্লাকে বাদ দিলে অরবিন্দর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। শুক্লা পাশে না থাকলে প্রতি পদে পদে ঠকে যেতো অরবিন্দ। সারা পৃথিবী অরবিন্দর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে হিহি হিহি করে হাসতো।

সেসব কথা শুক্লা না থাকলে কি হতো তা নিয়ে। শুক্লা থাকাতে অরবিন্দর জীবন যে খুব একটা কম দুর্বিষহ হয়নি, অরবিন্দ সে কথা মাঝে মাঝে গুন গুন করে বলতে চায়। শুক্লার বক্তৃতার ভয়ে, আসলে বিরক্তিতে, সেসব খারাপ কথা প্রায়ই চেপে যায় অরবিন্দ। যেমন এখন গেল। অরবিন্দকে উত্তর দিতে না দেখে শুক্লাও খাতা দেখায় মন দিলো। 'মেয়েগুলো যে কী লেখে ছাইপাঁশ.....' স্বগতোক্তি করলো একবার।

টিভিটা খারাপ। সন্ধেবেলা যে খুলে বসে থাকবে তার উপায় নেই। এখন যতদিন না মেকানিক আসে ততদিন খবরের কাগজ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শুক্লার এসব সমস্যা কোনোদিনই নেই। সবসময় তার কত কাজ। বস্তুত, শুক্লার ভাষণের ভয় না থাকলে, বাঁকার দোকান থেকেই স্টেবিলাইজারটা কিনে নিতো অরবিন্দ। কী আর এমন তফাৎ হতো তাতে? পাঁচ দশ টাকা বেশি নিতো এই যা। চাঁদনীতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কেনার পরিশ্রমটা তো বাঁচতো। বলতে গেলেই খ্যাঁক করে উঠবে শুক্লা— 'এইসব মফস্বলের দোকানগুলোকে একদম বিশ্বাস নেই। কী বলতে কী গছিয়ে দেবে। তুমি না পারো আমি গিয়ে নিয়ে আসবো যাও। আমার অফিসটা যদি কলকাতায় হতো তাহলে এত কথা উঠতোই না!'

সাত পাঁচ ভেবে অরবিন্দ পিঠের নিচে দুটো বালিশ দিয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে শুয়ে পড়ে। বাঁকার দোকান থেকে টিভি কেনার জন্যে অলরেডি শুক্লার কাছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। মেকানিকের দোহাই দিয়ে সে তোড় অনেকটা সামলেছে অরবিন্দ। সেটটা দেখতেও চমৎকার। লাল, ছোট্ট, পরিষ্কার ছবি আসে। কোয়ার্টারের অন্য লোকজন এসে যখন সেটটা দেখে নানারকম প্রশংসা করে গেল— 'ডাইনিং টেবিলটার সঙ্গে টিভির রঙটা কি সুন্দর মিলে গেছে দেখো, ওমা— কি মিষ্টি লাগছে গো'— ইত্যাদি, তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছিল শুক্লা। অথচ ওই একই কথা অরবিন্দ বলাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। 'বোকা কোথাকার, রঙ দিয়ে কি কোয়ালিটির বিচার হয়! বাইরে থেকে যতই ফুটফুটে দেখাক, ভেতরে কী গোঁজামিল আছে কে জানে!' বলতে বলতে টিভিটা রোজ আলাদা করে রাখা একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছতো শুক্লা, যেন স্নান করিয়ে নিজের ছেলের গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

আর প্রত্যেকবারই অরবিন্দর অপদার্থতা বিষয়ে সূক্ষ্ম ঠেস দিতে ছাড়তো না। 'তোমাকে নিতে বললো, আর তুমিও নিতে রাজি হয়ে গেলে! কেন, বলেছিল না— সোনোডাইন আনিয়ে দেবে?'

'সে তো ডেট ফেল করলো বার বার।'

'করলো তো করলো। ইচ্ছে করে নিজেদের পচা মাল চালাবার জন্যে এসব করছে তুমি বুঝতেও পারলে না!'

'না বোঝার কী আছে! এখন যে এনে দেবে সে যদি ইচ্ছে করে ঘোরায়...'

'তোমার মতো লোক পেয়েই ওরকম করেছে। আমার পাল্লায় পড়লে....'

খবরের কাগজে যদিও এসব কথা লেখা নেই, তবু শুয়ে শুয়ে কাগজের পাতায় চোখ রেখে অরবিন্দ এসব কথাই ভাবছিল। সকালবেলায় পড়া খবরের কাগজে নতুন করে পড়ার কিছু নেই। উপন্যাস পড়ার রুচি অনেকদিন হলো চলে গেছে। মাঝে মাঝে পড়া হয়ে যাওয়া কাগজ থেকেই অনেক নতুন নতুন খবর পাওয়া যায়, সকালের তাড়াহুড়োয় যা তেমন চোখে পড়েনি। আজ সেসব কিছুই চোখে পড়ছিল না। চোখ দুটো কাগজের ওপর মেলে ধরা ছিল এই পর্যন্ত। মাথায় ঘুরছিল, বাঁকার কাছ থেকে টিভি কিনে সে ঠকে গেছে। কলকাতা থেকে ভালো একটা স্টেবিলাইজার কিনে সে প্রমাণ করে দেবে— অরবিন্দ অপদার্থ নয়।

'এতগুলো খাতা কখন যে দেখি। ভাতটাও তো বসালে পারো।'

ঠিক এইটাই ভাবছিল অরবিন্দ। কাগজ পড়তে ভালোও লাগছিল না। উঠে গিয়ে গ্যাস জ্বেলে চাল ধুয়ে ভাতটা বসিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয়। একটু একটু ইচ্ছেও করছিল। শুক্লা যখন খাতা দেখতে দেখতে 'কী করছো' বলবে— তখন রান্না ঘর থেকে মেজাজ করে উত্তর দিলেই হলো, 'ভাত বসাচ্ছি।' অথচ এখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। শুক্লার মুখে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দর সারা শরীরে যেন গড়ে উঠলো অকারণ প্রতিরোধ। নিজেই তো করতে যাচ্ছিলাম। আবার বলতে হবে কেন!

'কুকারে কতক্ষণই বা লাগবে।'

'সে তো আমিও জানি। তবু, অনেক উপকার হতো। তরকারি কুটতে হবে আমাকে, সময় লাগবে।'

'সেটাই আগে করা দরকার। আগে ভাত চাপালে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'খাবার সময় গরম করে নিলেই হবে। ভাত ঠাণ্ডা হলেই বা ক্ষতি কি, ডাল তো গরম থাকবে।'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'সে কথা পরিষ্কার করে বললেই পারতে। অত ভ্যানতাড়ার কী দরকার!

ফলত, রাত দশটা অবদি খাতা দেখলো শুক্লা।

'আমার খিদে পাচ্ছে।' একসময় না বলে পারলো না অরবিন্দ।

'খাবার নিয়ে এসে খেয়ে নাও।' নির্বিকার উত্তর দিলো শুক্লা।

'সে কথা পরিষ্কার করে আগে বললেই পারতে।' হুবহু শুক্লাকে নকল করলো অরবিন্দ। কোনো উত্তর নেই।

পাজামার উপর পাঞ্জাবি চাপিয়ে সাইকেল বের করলো অরবিন্দ। বাজারের ব্যাগে টিফিন বাক্সটা নিয়ে নিয়েছে। বেরোবার সময় শুক্লাকে বলতে শুনলো— 'ডিম তড়কা আনবে না।'

শুক্লা জানে না, গোবিন্দর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বড় বিচ্ছিরি লাগে এই রাত্তিরে। মাঝে মাঝে গোবিন্দ আবার পীরিত দেখায়— বৌদি বাড়ি নেই বুঝি!

বিশাল উনুনের গনগনে আঁচের দিকে তখন মুখ নিচু করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অরবিন্দ। হোটেলের উনুনের আঁচের আভায় বেশ অবসন্ন অথচ কেমন যেন ক্রুদ্ধ দেখায় কি তাকে!

রাত সাড়ে দশটায় মফস্বলের রাস্তাঘাট নির্জন, একদম নেতিয়ে পড়েছে। একটু আগে একটা ট্রেন এসে দাঁড়ালো বীরপুরে। রাস্তায় তারই অল্প কয়েকজন প্যাসেঞ্জার। কেউ সাইকেল নিয়ে হুহু করে চলে গেল। কেউ সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে হাঁটছে কথা বলতে বলতে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে ন'টার মধ্যেই। শুধু কান্ট্রি লিকার শপে শক্তি শা বোতল থেকে মাল ঢেলে যাচ্ছে মেপে মেপে। রাস্তার দিকের জানলার বাইরে দু'একজন খদ্দের লেগেই থাকবে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। রাত বেশি হলে তাদের হল্লা অনেকদূর থেকে শোনা যায়। বুক সমান উঁচু জানলার

বাইরে যারা দাঁড়িয়ে খায় তাদের মুখ দেখা যায় না, চেনা যায় না। সাইকেলে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে যেতে জানলা দিয়ে সারি সারি বোতল দেখা যায় শুধু। অরবিন্দ জায়গাটা মাথা নিচু করে পেরিয়ে যায় রোজ। তড়কার বদলে মাংস রুটি নিয়ে আজ শক্তিদার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো খানিকটা অবধারিতভাবে— বাড়িতে বৌ ফৌ না থাকলে, আহ্.....।

অথচ এই বীরপুরে বৌয়ের জন্যেই থাকা। সারদাচরণ বি এড কলেজের ভূগোলের দিদিমণি শুক্লা বিশ্বাসের স্বামী অরবিন্দ বিশ্বাসকে লোকে বলে— শুক্লাদির বর। পাঁচিল-ঘেরা স্টাফ কোয়ার্টারের চত্বরে অনেক গাছ। সাদা রঙের অ্যাসফল্টের বাহারি রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে গাছপালার ছায়ায় সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরলো অরবিন্দ। বাড়ি মানে যেখানে সে নিজের স্ত্রীর ওপর মেজাজ দেখাতে পারবে না। বাড়ি, মানে যেখানে সে তার স্ত্রীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি, মানে যেখানে থাকার জন্যে তার বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত বিনিয়োগ নেই। বাড়ি, মানে যেখানে শুক্লাকে চাকরির কারণে থাকতে দিয়েছে তার কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ক্যাম্পাসের ভেতরটা ভারি সাজানো গোছানো। এমন চমৎকার সব গাছ। অনেকগুলো মালি আছে মেনটেনান্সের জন্যে। ইংরেজির দিদিমণি মিস আভেরী দত্ত যাচ্ছেন। সম্ভবত এই ট্রেনে ফিরলেন। হাতে দু'তিনটে প্যাকেট।

অরবিন্দ স্পিড বাড়িয়ে দিলো অযথা।

অন্ধকারে আলমারির পাল্লায় বসানো লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো অরবিন্দ। দেশলাইয়ের আলোয় নিজের মুখের যেটুকু দেখা গেল তাতে কিছুটা বিক্ষিপ্ত লাগলেও বেশ আত্মবিশ্বাসী লাগলো নিজেকে। বেশ রাত হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারাদিনের ক্লান্তিতে শুক্লা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে শুক্লার তীব্র নাক ডাকে।

সন্তর্পণে ড্রয়ার টেনে কোয়ার্টারের কোলাপসিবল গেটের চাবিটা বের করলো অরবিন্দ। ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখলো, হাওয়ায় অল্প হিম। বাইরের গাছপালার পাতায় ফিকে একটা জ্যোৎস্না।

গেট খুলে বাইরে এলো অরবিন্দ। কোলাপসিবল গেটটা টানতেই বিচ্ছিরি শব্দ হলো একটা। আবার টেনে বন্ধ করে বাইরে থেকে হাত গলিয়ে কায়দা করে তালাটা লাগালো। খুলে রাখলে পরে এই নিয়ে কথা হবে। অবশ্য যদি কোনো বিপদ আপদ হয় তবেই। না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু অকারণ ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কি ?

ঘুম না এলে অরবিন্দর এই রাতবিরেতে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেসটা ছোটবেলার। অনেকবার অনেকরকম ঝামেলা গণ্ডগোল হয়েছে এই নিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দুশ্চিন্তা করার বদলে শুক্লা সাংঘাতিক রেগে যাবে।

মেয়েরা যে কেন এত আত্মকেন্দ্রিক হয়! স্বামীর সঙ্গে ঠিক কী ধরনের গোলমাল হয়েছিল যূথিকা তা কোনোদিনই বলে না। যেটুকু বোঝা যায় তাতে অরবিন্দর ধারণা, স্বামীর বিশেষ কোনো ব্যাপার যূথিকা একেবারেই পছন্দ করতে পারেনি। মারধোর

করতো কী ? কে জানে ! বিডিও অফিসে চাকরি করার গর্বে বাপের বাড়িতে থাকাই পছন্দ করেছে যূথিকা। আত্মনির্ভর স্বাধীন জীবন— বলে থাকে যখন তখন। 'যে কোনো ভাঙাচোরা জিনিসই বেশ সুন্দর'— একদিন মনের আবেগে বলে যাচ্ছিল অরবিন্দ— 'ভাঙা মন্দির, ভাঙাচোরা মূর্তি, ভাঙা পুরনো কোনো বাড়ি'....। হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে যূথিকা ঘাড় কাত করে প্রশ্ন করেছিল— 'আর ভাঙা মন ?' খোঁপাটা হঠাৎ খুলে গিয়ে চুলের ঢল নেমেছিল পিঠে হঠাৎ, তখন। অরবিন্দ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে মুহূর্তে যূথিকার চোখে ক্রোধের আগুন, অভিমানের বাষ্প আর পুরুষজাতের ওপর অদ্ভুত ঘৃণা লক্ষ্য করেছিল অরবিন্দ। রাত সোয়া একটা। কী করছে এখন যূথিকা ? ঘুমোচ্ছে না নিশ্চয়ই। অনেক রাত অবদি বই পড়ার রোগ আছে যূথিকার।

বীরপুর বি এড কলেজের সীমানার বাইরে এসে অরবিন্দ পেছন ফিরে দেখলো। এই আপাতনিস্তব্ধ প্রমীলারাজ্যে ভালো থাকতে গেলে অধোবদন সারমেয়র মতো জীবনযাপন করতে হবে। কতদিন মাকে দেখিনি। শুক্লার সঙ্গে বিয়ের মাস তিনেক পর থেকেই ওদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। সেই প্রাচীন সমাধানহীন সমস্যা। দূরে চলে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ভাইবোনেরা কে কোথায় ছড়িয়ে গেছে।...

বীরপুর স্টেশন রোড জনপ্রাণীহীন।

একটু এগোতেই সেই কাণ্ট্রি লিকার শপ। এখনও খোলা। জানলার বাইরে একটা দুটো লোক দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। অরবিন্দ গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে অরবিন্দ যূথিকাদের বাড়ির সামনে যূথিকার ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরালো। মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে তরল আগুন। বেশ নিচু স্বরে কয়েকবার ডাকলো অরবিন্দ— যূথিকা, যূথিকা....। হাওয়ার হিমে হারিয়ে গেল উচ্চারিত শব্দের ভার। কেউ শুনতে পেল না। অরবিন্দ এরকমই চাইছিল। শুনতে পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই জানলা খুলতো যূথিকা। কী বলতো তখন অরবিন্দ ? স্ত্রীর বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে অরবিন্দ যূথিকার প্রেম পাবে বলে ! এত রাতেও খিলখিল করে হেসে উঠতো যূথিকা।

ফিরে এসে কোয়ার্টারের কোল্যাপসিব্‌ল্ গেটের তালাটা বাইরে থেকে হাত গলিয়ে যখন খুলছিল অরবিন্দ, তার সারা শরীরে তখন হিংস্র চতুর অথচ শান্ত ও ক্ষিপ্র এক আক্রমণ-উদ্যত টান টান বাঘের চলাফেরা। ঝাঁপ দেবার আগে যে শিকারের অন্যমনস্কতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে যেতে জানে।

গ্রহান্তরের মানুষ

সেই গল্পটা বলো, সেই গ্রামের লেখকের গল্পটা— পরিমল উস্কে দেয় পলিকে। ওফ্, সে যা একখানা জিনিস পেয়েছিলাম না আমরা! পলি যেন প্রাণ ফিরে পায়। সাতসকালে এসে গ্যাঁট হয়ে বসতো। অনেক বেলা অব্দি বসে থাকতো আর এন্তার হাবিজাবি বক বক করতো! কিছুতেই ওঠবার নাম করে না! একদিন ও বলল— আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, অফিসে বেরোতে হবে। শুনে বলে কি, আপনি যান না— আমি দিদিকেই নাহয় শোনাই এই গল্পটা, তারপর যাবো'খন....

মুখটাকে হাসি হাসি করে তুলতেই হল শুক্লাকে। রোজ তোমাকে গল্প শোনাতো?

পলি বললো, প্রায়ই! ওকে একদিন একটা লেখা দেবার জন্যে কী পীড়াপীড়ি। ও বলে দিল— আমি তো লিখি ফিকি না! আপনি বরং অমুকের কাছে যান, তমুকের কাছে যান! এই অমুক তমুকেরা কারা জানো? লোকাল সব পলিটিকাল লিডার! নিজেই এত হাসতে লাগল পলি, বিজয়কে বলতেই হল— কেন, স্থানীয় নেতাদের চিনতেন না সেই লেখক?

পরিমল দ্রুত বলে উঠল— সেই জন্যেই তো। বললাম, ওনারা সবাই গোপনে প্রচুর লেখেন, আমি শুনেছি ওঁদের লেখা। আপনি গিয়ে ভালো করে একটু বলুন না, বললেই হবে! মাল তারপরও বলে কি, না না, আমাদের পাঁচদফা সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে... আপনাকে আমরা... মানে সর্বতোভাবে পেতে চাই! লেখা তো আপনি নিশ্চয়ই দিচ্ছেন!

দিয়েছিলেন? এই প্রশ্ন স্বরূপের, বিশাল লম্বা চওড়া চেহারা নিয়ে এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন এতক্ষণ। বিডিও সাহেবকে জিনিয়ার চারা দিতে এসে আড্ডায় আটকে পড়েছেন; জানলার ধারে বসে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে বাইরে রাখা বিস্কুট রঙের ল্যামব্রেটা স্কুটারটা দেখে নিচ্ছিলেন। এখানকার ইতিহাস হয়ে যাওয়া জমিদারের ভাইপো।

ধুর অত সময় কোথায়। মাঝে মাঝে খাবারই সময় পাই না! পরিমলের এই মন্তব্যে কি আত্মতৃপ্তির কোনো স্বাদ নেই? মনে হয় না। লেখালেখি তাহলে কি নিতান্তই অলস লোকেদের কাজ! স্বরূপ মল্লিকের মাঝে মাঝে ছড়া, গল্প লেখার অভ্যেস আছে। বিজয়ও তো লেখে। পলি আর পরিমল যেভাবে এই গ্রামের লেখককে নিয়ে পড়েছে, তাতে শুক্লার যে অল্পবিস্তর অস্বস্তি হচ্ছে না তা নয়।

তারপর একদিন কী হল জানেন? পলির গল্প এখনও শেষ হয়নি। রোজ রোজ

তো আর শোনা যায় না! আমি একদিন বললাম— আপনি বরং রেখে যান। আমরা সময়মতন পড়ে রাখব। তা, উনি না, তারপর থেকে তাড়া লেখা রেখে যেতেন। হঠাৎ একদিন দেখি, অনেক জমে গেছে। একদিন হল কী, খবরের কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে দেখি, পাঁচ কেজি করে পাল্লা, তা শেষ পাল্লাটা কিছুতেই আর পাঁচ কেজি হচ্ছে না— তারপর ওই ম্যানাসক্রিপ্টগুলো চাপিয়ে দিতেই— একদম ঠিক ঠিক পাঁচ কেজি- হি হি—

পোয়েটিক জাস্টিস না বলে, পরিমল সংযোজন করল— একে বোধহয় পোয়েটিক ব্যালান্স বলা ভালো!

ক্যামপাসের ভেতর ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল শুক্লা— কী অন্ধকার! বিজয়ের অভ্যস্ত চোখে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কোথায়? না তো। সবই তো দেখা যাচ্ছে। বলে এগিয়ে গিয়েছিল। টর্চ আনলে পারতে— বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে পেছন পেছন আসছিল শুক্লা।

গাছপালা ঘেরা জায়গাটা এমনিতে বেশ ভালোই লাগে। এখন অন্ধকার বলে বোঝা যাচ্ছে না। বিজয় বোঝাচ্ছিল। আলোকিত এলাকায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শুক্লা! বাব্বা। এই নাকি বিডিও অফিস! তোমার বন্ধু দিল্লিতে ছিল বলছিলে না? রাজধানী শহর ছেড়ে কেউ এই অজ পাড়াগাঁয় আসে?

ওকেই বোলো সে কথা।

দিল্লিতে থাকলে কত ভালো হত বলো তো! তুমি গিয়ে ওদের কাছে উঠতে পারতে!

শুক্লা দিল্লিতে বদলি হয়ে গেছে বছর দুয়েক হল। বিয়ের পর এতদূর চলে যাওয়ার কোনো মানে হয়? চাকরিটা ছেড়ে দেবো— একবার বলেও ছিল! তারপর—

কোয়ার্টারের দরজার মাথার ওপর কালো একটা ছোট্ট বোর্ডে শাদা অক্ষরে লেখা— পরিমল পাল, ডবলিউ বি সি এস (ইএক্স)। সেদিকে তাকিয়ে শুক্লা চিমটি কাটল বিজয়ের হাতে। কলিং বেলের ওপর হাত রেখে বিজয় বলল— আহ্, লাগে।

একটু আগে একটা দোকানে জেরক্সের ম্যানুয়াল মেশিন দেখে ফিক ফিক করে হেসেছে শুক্লা। ওমা! বিজয় বেশ রেগেই গিয়েছিল। বস্তুত, মাত্রাজ্ঞান তো থাকা উচিত একটা। দিল্লির দোকানে যেমন বিরাট অটোমেটিক জেরক্স মেশিন থাকে, সেসব কী আর এই মফস্বলে সম্ভব! তাতে অত হাসির কী আছে! দোকানদার ছেলেটি কিন্তু কিছু মনে করল না। কলকাতায় ওয়াটার্লু স্ট্রিটে আমাদের দুটো অটোমেটিক আছে— এখানে তো কাজ কম। বলল। অমায়িক ধরনের ছেলে। অবিবাহিত কি!

সেই গল্পটা বলি? পলি পরিমলের দিকে তাকালো। পরিমল না বোঝার ভঙ্গিতে ফিরে তাকাতেই পলি শুরু করল— আমি না, একবার খড়খড়ি তুলে— দেখি কি, বিচার করছে! সেসব ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত বিচার! একা একা ঘরের মধ্যে ভূতের

মতো বসে থাকি— সাহেবের তো খালি অফিস আর অফিস, কাজ আর কাজ। তা আমি না, মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলতাম— তা একদিন না, দেখি কি- ক্লাশ নিচ্ছে প্রায়, অগভীর—

আর থাকতে পারল না শুক্লা। অগভীর জলে মাছ চাষ ? এ গল্পটা জানি। বিজয় বলেছে।

—হ্যাঁ, এত কিছু যে ও কবে জানলো। পলি নিরুৎসাহিত হল না একটুও। যে মানুষটাকে এত বছর ধরে চিনি, সে যে এত কিছু কখন জানলো.... অগভীর জলে মাছ চাষ নিয়ে দিব্যি বলে গেল!

বিজয় দেখল, পরিমল শুক্লার দিকে তাকিয়ে লাজুক হবার চেষ্টা করছে।

শুক্লার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। এমনিতে, স্ত্রী দিল্লিতে চাকরি করে বলে অনেকেই বিজয়কে নানারকম আওয়াজ দিয়ে থাকে। তারাই আবার, শুক্লাকে দেখলে— এমন সদালাপী হয়ে ওঠে! পরিমল অবশ্য সে দলে পড়ে না।

স্বরূপ বলে উঠল— চাকরি করতে গেলে কত কী যে করতে হয়। পলি বলল— আমাদের তো অনেক জায়গায় থাকাই হয়ে গেল। দিল্লি, দার্জিলিং, বেলপাহাড়ি, তারপর এই অপূর্বপুর—

দার্জিলিঙে ছিলেন আপনি ? কোন সময়টা ? শুক্লার প্রশ্ন।

সব থেকে ঝামেলার সময়টাতেই। ওই যখন লাগাতার স্ট্রাইক হচ্ছিল—

বিজয় অন্য জিনিস দেখছিল। পরিমল কি ছিল আর কি হয়েছে। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার প্রথম দিন, হল থেকে বেরিয়ে কথা বলার মতন কাউকে না পেয়ে বিজয় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে— হঠাৎ পরিমলকে দেখে মনে হয়েছিল, এই তো, একেই তো খুঁজছিলাম; এই রোগারোগা, লম্বা ধরনের, সরু ফ্রেমের চশমা পরা ছেলেটা নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝবে! বুঝেওছিল। কথা শুরু হবার পরই অন্তরঙ্গতার গভীরে পৌঁছতে ভণিতার দরকার হয়নি কারও।

আগে আপনার অনেক দাড়ি ছিল না? বিজয়কে নিয়ে পড়ল পলি। প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়? ওহো, পরিমল অফিসের গল্প শুরু করেছে আবার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিজয়। খেয়াল করেনি। পরিমলের ঠোঁট নাড়া দেখতে দেখতে। অন্য দিনের, পুরনো দিনের পরিমলকে দেখছিল। এত মোটা ছিল না সেই পরিমল। এত কেজো ছিল না। এত স্বামী ছিল না। তখন কলকাতায় একটা মেসে থাকতো বিজয়। অনেক রাত অব্দি বিজয়ের মেসে বসে বসে আড্ডা না দিলে...। পলির বাড়িটা ছিল বিজয়ের মেসের কাছেই। পলির বাড়ি থেকে ফিরে রোজ একটু বিজয়ের কাছে....।

সেই পরিমলকে কি পাওয়া যাবে আর? বিজয়ের মনে হল না। নতুন কবিতা লিখে কী আগ্রহ নিয়ে শোনাতো পরিমল। স্বরূপ মল্লিকের কাছে যেদিন প্রথম কথাটা শুনল বিজয়— নতুন বিডিও আসছে অপূর্বপুরে— পরিমল পাল না কি যেন নাম— তখন বেশ উত্তেজিতই হয়েছিল বিজয়। কি, কি নাম বললেন?

স্বরূপ নামটা বলেছিল।

আপনি ঠিক জানেন ? বিজয় বলেছিল।

কেন বলুন তো! কথা হচ্ছিল বাজারে। হঠাৎ যেন পূর্ণ মনোযোগ দিল স্বরূপ বিজয়ের দিকে।

পরিমল এখানে বিডিও হয়ে আসছে। প্রায় আত্মগত ভঙ্গিতে স্বগতোক্তি করেছিল বিজয়।

আপনার চেনা লোক নাকি! স্বরূপের জিজ্ঞাসা খুব সরল ছিল না। গ্রামদেশে, বিডিও মানে প্রায় দেবতা। তার সঙ্গে চেনাজানা—

দ্রুত সামলে নিয়েছিল বিজয়। না, মানে, একসঙ্গে পড়তাম। যদি সেই পরিমল হয়। অনেকদিন যোগাযোগ নেই, না কি ?

তা বলতে পারেন। আমি তো জানতুম ও দিল্লিতে আছে। বোধহয় বি সি এস দিয়ে ডিস্ট্রিক্টে চলে এসেছে। বাঁধা মাইনের চাকরি নিয়ে দিল্লিতে থাকা—

তারপর থেকে বিজয়ের সঙ্গে স্বরূপের ব্যবহারই প্রায় পাল্টে গেল। বিডিওর বন্ধু!

পরে একদিন পরিমলের সঙ্গে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে দিয়ে কী কাণ্ড। ম্যানেজার ডেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। চা, সিগারেট। কি খাতির। কদিন আগেই এই ম্যানেজারের প্রায় হাতে পায়ে ধরেছিল বিজয়, স্ত্রীকে নিয়ে এসে ফিরে যাব ? ও অনেক দূরে থাকে। কোনোরকম দু'টো টিকিট যদি—

কোনো উপায় নেই দাদা। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজার। শুক্লা বিরক্ত হয়েছিল প্রচুর— অ্যাডভান্স টিকিট দেবার ব্যবস্থা থাকে না কেন এসব হলে।

এ কি কলকাতা! বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেয় বিজয়। সেই ম্যানেজার চা খাওয়ালো। হেসে হেসে কত কথা বলল। পরিমল ভাগ্যিস বিডিও হয়েছিল।

বাবা মারা যাবার পর এই পরিমল ছুটে এসেছিল বিজয়ের কাছে। পরিমলের মা নেই। বিমাতা ও একটি বৈমাত্রেয় ভাইকে ঘিরে তাদের আত্মীয়রা কিসব ফিসফিস করেছিল। পরিমল বিজয়ের কাছে উজাড় করে দিয়েছিল যাবতীয় মনোকষ্ট— মানুষটা মারা গেল, তাই নিয়ে কারো কোনো...। সম্পত্তির ব্যাপারে আমার আর ভায়ের যাতে কোনো...। আমি বলে দিয়েছি, আমার জন্যে চিন্তা করার দরকার নেই। বাবার যা আছে তা সবই ভাইকে দেবার ব্যবস্থা হোক। আমি একটি কানাকড়িও নেব না। ভুল করেছি, বিজয় ?

দিল্লিতে চলে যাওয়ার পেছনেও বিজয়ের যৎসামান্য ভূমিকা ছিল। খোঁজখবর দিয়ে পরিমলকে বিজয়ই বলেছিল— তুই পারবি। পরীক্ষাটা দিয়ে দে। পরিমল পেরেছিল। তারপর থেকে দীর্ঘ অসাক্ষাতের পর আবার এই.....। জিপ থেকে নেমে যেদিন বিজয়ের বাড়িতে দেখা করতে এল পরিমল....।

দিল্লির চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কেন? এই ধ্যাধ্ ধেড়ে গোবিন্দপুরের চেয়ে দিল্লি তো—। শুক্লা পরিমলকে ধরেছে।

কথাটা লুফে নিল? না; বোধহয় কেড়ে নিল পলি। আমার ভালো লাগতো না। কথা বলার কেউ নেই— সবাই শুধু টাকা আর টাকা—। দিল্লিটা কেমন যেন গাড়িওলা, বিজনেসম্যান আর পলিটিক্যাল লোকদের—

সারা পৃথিবীটাই তো তাই। শুক্লা সংক্ষিপ্ত। পলির কথায় পরিমল 'দিল্লির সুখ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে।'...

অনেকগুলো চাকরি একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। পরিমল সহজ করে দিল পরিস্থিতি। ব্যাংকে, কলেজে—।

ব্যাংকে পেয়েছিলেন? চকচক করে উঠল কি, শুক্লার চোখ! এতক্ষণ কথা বলেনি স্বরূপ। এবার বলল— ছেড়ে দিলেন?

নিলামই না। নিলে তবে তো ছাড়বো। ব্যাংক ফ্যাংক আমার কোনদিনই...।

কলেজে কোথায় পেয়েছিলি? এ প্রশ্ন বিজয় ছাড়া আর কার? সে যে কলেজেই পড়ায়। পরিমলের উত্তর শোনার জন্যে শুক্লাও কি ব্যাকুল, উতলা? নাহ, সামান্য কৌতূহলী। জোর করে চোখ সরিয়ে রেখেছে পরিমলের ওপর থেকে।

ডায়মণ্ডহারবারে! তাও অনার্স নেই। শুধু পাস কোর্স। পলির তীব্র আপত্তি ছিল।

ব্যাংকে কোথায় পেয়েছিলেন? শুক্লা বেশ নাছোড়।

পি ও-র পোস্ট, কে যায়? ইউ পি'র কোন গ্রামে দিচ্ছিল।

সেই গ্রামেই তো হল। অবশ্যই এ কথা বিজয়ের— তবে কি, ইউ পির গ্রাম আর পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম অনেক আলাদা।

আজন্ম শহরের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেও, কি রহস্যময় উপায়ে এই তীব্র গ্রামপ্রীতি বজায় রেখেছে বিজয় তা সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। আসল রহস্যটা বোধহয় বাপঠাকুর্দার ভিটে, জমি জমা। মাটির মায়া বড় মায়া। ধান ভরা খেতের পাশ দিয়ে হেঁটে— নিজের হাতে ফলানো ফসলের হাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার সুখ...।

হ্যাঁ। তা আলাদা। পরিমল আশ্বস্ত করে বিজয়কে।

ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পুরো খুলে গিয়েছিল পরিমল। সহপাঠীদের দিকে সাধারণত এমনভাবে তাকাতো-যেন, তোরা আবার ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টে কেন! খুব অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপকদের নজরে পড়ে গেল পরিমল। এক একজন তো পরিমলের দিকে তাকিয়েই ক্লাশটা নিতেন। পরিমলও, ক্লাশের মাঝখানে এত প্রশ্ন করত! ক্লাশ শেষ হয়ে যাবার পরও অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কমন রুমে পর্যন্ত চলে যেতো পরিমল। পরে এমন হল— পরিমল চাইলেই স্পেশাল ক্লাশ হত। ক্রমশ মেয়েদের ভিড় জমতে লাগল পরিমলের চারপাশে। পরিমল— ডেমোগর্গনটা একটু....। পরিমল কিং লিয়র থেকে কটা কোশ্চেন....।

পলি কখন উঠে গিয়েছিল।

নুডুলস্— বলতে বলতে ধোঁয়া ওড়ানো প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকলো। যথারীতি, শুক্লা বলে উঠল— একি ? এসব আবার....।

এই....একটু....চালিয়ে দিন কথা বলতে বলতে। পলি সবাইকে ধরিয়ে দিল হাতে হাতে। পরিমল উঠে ক্যাসেট চালিয়ে দিল টেপে। এতক্ষণ ওটা লক্ষ্য করেনি কেউ। সুইচ বোর্ডের নিচে একটা সুদৃশ্য কাচের পাল্লা দেওয়া বুক-সেল্ফের ওপর রাখা ছিল। শুক্লা বলল— কি দিচ্ছেন ? রবীন্দ্রসঙ্গীত ? দেবব্রত ?

কেন ? এলার্জি আছে ?

না না। তবে, সব জায়গায় শুনি তো। অন্য কিছু হলেই...।

অন্য কিছুই। শুনুন না।

পুরস্কার বিতরণী সভার দিকে যেভাবে উঠে যায়। আজকাল পরিমল, প্রায় সেইভাবে ক্যাসেটটা লাগিয়ে ফিরে এল।

বিদেশী বাদ্য ! বিজয় ভুরু কোঁচকালো। বাখ ? না তসকাগিনি। পরিমলের কাছে ? এই গ্রামে ? বাঃ। শুক্লার দিকে পূর্ণ চোখে তাকালো বিজয়।

বাজনার মধ্যে চামচের টুংটাং শব্দ। আবহাওয়াটা পাল্টে গেল পুরো। তার মধ্যেই কফি এসে গেল ট্রেতে।

আপনি কিন্তু খেলেন না কিছু। শুক্লার নরম অনুযোগ, পলিকে। একদিন আসুন আমাদের বাড়ি।

আমার তো-। পলি তাকায়, পরিমলের অনুমতিসাপেক্ষ, তার গতিবিধি।

বিজয় না বলে পারে না— আর একদিন তোরা...।

নিজের হাতে জল দিয়ে যে গাছকে বড় করা হয়, সেই চেনা গাছই একদিন অনেক বড় হয়ে কেমন অচেনা হয়ে যায়। বিজয় ভাবছিল। এই পরিমল ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে দেবারতির প্রেমিক ছিল ; সেকেণ্ড ইয়ারে, সুদক্ষিণারও ! পলিকে পড়াতো চিরকালই। এখন সব কেমন—।

বিজয় যখন নিজের বিয়ের খবর দেয়— পরিমল বলেছিল, সে কি রে ? বিয়ে ? এরই মধ্যে ! আমার এখন অনেক প্রেম করার আছে, দেশ বিদেশ ঘোরার আছে—।

শুক্লা চাকরি করে শুনে আরও বিরক্ত হয়েছিল পরিমল। তুই, ভেবেচিন্তে....। চাকরিটা ট্রান্সফারেবল শুনে, আরও— তোর ব্যাপার, তুই বোঝ।

জড়িয়ে গেছি খুব। শুক্লাকে ছাড়া—। বিজয় হেসেছিল।

কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে আপনার— বিজয়কে বলল পলি।

কবে আসছেন তাহলে ? শুক্লার অমোঘ প্রশ্ন। আতিথ্য ফিরিয়ে দেবার দায় আছে। পরিমলের সঙ্গে বিজয়ের বন্ধুত্বের গভীরতা এখন অবান্তর প্রশ্ন। এখন তারা যেন অন্য গ্রহের মানুষ। হাসি পর্যন্ত যেখানে মাপা। রাস্তার লোক বিজয়কে দেখিয়ে বলে, বিডিও সাহেবের বন্ধু !

সামনের রোববার ? শুক্লা পাকা করতে চায়, কথা।

রোববার ? পরিমল চিন্তান্বিত হল। উ-না, রবিবার একটা স্পেশাল মিটিং আছে।

শনিবার— উঁহু, শনিবার তো আবার...

ইনোগরেশন? শুক্লা ঠোঁট টিপছে!

নাঃ মানে...আপনি থাকছেন তো এখন? আপনার ছুটি কদিনের? জানতে চায় পরিমল। শান্ত।

একটা সিগারেট দিন তো— স্বরূপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বিজয়।

বিজয়ের দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে স্বরূপ বলল— আমাদের বাড়িতেও তো আসার কথা আপনাদের, অনেকদিন থেকে!

বাজনাটা থেমে গেল হঠাৎ। শুক্লা বলল— অটো স্টপ?

পলি বলল— হ্যাঁ, অটো স্টপ।

মানুষ-জন্ম

কী, কিছু লিখছ না কেন ? পত্রিকা স্টলে দাঁড়িয়ে সদ্যপ্রকাশিত পূজো সংখ্যা দেখছিল প্রেমাংশু। এত সাহিত্য। কে পড়বে ? চল্লিশ থেকে আশির মধ্যে দাম সব, এক একটা তিরিশের এদিক ওদিক। উপন্যাস বলে যে জিনিসগুলো এসব জায়গায় ছাপা হয়, গায়ে গতরে সেগুলোকে অল্পবিস্তর আড়িয়ে বাড়িয়ে বই করে দু-মলাটে বাঁধলেই তো তিরিশ চল্লিশ টাকা মিনিমাম। সুতরাং বেছেবুছে দু-চারখানা পুজো সংখ্যা কেনাই যেতে পারে; ভাবতে ভাবতে পেছন থেকে কথাটা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল— সুবিমল ঘোষদস্তিদার, প্রেমাংশুর প্রিয় লেখক। চোখে চোখ পড়তেই ঝলমলে হেসে উঠল প্রেমাংশু, প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হলে যেরকম হয়।

আমার... আবার লেখা। সলজ্জমুখে প্রেমাংশু কোন রকমে বলে উঠতে পারল— পুজোর বইগুলোতে আপনার লেখা খুঁজছিলাম।

গাড়ি থেকে তোমায় দেখতে পেয়ে নেমে পড়লাম। অনেকদিন আসো না। সুবিমলের গলায় কি অভিমান ? নকল কি ?

যাব একদিন। এবারের লেখাগুলো পড়ে নিই।

তোমার বৌদি বলে মাঝে মাঝে। সেই ছেলেটি আসে না— যে এলে তুমি আমাকেও ভুলে যাও।

বৌদির তরমুজের সরবত অনেকদিন খাইনি।

অনেকদিন তোমার লেখা দেখছি না।

আমার আবার লেখা। এবার বেশ স্পষ্ট করে বলল প্রেমাংশু।

ইচ্ছে করলে তুমি আমার চে অনেক বড় লেখক হতে পারতে। আচ্ছা, আসি। কাজ আছে। তুমি এসো কিন্তু।

বলেই গাড়িতে উঠলেন সুবিমল। প্রেমাংশু হাত নাড়ল।

ঘটনাটা ঘটে গেল দু-এক মিনিটের মধ্যে। কিন্তু প্রেমাংশুর ঘোর কাটতে বেশ সময় লাগল।

এই লেখকের লেখা থাকলে প্রেমাংশু সে পত্রিকা কিনে পড়ে। বেশ কয়েক বছর হল এরকমই চলছে। প্রথম যেদিন ঠিকানা খুঁজে ভদ্রলোকের বাড়িতে কড়া নেড়েছিল, সেদিন স্বপ্নেও জানত না, এ বাড়ি থেকে বেরোতে দু তিন দিন লেগে যাবে। প্রেমাংশুর মতো, নিখুঁত পাঠক ভদ্রলোক সম্ভবত জীবনে পাননি। ছেলে একটিমাত্র, সে চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেছে; প্রেমাংশু জানে দু-তিন বছর ধরে

সুবিমল বেশ নিঃসঙ্গ। একদিন যেতে হবে। ...অত ছোট ছোট বাক্য লিখে নতুন কিছু করা যায় না, পাঠকের পড়ার অভ্যাসে একটা ইচ্ছাকৃত বাধার সৃষ্টি করা ছাড়া... ভদ্রলোক নিজে দরজা খুলতেই প্রেমাংশুর প্রথম বাক্য। তারপর থেকে...।

অন্য সব তথাকথিত বিখ্যাত লেখকদের দেখলে প্রেমাংশুর কেমন একটা অস্বস্তি হয় ; কী বলবে বুঝতে পারে না। এত হিমশীতল আর ওজন-করা তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা। নিজের লেখালেখি করার ইচ্ছেটাও খানিকটা যেন উবে যায়। শুধু এই সুবিমল ঘোষদস্তিদারকে দেখলে...। ষাট পেরিয়েও এত প্রাণশক্তি ভদ্রলোক যে কোথা থেকে পান।

প্রেমাংশু নিজে চল্লিশ পেরোতে না পেরোতেই কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে। মাথার চুল বেশিরভাগই পাকা। সতেরো বছর সরকারি কেরানিগিরি করে বেশ নাদুসনুদুস একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছে প্রেমাংশু। ভুঁড়ির ভারে খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেও।

কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের শেষে দাঁড়িয়ে প্রেমাংশু একটা সিগারেট ধরাল। ইচ্ছে করলে তুমি...। প্রেমাংশুকে অকারণে মিথ্যে স্তোকবাক্য গাড়ি থেকে নেমে ছুঁড়ে দিয়ে যাবার মতো লোক সুবিমল ঘোষদস্তিদার নন। প্রেমাংশুকে খুশি করার মতো তাঁর তেমন কোনও হঠাৎ-দায় নেই। তাহলে ?

প্রেমাংশু কি ফেলে-দেওয়া কলম আবার নতুন করে তুলে নেবে, অফিসের কাজ আর বাড়িতে সংসারের খরচখরচা লেখার হিসেব কষা ছাড়া— যে আজকাল কলমই ধরে না। এমন কি, একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না যে ; যদি সাহিত্য করে ফেলে ভুল করে, পুরনো অভ্যাসবশতঃ। সে কি তাহলে সত্যিই পারত। শুরু করবে আবার ?

ইচ্ছে করলে প্রেমাংশু অনেক কিছুই তো হতে পারত, কিন্তু কেন যে হল না ? সাধারণ, খুব সাধারণ একজন কেরানি হল শেষ পর্যন্ত। কেন যে হল।

ছোটবেলায় বড় মামা চেয়েছিল প্রেমাংশু উকিল হোক। কিন্তু সিনেমায় আর বাস্তবে মোট যে কটা উকিল দেখেছে প্রেমাংশু, তাদের কারুর মতো নিজের হয়ে ওঠার কথা যে সে ভাবতেও পারে না— বড় মামাকে সেসব বোঝাতে পারেনি প্রেমাংশু। তিনি বলতেন— কর্মব্যস্ত জীবন— অগাধ টাকা— এতে তোর এত আপত্তি কেন ? এসব তো ভালই। সবাই পায় না। সবাই পারে না। তুই পারবি। ল-কলেজে ভর্তি হয়ে যা। আমার চেনা-জানা অনেক সিনিয়র উকিল আছে। তোকে ভাল দেখে একজন সিনিয়রের কাছে ঢুকিয়ে দেব।

প্রেমাংশু বুঝেছিল, এই 'ঢুকিয়ে দেবা'র তৃপ্তিটুকু পাবার জন্যেই বড় মামা তাকে উকিল করে তুলতে চায়। নিজে আসলে সারা জীবন বিভিন্ন উকিলের কাছ থেকে ব্রিফ নিয়ে নিয়ে এসে টাইপ করেছে তো। বাড়িতে মেসিন ছিল। নিজের ভাগ্নেকে উকিল করে তুলে, সারা জীবন উকিলদের কাছে ছোটাছুটি করার হীনমন্যতা কাটাতে

চেয়েছিল হয়তো কিছুটা। প্রেমাংশুকে দিয়ে সে কাজ হয়নি।

কাকারা সবাই মিলে প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছিল আই-এ-এস দেবার জন্যে ; অন্তত বি-সি-এস ; তা, সেটাও হল না। সরকারি আমলা হয়ে ওঠার কোনও ইচ্ছে প্রেমাংশুর একেবারেই ছিল না। যে সম্মান শুধু চেয়ারের, তার জোরে চব্বিশটা ঘন্টা বরবাদ করার কোনও মানে হয় না। তখন ভেবেছিল প্রেমাংশু আসলে সে ছোটবেলা থেকেই বইয়ের পোকা। স্বভাবে আড্ডাবাজ, বেপরোয়া। বাড়িতে থাকলে শুয়ে শুয়ে বই পড়া ছাড়া...

—দাদু, কটা বাজে ?

ফ্রক পরা একজন কিশোরী। প্রেমাংশু অবাক না হয়ে পারল না, প্রশ্নটা তাকেই করা হল। শুধু কাঁচাপাকা চুলের জন্যই কি মেয়েটি তাকে দাদু বলল ?

—তিনটে দশ।

শুনেই মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল।

প্রেমাংশুর যেন মনে পড়ল, অফিসে ফিরতে হবে। কলেজ স্ট্রিটে সে আসলে কলিগের ছেলের জন্যে একটা টেস্ট পেপার কিনতে এসেছিল। সুবিমল ঘোষদস্তিদার নামে একটা লোক যে নাকি লেখক আসলে তার সব হিসেব গুবলেট করে দিয়ে গেছে একটু আগে। ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ভ্যাবলার মতো বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সে খানিকটা ছেলেবেলার কথা ভেবে ফেলেছে। অপচয়।

তিরিশ টাকার একটা টেস্ট পেপার পঁচিশ টাকার একটা মেড-ইজি একসঙ্গে না কিনলে দেবে না। এসবের মানে কী ? যে মূল দোকান থেকে টেস্ট পেপার বিক্রি হবার কথা, সেটার তো পরিষ্কার ঝাঁপ বন্ধ। আশপাশের ফুটপাথে যেখানে সেখানে ওই মেড-ইজি সহ পাওয়া যাচ্ছে। যে আনতে দিয়েছে, সে যদি মেড-ইজি নিতে আপত্তি করে ? করারই তো কথা। টেস্ট পেপার কেনার জন্যে খামোকা একটা মেড-ইজি কিনতে বাধ্য করা হবে কেন ? প্রেমাংশু জানে, এরকম অনেক কেন'রই, আজকাল কোনও জবাব হয় না।

একটা ভিড় বোঝাই বাস আসতে বিস্তর ধাক্কাধাক্কি করে প্রেমাংশু সেটায় উঠে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে পিষ্ট হতে হতে, প্রেমাংশুর মনে হল— সব সময় কলকাতার বাসে এত ভিড় হবে কেন, তারই কি কোনও জবাব হয়।

ক্রমশ, মাথার মধ্যে, দুটি বাক্য আবার ঘুরে ফিরে চলে আসতে লাগল। দাদু, কটা বাজে ? ... ইচ্ছে করলে তুমি...।

চল্লিশ বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষের চেহারায় হাঁটাচলা করে, প্রেমাংশু তো বাবাই হতে পারল না আজ পর্যন্ত। লোকে তাকে দাদু বলে কেন। জীবনের পুরোটাই কি তবে অপচয়।

অপিসের কাছে বাস থেকে নেমে আর একবার চমকাল প্রেমাংশু। একটু দূর

দিয়ে সংযুক্তা ছোট বোনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে।

ঠিক এক বছর আগে, এগারো বছর সংসার করার পর, সংযুক্তার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে প্রেমাংশুর।

এখানেও দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেমাংশু। ওদের চলে যাওয়া দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রেমাংশু আবার বিয়ে করলেও সংযুক্তা বোধহয় করেনি। অন্তত এক পলক দেখে কিছু বোঝা গেল না। মেয়েদের তো আর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে নেই। ছেলেরা ঠিক রান্না করে খাওয়াটা ম্যানেজ করতে পারে না সাধারণত।

কত অশান্তিই যে করেছে এগারো বছর ধরে সংযুক্তা। এলেমেলো মনে পড়তে লাগল সব। এখন চট করে ওকে মন থেকে তাড়ানো যাবে না।

নতুন যাকে বিয়ে করেছে প্রেমাংশু, সে ওই কলিগের বোন, যার ছেলের জন্যে টেস্ট পেপার কিনতে গিয়েছিল প্রেমাংশু। ভারি শান্ত। প্রেমাংশুকে সুখী করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে থাকে যেসব বি-এ পাশ বেকার যুবতী, তাদেরই একজন। ডিভোর্স দিয়ে দেবার পর রোজ বলে বলে প্রেমাংশুকে রাজি করিয়েছে এই কলিগ। নিজের ফ্ল্যাট, পাকা চাকরি। ...লোকে শুধু এইসব দেখে। প্রেমাংশুর মনমেজাজ নিয়ে কারুর কোনও মাথাব্যথা নেই। থাকবেই বা কেন।

অবসন্ন প্রেমাংশুকে খালি হাতে সেকশনে ঢুকতে দেখে আশিস রায় বললেন—কী, পাওয়া গেল না?

—মেড-ইজি না কিনলে দেবে না। তাই নিলাম না।

—আপনার পুজো সংখ্যা?

—দেখলাম দু-একটা। সব বেরোক না। পরে দেখেশুনে কিনলেই হবে।

সময়টা নষ্ট হল তাহলে।

এ কথার কোনও উত্তর দিল না প্রেমাংশু। এগারো বছরের নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবন, বলতে গেলে তো নষ্টই হয়েছে। চাপে পড়ে আবার বিয়ে করলেও, জীবন আর আগের মতো নেই। শুধু খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হয় বলে...। নতুন করে কতবার শুরু করতে পারে একটা লোক? সংসারটা না হয় করতেই হয়। কিন্তু, লেখালেখি? আর কি পারবে প্রেমাংশু? বাবা হবার আগেই যে দাদু হয়ে যায়, সে কি তার ফেলে-দেওয়া কলম ফের তুলে নিতে পারে।

বাড়ি ফেরার সময়, ট্রেনে, ভিড়ের ভেতর, পিছন থেকে কে যেন হঠাৎ প্রেমাংশুর মাথার চুলগুলো খামচে ধরল। রীতিমত রেগে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়েই প্রেমাংশু দেখল, একটা ফুটফুটে বাচ্চা। বাবার কোলে চেপে হাতের কাছে ধরার মতো বিশেষ কিছু না পেয়ে প্রেমাংশুর মাথার চুলটাই খামচে ধরেছে। হেসে ফেলল প্রেমাংশু। বাচ্চাটার

গাল টিপে দিল একটু। বাচ্চাটার কুণ্ঠিত বাবা কেমন যেন গলায় বলল, খুব দুষ্টু। প্রেমাংশু এই গলায় কথা বলতে পারবে না।

রাতে নিজের বিছানায়, বৌ তখন আসেনি, বাসন ধুচ্ছে, প্রেমাংশু ভাবছিল, এই বিছানায়, সে ঠিক কত জনের সঙ্গে শুয়েছে আজ পর্যন্ত। প্রথমেই রুমার কথা মনে পড়ল। কাকু কাকু করে চলে আসত। তারপর...। প্রেমাংশু আশ্চর্য হয়ে গেল নিজেই। বিছানাটা তো তার অনেক পতনের সাক্ষী। এই বিছানায় সে আজও অক্লেশে ঘুমোয়। এবং, নতুন বৌকে নিয়ে। যে বিছানায় সে আগের স্ত্রীর সঙ্গে একটানা এগারো বছর ধরে ঘুমিয়েছে। আশ্চর্য। বিছানাটা যদি হঠাৎ আত্মজীবনী লিখতে শুরু করে...।

সে হয়তো লিখবে— প্রেমাংশু হালদার বলে একটা লোক আমাকে একদিন দোকান থেকে বাড়িতে নিয়ে এল। লোকটা খুব অলস। দিনরাত বই মুখে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। দিনের বেলা সে এই বিছানায় শুলে আমার যে কী অস্বস্তি হয়, কী বলব। লোকটার বৌটা খুব খিটখিটে। চাকরি করে তো। লোকটার খুব অশান্তি। রাত্তিরে কি রকম গুটিশুটি মেরে বিছানার একদম এক ধারে সরে গিয়ে অসহায়ভাবে ঘুমোয়! নিজের বাড়িতে, নিজের বিছানায়, যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছে। বৌ না থাকলে রুমা বলে একটা মেয়ে আসত। বাজে মেয়ে। বৌয়ের সঙ্গে যাদের ভাল ভাব নেই, অন্য মেয়ে দেখলে তারা কেমন চুলবুল করে ওঠে। লোকটাও উঠত। তারপর একদিন—।

—ক্রিম মাখবে?

প্রেমাংশুর নতুন বৌ। ধরিত্রী। সে কি এইসব বিছানার আত্মকথা শুনতে পায়। প্রেমাংশু উদাসীন গলায় বলল, দাও।

এই বিছানা তার এগারো বছরের কত ঝগড়ার রাতের সাক্ষী। শেষ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা যখন জার্মানির কাছে হেরে গেল, আর্জেন্টিনা কেন, মারাদোনা হেরে গেল বলা যায়, সেদিনের ঝগড়াটাই সব থেকে সাংঘাতিক। হাতাহাতি অবধি হয়েছিল। না। প্রেমাংশু সেসব কথা ভাববে না। নতুন বৌয়ের সঙ্গে ঘুমোতে যাবার আগে সেসব কথা ভাবা উচিত নয়। ভুলে যাওয়া উচিত।

বিয়ের পর ধরিত্রীকে কথা বলাতে, সহজ করতে, অনেক সময় লেগেছিল। সব সময় কিরকম যেন আড়ষ্ঠ, কিরম যেন চুপচাপ। হয়তো ভাবত, যদি কিছু ভুল হয়ে যায়! পুরো ভঙ্গিটা প্রেমাংশুর আগের স্ত্রীর এত উল্টো! নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের প্রশান্তি প্রেমাংশু যেমন পাচ্ছিল— যা বেশ নতুন তার কাছে— তেমনই, উত্তেজনাহীন একটা চাপা ক্লান্তিও অনুভব করত। দাদার ডিভোর্সি বন্ধুর সংসারে এসে, সদাকুণ্ঠিত ভাবটা কিছুতেই কাটাতে পারছিল না ধরিত্রী। প্রেমাংশু অনেক চেষ্টা করেছে। 'তুমি কথা বলো না কেন'— অনেকবার বলার পর একদিন ধরিত্রী

বলল— 'কী কথা বলব। যাতেই হাত দিই মনে হয় আমার নয়।'

প্রেমাংশু কথা বাড়ায়নি বেশি।

শুধু, নিজের পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, বুঝতে পারছিল— ধরিত্রীকে যতটা বোকাহাবা ভেবে রেখেছিল মনে মনে ধরিত্রী তা নয়। বরং সে নিজেই ওরকম। বেশি বই পড়লে কিংবা চালাকচতুর কথাবার্তা বললেই, কেউ জীবনের পরীক্ষায় 'পাশ' মার্ক পেয়ে যায় না। সঠিকভাবে বেঁচে থাকার অন্য মাত্রা আছে। তার জন্যে বিশেষ যোগ্যতা লাগে। রোজ সন্ধেবেলা স্ত্রীর রান্নাঘরে কুটনো কুটে দেওয়া কি নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসানোর জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি লাগে। লাগে বলেই, বেশিরভাগ লোক এ কাজগুলো করতে পারে না। 'ওসব আসলে বোকা বোকা ব্যাপার তাই করি না'— এরকম সান্ত্বনা রটিয়ে রাখে।

—'মালিশ করে দেব ?' মশারি গুঁজতে গুঁজতে ধরিত্রী বলল।

কোমরে একটা কষ্ট আছে প্রেমাংশুর। লাম্বাগো। মাঝে মাঝে এত ব্যথা হয়, সকালবেলা বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। সারাদিন বই মুখে দিয়ে শুয়ে থাকে সেসব দিন। পাঁচ বছর আগে, প্রথম যখন বিছানায় শুয়ে প্রেমাংশু, তাকে ওই অবস্থায় রেখে অফিস চলে যেত তার তৎকালীন স্ত্রী। 'বাড়িতে থাকলে তো সারাদিন এটা দাও সেটা দাও বলে জ্বালাতন করবে।' বলে চলে যেত— প্রথম প্রথম বিছানায় পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতাও ছিল না প্রেমাংশুর। সেই অসুখের সময়ই অনেক কিছু বুঝে গেল প্রেমাংশু। ঠিক পনেরো দিন পরে বিছানা থেকে নেমে কোনও রকমে হামাগুড়ি দিতে পারল। হামাগুড়ি দিলে মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়ে না। কোমরেও লাগে না। সে যে কী আনন্দ। একেই বোধহয় সার্থকতা বলে। তাছাড়া, চার পায়ে যারা চলাফেরা করে, তাদের সঙ্গে মানুষের একটা মূল প্রভেদ প্রায় আবিষ্কার করল প্রেমাংশু। জন্তুদের চলাফেরার বা স্বভাবচরিত্রের তাও একটা নির্দিষ্ট গতিপ্রকৃতি আছে। মানুষের নেই। তারা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে।

প্রেমাংশু উপুড় হয়ে শুতেই ধরিত্রী মালিশ করা শুরু করল।

বিছানাটা কি তার আত্মকথায় এসব কথা লিখে রাখবে ?

আজকাল লোকটা বেশ সুখে শান্তিতে আছে। নতুন বৌটা সারাদিন মুখ বুজে ঘরের কাজ করে। কোমরের ব্যথা বাড়লে নিয়মিত মালিশ করে দেয়। সকাল সন্ধে ঘরের কোনে ঠাকুরের কাছে ধূপ দিয়ে পূজো করে। আর কি চাই।

আসলে কি এই রকমই চেয়েছিল প্রেমাংশু। দরকারের সময় হাতের কাছে সব জিনিস পেয়ে গেলে অলস পরনির্ভর পুরুষদের ভালই লাগে। কিন্তু তা বলে, এমন নিস্তরঙ্গ, নিরুপদ্রব ওঠাবসাহীন— জীবনযাপনও কি কাঁরো ভাল লাগে !... এগারো বছরের তীব্র অশান্তিময় দাম্পত্যের অব্যবহিত পরে— এখন না হয় ভারি চমৎকার ও আরামপ্রদ লাগছে এ জীবন। কিন্তু, দু-এক বছর পরে ?

মালিশ করতে করতে হঠাৎ উপুড় হয়ে থাকা প্রেমাংশুর মাথার পিছনের দিকে চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে ধরিত্রী বলল, হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে গেল প্রেমাংশুর। একটা ছোট্ট হাতের মুঠি তার চুল ধরে টানছে।

প্রেমাংশু, চিৎ হয়ে শুয়ে, প্রায় সে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেবার ভঙ্গিতে ধরিত্রীকে জড়িয়ে ধরল।

একটা রক্তমাংসের শিশুকে কোলে তুলে 'আ-বা' 'আ-বা' করতে না পারলে, এই মানুষ-জন্মে সে আর কোনও কাজই ভাল করে করতে পারবে না।

ফেলে-দেওয়া কলম তুলে নেওয়া তো অনেক দূরে।

লেটার বক্স

ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই মনে হল, আজ লেটার বক্স দেবে। সাধারণ ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে পরিমল। অনেকক্ষণ মানে যতক্ষণ পারে। পাপিয়া গরম চায়ের কাপ মাথার কাছে নামিয়ে রেখে গেলেও, উপুড় হয়ে একটু পড়ে থাকে পরিমল। তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, যেন আর কোনো উপায়ান্তর নেই বলেই হয়তো, মুখটা টেনে চায়ের কাপের কাছে...। তারপর সারা শরীরে গরম চায়ের উত্তেজক আবেশ ছড়িয়ে পড়লে, আস্তে আস্তে উঠে বসে পরিমল।

আজ ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই ধরমর করে উঠে বসল।

আজ লেটার বক্স দেবে। ওপরে ফ্ল্যাটের নম্বর-জি/২২৩, নিচে বাংলায় দুজনের নাম। পরিমল-পাপিয়া। ওয়ার্টালু স্ট্রিটে একটা পানের দোকানের পাশের গুমটি। রেডি ছিল না বলে কাল দিতে পারলো না। আজ করে দেবে। দেবে তো ? দোকানের লোকটা কেমন যেন। একটু এ পাশেই আর একটা দোকান ছিল। সেখানে খোঁজ করলে বোধহয় ভালো হতো। প্রথমেই এর সঙ্গে কথা বলে ফেলে বিপদ হল। এ লোকটা ঘোরাবে মনে হয়। আগে একজনের সঙ্গে কথা বলে তার সামনেই আর একজনের কাছ থেকে জিনিস কিনতে, একই জিনিস, কেমন যেন রুচিতে লাগে।

পাপিয়ার এসব বালাই নেই। বাজারে একজনের কাছে চারটে পটল নেড়েচেড়ে অনায়াসে তাকে বাদ দিয়ে পাশের জনের কাছ থেকে কিনতে পারে। একজনের কাছে অনেকক্ষণ ধরে দরাদরি করে, শেষে অম্লানবদনে অন্য আর একজনের কাছ থেকে সেই এক দরেই একই জিনিস কিনতে পারে। পরিমল এরকম কোনদিন পারবে না। পাপিয়া বলবে— পয়সা দিয়ে জিনিস কিনবো, আমার যেখান থেকে খুশি আমি কিনবো। এত কিসের ?

অসুবিধেটা যে কিসের, তা বোঝাতে পারবে না পরিমল। কোনদিন চেষ্টাও করেনি। ওয়ার্টালু স্ট্রিটের পর পর দু তিনটে ওইরকম দোকান, দেওয়ালে আটকানো অনেক নেমপ্লেট— ভুবনেশ্বরী লুঙ্গি কোং, কবিগুরু হোসিয়ারী, বিশ্বনাথ পাল অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, মমতা দে, আরও কত কি। প্রথম দোকানটাতেই কথা বলে ফেলল পরিমল। ফুটপাতের ধারে দেওয়ালের গায়ে কাঠের খোপ বসানো পর পর দু তিনটে গুমটি। দরজার নেম প্লেট আর লেটার বক্স, দুটোই এক জায়গায় হয়ে যাবে। পুরো

ঠিকানাটা দরকার নেই, যেহেতু সব চিঠি একসঙ্গে পিওন কেয়ারটেকারের কাছে দিয়ে চলে যায়। কেয়ারটেকার সর্ট করে প্রত্যেকের চিঠি যার যার সিঁড়ির লেটার বক্সে ফেলে দেয়। প্রমোটাররা বারোটা সিঁড়ির জন্যে বারোটা বারোয়ারি লেটার বক্স দিয়েছে, বেশ বড় বড়। সেখান থেকে নিজের চিঠি বেছে বেছে খুঁজে নিতে কেমন যেন লাগে। নিজের একটা আলাদা লেটার বক্স না থাকলে...। বক্সটা বসিয়ে কেয়ারটেকারকে বলে রাখতে হবে— এবার থেকে আমার চিঠিগুলো... বাড়িতে কেউ আসতে চাইলে বারোটা সিঁড়ির মধ্যে ঠিক কোনটা— অনেক বোঝাতে হয়। ডানদিকে চতুর্থ সিঁড়ি— হেনা তেনা, এবার থেকে বলা যাবে— কমপ্লেক্সে ঢুকে একটু খেয়াল করলেই হবে— নিচে আমার নামে আলাদা একটা লেটার বক্স আছে। আহ্, সে কবে? অবশ্য আর দেরী নেই বেশি।

চাটা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল— হাঁ করে বসে আছ কেন? আমি আর গরম করে দিতে পারব না। তরকারি চাপিয়েছি।

পাপিয়া গজ গজ করতে করতে ঘুরে গেল।

লেটার বক্সটা নিয়ে পাপিয়া হয়তো বলবে— নতুন বাজারে এটা ছ টাকা-সাত টাকায় পাওয়া যেত। এত দাম দিয়ে ধর্মতলা থেকে আনতে গেলে কেন?

তখন হয়তো পরিমল বলবে— কি যা তা বলছ। কাছেই একটা কাঠগোলায় সেদিন খোঁজ করে দেখেছি— ছাপ্পান্ন টাকা চাইছে। একটা লেটার বক্স ভালো করে তৈরি করে দেবে। ছা-প্-পা-ন্নো টাকা। তুমি আবার তার ওপর দিয়ে যাও। নতুন বাজারে ছ টাকায় পাওয়া যায়! মামার বাড়ি।

পাপিয়া বলবে— তা বলে লেটার বক্স আর নেমপ্লেটের জন্য এতগুলো টাকা... শুধু মুদু...।

তখন মনে মনে হাসবে পরিমল। শুধুমুদু নয় গো। শুধুমুদু নয়। দরজায় নেমপ্লেট না থাকলে...। নিচে কারও আলাদা কোনও লেটার-বক্স নেই। সব বারোয়ারি। শুধু আমাদেরটা...। সামান্য কটা টাকা। কত আর? চল্লিশ-পঞ্চাশ। এটাকে বাজে খরচ বলো না পাপিয়া।

আটটা বাজতে না বাজতে বেরিয়ে যায় পাপিয়া। বেরিয়ে যায় মানে, প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায়। সারাদিনই ছুটছে পাপিয়া, বলতে গেলে-সারাটা জীবনই। এই এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে, পরিমল কখনো পাপিয়াকে চুপ করে বসে থাকতে, বা অসময়ে অকারণে শুয়ে থাকতে দেখেনি। অফিস থেকে ফিরেই সোফার ওপর এলিয়ে পড়ে পরিমল— টি ভি তে হঠাৎ ভালো কিছু দেখালে, পাপিয়াকে চেঁচিয়ে ডাকে— এই, শোনো, শিগগির এসো, দেখে যাও— তখন পাপিয়া হয়তো হাতের কাজ ফেলে, দয়া করে প্রায়, একবার এসে— দু এক সেকেণ্ড টি ভির দিকে তাকিয়েই, ফের গজ গজ করতে করতে চলে যায়— তোমার মতন শুয়ে বসে আয়েস করে টি ভি দেখার কপাল তো আর করিনি। আজকাল এসব কথার আর

কোনো উত্তর দেয় না পরিমল। লাভ নেই। চটপট কোনো কাজ সারতে পারে না পাপিয়া। সবই ধীরে সুস্থে করে। এককাপ চা করতেও দশ মিনিট লাগাবে অন্তত। এবং পাপিয়াকে কিছু বলা চলবে না। বললেই- ননস্টপ লেকচার শুরু হয়ে যাবে।... পরিমল আজকাল পারতপক্ষে পাপিয়াকে ঘাঁটায় না। লোকসান।

আদার ওয়াইজ, মানে, না ঘাঁটালে আর কি—মানে, নিজের মেজাজ মর্জি মতন থাকতে দিলে— পাপিয়া বেশ সুরে থাকে সাধারণত। বেসুরে বাজে না। ভালোমন্দ রাঁধে। ছোটবেলার গল্প করে হঠাৎ। পরিমলের জন্যে নতুন গেঞ্জি কিনে দেবার কথা বলে হয়তো। ভালোবাসা বোঝাবার প্রত্যেকেরই নিজস্ব, আলাদা আলাদা ধরন আছে। পরিমল অবশ্য ওসবের ধার দিয়েও যায় না। হঠাৎ আবেগ এলে খুব জোর অকারণে একটু জড়িয়ে ধরা পর্যন্ত। তার বেশি...। 'বাথরুমে যাবে তো ? তাড়াতাড়ি বেরোবে কিন্তু। তোমার জন্য রোজ আমার দেরী হয়ে যায়।'

পাপিয়া আবার তাড়া দিয়ে গেল।

সাময়িকভাবে বিরক্ত হলেও পরিমল উঠল। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই-এই আটত্রিশ বছরের জীবনে, আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে পরিমল-তার অনেকটাই-ওই পাপিয়ার তাড়াতেই...।

কি ছিল পরিমল ? কলকাতা থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে সামান্য এক দোকানদারের ছেলে, স্কুলের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলেও বাবা বলেছিল— যথেষ্ট হয়েছে, দোকানে বসবি কাল থেকে। প্রায় পালিয়ে কলকাতা চলে এসেছে পরিমল। খুড়তুতো কাকার কাছে থেকে অনেক কষ্টে গ্র্যাজুয়েট হয়ে, তাও সন্ধেবেলার কলেজ থেকে-দিনের বেলা হাইকোর্টে এক উকিলের কাছে টাইপ করে পড়াশোনার খরচ চালাতে হত- অবশেষে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে না হতে কাকার নোটিশ-ঘরের অসুবিধে হচ্ছে। পরিমল যেন মেস-টেস যাই হোক কিছু একটা দেখে নেয়। কলেজ স্ট্রিটে মেস পেতে অসুবিধে হয়নি। শুধু টিউশানি, মেস, ক্লাস, আর লাইব্রেরি, বই কেনার পয়সা কোথায়। মাঝখানে পাপিয়া না থাকলে....।

মায়ের চিঠি আসতো মাঝে মাঝে।... বাবাজীবন, কেমন আছো, কি করছো, কিছুই জানতে পারি না। সাবধানে থাকবে। কলকাতার জল খারাপ। আজে বাজে খাবার খেও না। তোমার বোন ক্লাস নাইনে উঠেছে। তোমার কথা বলে মাঝে মাঝে। আমরা ভালো আছি। চিঠি দিও। ...পরিমল জানে এসব চিঠি মায়ের নিজের হাতে লেখা না। বোনকে দিয়ে লেখানো। এসব চিঠির উত্তর দেবার কোনো ইচ্ছে হত না পরিমলের। বি.এ. পাশ করার পর একবার লিখেছিল— মা, আমি বি.এ. পাশ করেছি। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। ক্লাস নিয়মিত হয় না। টিউশনি পাচ্ছি। আজকাল মেসে থাকি। আমার অক্ষম প্রণাম নিও।... ইত্যাদি।

—আমি বেরবো না, নাকি ? বাথরুমে ঢুকলে জগৎসংসার ভুলে যাও দেখছি ? তাড়াতাড়ি বেরোও।

চিন্তার ছেদ পড়ল পাপিয়ার তাড়ায়। পরিমল কল খুলে দিল। জলের শব্দ শুনতে না পেলে পাপিয়া থামবে না।

অফিসে যাবার জন্য পরিমলের কোনো ছুটোছুটি নেই। পাপিয়ার ঠিক উল্টো। অসম্ভব দ্রুততায় সাজগোজ সারে। এই একটা কাজই তাড়াতাড়ি করতে পারে সে,- পরিমলের আগেই বেরিয়ে পড়ে পাপিয়া। বাথরুম থেকে বেরিয়েই পরিমল দেখল, আর এক কাপ চা আর খবরের কাগজ রেডি। খাবার টেবিলে পাপিয়া নিজের ভাতটা বেড়ে রেখে স্নানে ঢুকেছে। ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি নেই পাপিয়ার।

ওকে সাহায্য করার জন্য, মাঝেমধ্যে টুকিটাকি দরকারি জিনিস হাতের কাছে এগিয়ে দেবার জন্যে, কিংবা হঠাৎ হয়তো কিছু রান্না করে পাপিয়াকে খাইয়ে দেবার জন্যও— পরিমলের যে ইচ্ছে করে না তা নয়; কিন্তু কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে ওসব করতে গেলে। মনে হয় বসে বসে পাবার ইতিহাসটা পায়ের তলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষ একবার একদিন যা পায়, পেয়ে যায়, তা তো রোজই পেতে চায় সে তারপর থেকে-মানুষের এরকমই নিয়ম। ব্যত্যয় হলেই সে মনে করে, অবমাননা করা হল তাকে, উপেক্ষা, ধরাতল রসাতলে গেল। তাছাড়া, সাহায্য করতে গেলেই পাপিয়া এত ডিরেকশন দেয়— এরকম না, ওরকম করে করো— তাতেই খুব দ্রুত বিরক্ত হয়ে যায় পরিমল; ওধারে ঘেঁষতে চায় না সহজে। পাপিয়াও আজকাল আর বলে না কিছু। দু মানুষের সংসারে, প্রথম প্রথম পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া আভ্যন্তরীণ সংসারকর্ম যে অসম্ভব—অন্তত ঝি চাকর না থাকলে— যা একেবারেই অপছন্দ করে পাপিয়া— সে ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে অনেক বক্তব্য রাখতো পাপিয়া। পরিমল হাই তুলল।

কাক যেভাবে ময়লা খুঁটে খায়, প্রায় সেই ভঙ্গিতে কোন রকমে নাকে-মুখে গুঁজে পাপিয়া ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। লেটার বক্সটা নিচের দেওয়ালের কোনদিকে লাগালে ভাল হয় বলতো— এরকম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল পরিমল— পাপিয়ার ব্যস্ততা দেখে কথাগুলো জিভেই আটকে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পাপিয়া বলল— আমার দেরী হতে পারে, অফিস ছুটির পর অ্যাসোসিয়েশনের কি একটা মিটিং আছে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরিমল আবার শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলে, পরিমল দেখল, সিগারেট নেই। আনতে হবে। তার মানে গেটে তালা দিয়ে ক্যামপাসের বাইরে ছোট্ট গুমটি দোকানটাতে যেতে হবে; টুকিটাকি স্টেশনারি ছাড়াও, ওখানে আলু, ডিম, পেঁয়াজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। ফ্ল্যাটের বাবুরা বাজার করার সময় না পেলে গোপালের কাছ থেকে, ঘরে ফেরার সময় আলু, ডিম অন্তত কিনে নিয়ে ঢুকে পড়ে।

নিজের ফ্ল্যাটে তালা লাগাতে গিয়ে দরজার পরের কোলাপসিবল গেটটা টেনে কেমন উদাস হয়ে গেল পরিমল। সারাজীবন কত জায়গায় কত রকমভাবে যে থাকা

হল! ছোটবেলায় গ্রামে, তারপর কলকাতায় খুড়তুতো কাকার কাছে- আহ্, সে উপেক্ষা মনে পড়লেও চোয়াল কঠিন হয়ে আসে। সে আশ্রয়ও যখন গেল, তারপর কলেজ স্ট্রিটের মেসবাড়ি- হরি ঘোষের গোয়াল। রোজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে একটা সামান্য স্বপ্ন-নিজের, একদম নিজের যদি একটা ফ্ল্যাট থাকতো- রোজ বেরোবার সময় নিজের হাতে গেটে তালা দিয়ে.... অথচ, সে স্বপ্ন এখন সম্পূর্ণ সার্থক ; তবু, একটুও আনন্দ নেই সে সার্থকতায়, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সবসময়।... সিগারেট আনতে যেতে হলেও দরজায় তালা লাগিয়ে যেতে হবে? বাড়িতে যে সর্বক্ষণ থাকার মতন কেউ নেই। পাপিয়া সবসময় ব্যস্ত, চাকরি-বাপের বাড়ি-কেরিয়ার... তার ওপরে এই এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের কোন সন্তান নেই। পাপিয়া সময় পায়নি।

পরিমলের ফ্ল্যাট তিনতলায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, চারতলার মিত্রবাবুর একমাত্র মেয়েটি, পিউ-মর্নিং স্কুল থেকে ফিরছে— পরিমলকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ; মিষ্টি করে একটুখানি হেসে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। যেন সে জানেই পরিমল এখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হামি খাবেই। পরিমল রোজই, দেখা হলেই, তাই করে থাকে। আজ কিন্তু, শুধু থুত্নিটা একটু নেড়ে দিয়েই, পিউর পাশ দিয়ে উদাসীনভাবে নেমে গেল। কেমন অবাক চোখে চেয়ে রইল পিউ। পরিমল তিন চার ধাপ নেমে গেলে, ওপর থেকে পিউ বলল— কাকিমা অফিস চলে গেছে? পরিমল শুধু ঘাড় নাড়ল।

প্রথমদিন বাড়িতে এসে পাপিয়াকে পিউ প্রশ্ন করেছিল- রোজ রোজ তুমি কোথায় চলে যাও? কাকুমনি একা একা থাকে। আমার মা তো যায় না? বাবা যখন অফিস যায়, মা রুমাল দেয়, ব্যাগ দেয়, কত কি দেয়। কাকুমনিকে তুমি দাও না? আগে আগে চলে যাও কেন? পাপিয়ার বিভ্রান্ত, হাসি হাসি উত্তর, আমার অফিস থাকে যে! পিউও ছাড়বার মেয়ে নয়। ফট করে বলেছিল— তুমিও আপিস যাও? কেন? কাকু তো যায়। তুমি তো রান্না করবে। আর তারপরেই— 'আমার মায়ের তো আমি আছি। তোমার মেয়ে নেই কেন?'

পরিমল তখন কোনরকমে— পিউ, তোমাকে মা ডাকছে- এরকম কিছু বলে তাকে ওপরে পাঠিয়ে, পাপিয়াকে- কিছু মনে কোরো না- জাতীয় কিছু একটা বলেছিল হয়তো।

ল্যাণ্ডিংয়ে, বারোয়ারি লেটার বক্সটার দিকে তাকিয়ে দেখল পরিমল। ওপরে পর পর কয়েকটা ফ্ল্যাট নম্বর লেখা। জি/২২-২৫, জি/১২২-১২৫, জি/২২২-২২৫, এরকম, একশো দিয়ে নাম্বারগুলো ফার্স্ট ফ্লোরে, দুশো দিয়ে নাম্বারগুলো সেকেণ্ড ফ্লোরে, এইভাবে। পিওন কিন্তু সব চিঠি কেয়ারটেকারের কাছে একসঙ্গে দিয়ে যায়। কেয়ারটেকার সেগুলো সর্ট করে সিঁড়িতে সিঁড়িতে ভাগ করে— ফেলে দিয়ে যায়। তাও প্রায়ই ভুল করে। এর চিঠি ওর বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়

প্রায়ই। এর যে কবে শেষ হবে। নিজের নামে একটা আলাদা লেটার বক্স না থাকলে আর ফ্ল্যাট কিনে কী লাভ হল! এই বারোয়ারি লেটার বক্সগুলোও কোম্পানি দিতে চায়নি, অ্যাসোসিয়েশন থেকে চাপ দিয়ে...। এই অ্যাসোসিয়েশন নিয়েও হাজার ঝামেলা— এক একটা সিঁড়িতে কুড়িটা করে ফ্ল্যাট— সেই কুড়িটা ফ্ল্যাটের থেকে একজন করে- মোট বারোটা সিঁড়ি থেকে বারোজন প্রতিনিধি নিয়ে সেণ্ট্রাল কমিটি-তারা আবার এক একজন এক একরকম-প্রত্যেক মিটিং-এ প্রত্যেক ইস্যু নিয়ে তাদের এত রকম বাজে কথা হয়। অযথা বকর বকর, পরিমল হাঁফিয়ে উঠত দ্রুত। সেসব অবশ্য জেনারেল মিটিং। আজকাল আর কোনো মিটিংয়েই যায় না তাই। এতগুলো ফ্ল্যাটের এতগুলো লোকের- অন্তত হাজার খানেক তো হবেই- এত লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মাত্র বারোজন রাজনীতিপ্রবণ মানুষের হাতে-অথচ তাদের কোনো নিঃস্বার্থ চেষ্টা বলে কিছু নেই- প্রায় বছর খানেক হয়ে গেল সবাই যে যার ফ্ল্যাটের পজেশন নিয়ে নিয়েছে- অথচ মেনটেনান্সের অনেক জিনিসই এখনো ঠিক হল না। প্রত্যেকের নামে ইনডিভিজুয়াল মিটার বসবে— মিটারের দেখা নেই, লাইন ঠিক করার জন্যে, পাইপ বসাতে, মাঝখানের-প্যাসেজের দুপাশটা খুঁড়ে রেখে দিয়ে চলে গেল! এই বর্ষায়...। সাব-মিটার দিয়ে কোনরকমে কাজ চলছে; ইরেকশনের সময়কার তিনটে ইণ্ডাসট্রিয়াল মোটর দিয়েই কাজ চালানো হচ্ছে এখনো। তা-ও সেগুলো মাঝেমাঝেই জ্বলে যায় একটা না একটা, দু-তিন দিন আলো থাকে না, জল থাকে না...। রাস্তার কলে লাইন পড়ে যায় জলের জন্য- অধিকাংশ ফ্ল্যাটের ভেতর দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না ভালো করে- কারেন্ট না থাকলে— তার ওপর একটানা দু তিন দিন-সে এক অসহ্য নরককুণ্ড...। অজন্তা অ্যাপার্টমেণ্ট তখন বারোয়ারি বস্তি। অবশ্য বাজারের চালওয়ালাটাও একদিন বলছিল- আপনি অজন্তায় থাকেন নাকি? ওটাকে তো ভদ্র বস্তি বলি আমরা...। শুনতে খারাপ লাগলেও পরিমল কিছু বলতে পারেনি।.... বাজারে চাল বিক্রিটা তার কাজ হলেও— তারও সম্পূর্ণ নিজের একটা বাড়ি আছে, চব্বিশঘণ্টা সেবা করার মতন বাধ্য বউ আছে।...

চাণক্য শ্লোকে যেমন আছে— স্ত্রী, পুত্র, আর চাকর যদি বশে থাকে— যার বশে থাকে, সে পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগ করে। আহ্ স্বর্গসুখ! গৃহিনী গৃহমুচ্যতে। গৃহিণীই গৃহ। গৃহ বলতে এতদিনে একটা ফ্ল্যাট হল কোনরকমে, আর গৃহিণী— সে তো সবসময়ই গৃহ থেকে বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায়। এটা বোধহয় লেট টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরির একটা বিশেষ ক্যারেক্টার। মেয়েরা কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না...। ছুটির দিনেও কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তে চায় পাপিয়া। তেমন বিশেষ কিছু দরকার না থাকলেও। ...হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে ঘরের ভেতর থেকে থেকে, কোথাও না বেরোতে পেরে রান্নাঘর আর বিছানার ঘেরাটোপে কাটিয়ে দিয়ে দিয়ে এখন যেন প্রতিশোধ নেবার কারণেই বেরিয়ে পড়তে

চায় তারা, পাপিয়ারা।... কিন্তু কিসেরই বা প্রতিশোধ? কার ওপর? কেন? নিপীড়িত হতে ভালো লাগে না বলে নিপীড়ন করবো? এভাবে কি হয়? কি হয়?

ঠিক কিভাবে যে কি করবে, এটা মানুষের একটা চিরন্তন সমস্যা। যে কটা পেজ করব বলে মনে করে, সে হয়তো সেটা করেও ফেলে, যেভাবে হোক— কিন্তু কিভাবে, কেন, কখন— সেটা অন্য প্রশ্ন। যে কাজটা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই করে ফেলা উচিত, সেটা বিকেলেব জন্য তুলে রাখলে কি ক্ষতি! কি যে ক্ষতি। সেটা যদি ছোটবেলায় বুঝতুম। যা করতে ইচ্ছে করে যখন, তা না করে যেটা উচিত কিংবা ফলদায়ী, নিজের আবেগের টুঁটি টিপে ধরে সেটাই যদি করে ফেলা হত, আরও যদি কিছু করে ফেলা যেত....। তার বদলে সারাটা জীবন অন্যের ইচ্ছের ছাঁচে নিজেকে পুষিয়ে নিতে হল অনবরত। ছোটবেলাটা বাদ দিলে খুড়তুতো কাকার বাড়িতে...নাহ্, সেসব ভুলে যাওয়াই ভালো। মেস লাইফ বিশৃংখল থাকলেও বরং স্বাধীনতা কিংবা মজা ছিল অনেক।... আর পাপিয়া...। পাপিয়া হল ডিসিপ্লিন আর সার্থকতার অন্য নাম। আর পরিমল? পরিমল হল আবহমান পুরুষশাসিত সমাজের এক ব্যর্থ প্রতিনিধি, পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া যার দ্বিতীয় কোন কার্যক্রম নেই। পুরুষ হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে গেলে এত কাঠখড় পোড়াতে হয়...। পাপিয়ার সঙ্গে ঠিকসময়ে দেখা না হলে হয়তো সারাজীবন মেসেই...।

সিগারেট ধরিয়ে ফিরে আসার সময় সিঁড়ির সামনে ডানদিকের বারোয়ারি লেটার-বক্সটার দিকে চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল পরিমল। ঢাউস একখানা বক্স। চাবি দেওয়ার কোনো উপায় নেই। যে কেউ যখন তখন খুলবে। কেউ যদি কারো কোনো মূল্যবান চিঠি ঝেড়েও দেয়, কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না। অলরেডি এরকম দু একবার হয়েওছে। কিন্তু এই ঢাউস বাক্সটার পাশে আমাদের পার্সোনাল লেটার বক্সটা কিছুতেই বসাবো না। উল্টো দিকের দেওয়ালে...। হ্যাঁ, এইখানটায় বসাবো। মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে এলে প্রথমেই চোখে পড়বে, জি/২২৩, পরিমল-পাপিয়া।

দুই

অফিস ছুটির পর ওয়াটার্লু স্ট্রিটের দিকে যেতে যেতে, পরিমলের বার বার মনে হতে লাগলো— আজও যদি না দেয়। আজ না দিলে, কিছুতেই সেটা সহজভাবে নিতে পারবে না পরিমল। খালি হাতে আজ বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না কিছুতেই। আজ সারাদিন তার সমস্ত চেতনার মধ্যে একটা লেটার বক্স নিরুপায় ভাবে ঢুকে বসে আছে। সেটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত...।

কোনো কোনো লোক থাকে, যারা কোনো কাজই, কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে উঠতে পারে না। নির্দিষ্ট দোকানে পৌঁছে লোকটাকে দেখেই পরিমলের মনে

হল, করে রাখেনি। জিজ্ঞেস করতেই গম্ভীর মুখে বলল, একজন কর্মচারী কাজে আসছে না বলে...। পরিমল আরও গম্ভীরভাবে বলল, আপনাকে আর করতে হবে না। অ্যাডভান্সের টাকাটা যদি দয়া করে ফেরত দেন। বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা দিয়েও দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের দোকানে চলে এল পরিমল। আজ এর কাছে নতুন চার পাঁচ খানা লেটার বক্স সাজানো। সবই কপাল। ছোট বড় নানান সাইজের আছে। পাপিয়া হলে এই লোকটাকেই বেছে নিত আগেই। লোক চিনতে কেন যে ভুল হয়ে যায় পরিমলের। পরিমলকে দেখলেই যে দোকানদাররা বুঝে যায়, একে বেশ সহজেই ঠকানো যাবে। পাপিয়ার ভাষায়— তোমাকে দেখলেই দোকানদারেরা বোঝে, এই সেই লোক যার জন্যে দোকান সাজিয়ে রোজ বসে থাকি।

মরিয়া একটা মানসিকতা নিয়ে অনেকক্ষণ দরে দরাদরি করল পরিমল। যেটা পছন্দ হল-সেটা বিয়াল্লিশ টাকার কমে কিছুতেই দিল না। লেটারিং নিয়ে বাহান্ন টাকা। তাই সই। কি লেখা থাকবে সেটা একটা সাদা কাগজে লিখে দিয়ে ঠিক তিনটে সিগারেট খেল পরিমল। ভদ্রলোক নিজেই লিখে দিলেন সুন্দর করে-জি/২২৩, তলার লাইনে পরিমল-পাপিয়া। দরজার নেমপ্লেটটা কাল দেবে। সেটার জন্য অ্যাডভান্স দিয়ে লেটার বক্সটা হাতে নিতেই কেমন রোমাঞ্চ হল-সারা শরীরে। আহ্, এর জন্যে এত! অনেক, অনেকদিনের একটা স্বপ্ন...। চলে আসার সময় ভদ্রলোক বললেন- সাবধানে, রঙটা কাঁচা আছে তো, ঘষা লাগলে জেবড়ে যেতে পারে। পরিমল খুব কায়দা করে বুকের কাছে আলতো করে ধরলো লেটার বক্সটা। সাদা রঙ দিয়ে জি/২২৩ লেখার দিকটা বাইরের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে খানিকক্ষণ পরে পরিষ্কার মনে হল, নতুন মায়েরা বোধহয় ঠিক এভাবেই হাসপাতাল থেকে তাদের সদ্যোজাত শিশুকে বুকে আঁকড়ে ধরে বাড়ি নিয়ে যায়। মনে হতেই আলতো করে লেটার-বক্সটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল পরিমল। ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠবে নাকি? না না, ও এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। যেন এতদিনে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে।

একটা খালি ট্যাক্সি দেখে পরিমল খুব মিষ্টি করে ডাকল- ট্যাক্সি। এই সদ্যভূমিষ্ঠ লেটার বক্সটা নিয়ে তো বাসে ওঠা যায় না।

দরজায় নেমপ্লেট আর নিচে বারোয়ারি লেটার বক্সের উল্টোদিকের দেওয়ালে নিজেদের আলাদা লেটার বক্সটা লাগানোর পরের সপ্তাহে পাপিয়া শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে গেল। আকাশবাণীর চাকরি। না গিয়ে কোনো উপায় নেই।

যাবার আগে অনেক উপদেশ দিয়ে গেছে পাপিয়া। শিলিগুড়ি এমন কিছু দূর নয়। যখন তখন চলে আসবো। বেশি সিগারেট খেও না। রাত করে বাড়ি ফিরো না। জামা কাপড় ময়লা হলে নিয়মিত লন্ড্রিতে দিয়ে দেবে। রান্নার লোক ঠিক করে দিয়ে গেলাম। তোমার তো কোন অসুবিধে হবার কথা নয়।...

যেন মানুষের যত অসুবিধে শুধু খাওয়া আর জামাকাপড় পরা নিয়ে।...

পাপিয়ার চলে যাওয়া নিয়ে আপত্তি করে কোন লাভ নেই বলেই আপত্তি করার কথা ভাবেনি পরিমল। প্রতিকূল, বিরুদ্ধ ঘটনাবলীকে মেনে নিতে না পারলে কষ্ট বাড়ে।

আজকাল পরম নিশ্চিন্তে অনেক বেলা অবধি শুয়ে থাকে পরিমল। তাড়া দেবার মত কেউ নেই। রান্নার মেয়েটা কাজ শেষ করে চলে যায়। যখন আর না উঠলে নয়, তখন উঠে নিজের হাতে ভাত বেড়ে খেয়ে নিয়ে অফিস চলে যায় পরিমল। শুধু ফ্ল্যাটে দরজা বন্ধ করে, কোলাপসিবল গেটটা টেনে তালা দেবার সময় নিজের নেমপ্লেটটা কেমন হেসে উঠছে মনে হয়...জি/২২৩, পরিমল-পাপিয়া।

বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই। বন্ধুদের আড্ডাতেও অবশ্য ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সব ছেড়েছুড়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবার মুদিখানার দোকানে বসে পড়লে বেশ হয়। তার পরই মনে হয়, যে পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যে এতদিন ধরে এত চেষ্টা, অবশেষে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই ফিরে যাবার কোনো মানে নেই!

বিয়ের পর একবার পাপিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল পরিমল। বাবা কোনো কথা বলেনি। বালক বয়সে গৃহত্যাগী ছেলে তাঁর কাছে মৃত। দোকানে বসার ভয়ে যে ছেলে চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে কলকাতা চলে যায় তার সঙ্গে...। গ্রামের অনেক লোক তো পরিমলকে চিনতেই পারেনি। রাস্তাঘাট, দোকানপাট অনেক পাল্টেও গেছে। আজকাল ঘন ঘন মোটরবাইক যায়। ভিডিও সেণ্টার হয়েছে হাটতলার পাশে। পরিমলের মনে হয়েছিল— এ তার সেই ছোটবেলার গ্রাম নয়। অবশ্য তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে তো আর নতুন করে থাকতে যাচ্ছে না এখানে।

ছোট্ট ভাই বাবার সঙ্গে দোকানে যায় আজকাল। সেও বিশেষ পাত্তা দেয়নি তাদের। শুধু পাপিয়ার দিকে কেমন জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছিল। বোনটা খুব উৎপাত করেছিল পাপিয়াকে। তার হাজার রকম প্রশ্ন আর কৌতূহল। আর মা... পাপিয়ার হাত দুটো ধরে কেঁদে আকুল। আমার ঘরছাড়া ছেলেটাকে দেখার কেউ নেই... তুমি অন্তত...।

কি দেখল পাপিয়া?

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসের এক কোণে চুপ করে বসে থাকতো পরিমল। চারপাশের অন্যসব ছেলে-মেয়েদের কলরোল, কথাবার্তা, অযথা চটুলতা- কিছুই ভালো লাগতো না। হঠাৎ একদিন পাপিয়া এসে- এই, তুই এমন ভ্যাবলাকান্তর মতন চুপ করে বসে থাকিস কেন রে?- বলেছিল। ক্লাসের ছেলেমেয়েদের হঠাৎ তুই বলে কথা শুরু করাটা তখনো ঠিক মেনে নিতে পারেনি পরিমল। তবু পাপিয়াকে খারাপ লাগেনি। ক্রমশ দুজনে সবসময়ের সঙ্গী হয়ে গেল। চাকরিটা পাবার দুমাসের মধ্যেই পাপিয়া একটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম নিয়ে এসে বলল- সই করো। সেসব স্মৃতি

এখনো কত উজ্জ্বল।

অফিস থেকে ফেরার সময় নিজের নামের আলাদা লেটার বক্সটার সামনে—একদিন থমকে দাঁড়ালো পরিমল। ধুলোভর্তি, ঝুল, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে।

উল্টোদিকের বারোয়ারি লেটার বক্সটা পরিষ্কার, ভেতরে দু চারটে চিঠি রোজই থাকে তাতে।

ধুলোমাখা, ঝুলভর্তি, মাকড়সার জালে ঢাকা নিজের নামের লেটার বক্সটা দেখতে দেখতে পরিমল যেন নিজেকেই দেখতে পেল নতুন করে।

এখন তথাগত

সুজাতা আজও এল না।...

সুজাতা আসে না কেন ? আসবে না-ই যদি তাহলে আসবে বলে কেন ? একবার নয়, দুবার নয়, বার বার, সুজাতা আমাকে দেখলেই ওরকম অস্থির, চঞ্চল, উন্মনা, চপলা, মানে যাকে বলে 'আনসেটলড' হয়ে ওঠে কেন, আর প্রায় অবধারিতভাবে নতুন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কেন ? কেন ? পাতাল রেলের কে সি দাশের দিকের প্রবেশ-মুখে দাঁড়িয়ে তথাগত নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল। মেয়েদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা তার জীবনে এই প্রথম নয়, শেষও নয় হয়তো। মেয়েদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে সে ভালবাসে। মেয়েদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে ছেলেরা সাধারণত যে নিয়মটা মেনে নেয়, অর্থাৎ আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে মেয়েটিকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে, নিজে একটু পরে যাওয়া—তথাগত কোনওদিনই সেরকম করেনি, কোনও মেয়ের সঙ্গেই করেনি। বরাবরই নিজেই আগেভাগে দাঁড়িয়ে থেকেছে, যেখানে থাকার কথা, ঠিক সেখানে গিয়ে। এবং যার জন্যে যখন যেখানে সে দাঁড়িয়ে থেকেছে, সে যদি সঠিক সময়ে ঠিকমত এসে পড়ে তাহলে তথাগতর একদম ভাল লাগে না। সে বেশ কিছুক্ষণ দেরি করে এলে, কিংবা আদৌ না এলে, তথাগতর বেশ ভাল লাগে। ভাল লাগে, কারণ তার কথা, তখন, সে না এলে, যতক্ষণ না আসে — ততক্ষণ অন্তত, তাকে মানে তথাগতকে ভাবতেই হয়। তথাগত সেইসব অপদার্থ অকর্মণ্য পুরুষদের একজন, যে নিজে তৎপর হয়ে কিছু করে ওঠার, করে ফেলার চেয়ে, বিভিন্ন কাজ কীভাবে করব, কেন করব, কিংবা করে কী হবে সেসব ভাবতে ভালবাসে। তার এই চিন্তাশীল, ভাবুক ও আলস্যমথিত জীবনচর্যার জন্যে তার স্ত্রী ও বেশ কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী তাকে পরিত্যাগ করেছে। তথাগতের নাম পর্যন্ত তারা শুনতে চায় না।

সুজাতাকে তথাগত প্রথম দেখেছিল সুমঙ্গলের সঙ্গে। ওরা দু-জনে তখন সারা কলকাতা চষে বেড়াত। কোনওদিন শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগানের দিকে, কোনওদিন অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে ভিক্টোরিয়ার দিকে, কোনওদিন রাসবিহারী থেকে গোলপার্কের দিকে, নানা জায়গায় ওদের কথা বলতে বলতে মগ্ন হয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে তথাগত। তখন সুজাতার সঙ্গে আলাপই ছিল না। সুমঙ্গল ছিল কলেজ জীবনের সহপাঠী। সুজাতা সঙ্গে থাকলে সুমঙ্গল মাঝে মাঝে পরিচিত মানুষের যৎসামান্য হাসিটিও তথাগতর দিকে ছুঁড়ে দিতে ভুলে যেত, তবে

সবসময় নয়। সুজাতা, অবশ্যই তথাগতর দিকে ফিরেও তাকাত না। তবে, আজ মনে পড়ে, দুজনে একসঙ্গে থাকলে সুজাতাকে কখনও বেশি কথা বলতে দেখেনি, তথাগত। বকর বকর করত সুমঙ্গলই। কেন? সুজাতা আসছে। পাতাল রেলের [illegible] প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, সুজাতার কথা ভাবতে ভাবতে, চলে যাবার আগে আপাত শেষ সিগারেটটা ধরিয়েই তথাগত দেখল, সুজাতা আসছে। তবে কি মত পালাটাল সুজাতা। আসবে বলে না-আসার খেলাটা শেষ হল? এগোবে না ভেবেও একটু এগিয়ে গেল তথাগত। এবং তখনই বুঝতে পারল সেই পুরনো ভুলটা আবার হয়েছে। না। সুজাতা নয়, প্রায় সুজাতার মতো একটি মেয়ে পাতাল রেলের গহ্বরে ঢুকে গেল ধীর স্থির পদক্ষেপে।

তবে কি আজও সেই মদের দোকানে? পারমিতা ডিভোর্স কেসটা করার পর থেকে সন্ধেগুলো কিছুতেই আর নিজের হাতে থাকছে না। টালিগঞ্জের ফাঁকা অফিস-কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে টিভি খুলে হাবার মত বসে থাকার কোনও মানে হয় না। বইপত্র তথাগত এত পড়েছে যে আজকাল কোনও বই হাতে নিলে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে এতে এমন কোনও নতুন কথা নেই যা সে জানে না। পারমিতা থাকলে সময় কাটানোটা সমস্যা ছিল না। 'সময়' যে কতবড় সমস্যা হতে পারে একজন মানুষের—তথাগত মনে করে, সেটা তার মতো আর কেউ জানে না। পারমিতা চলে না গেলে সে নিজেও এতটা জানত না।

অফিসেও, তথাগতকে সই করা আর হাইতোলা ছাড়া বিশেষ কিছু তেমন করতে হয়না। তবে হ্যাঁ, কথা বলতে হয়। কথা বলা, আর কথা বলা, এবং কথা বলার মধ্যেই বেঁচে আছে তথাগত — বলতে গেলে। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অফিসের একজন খুব ছোট নয় আবার খুব বড় নয় গোছের অফিসার হয়ে ওই সই আর হাই-এর মধ্যে যে কাজটা তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করে যেতে হয় সেটা হল, ওই কথা বলা। একদিন একটা জরুরি, লম্বা মিটিং শেষ করে সবে নিজের ঘরে মানে অফিসে যেখানে বসে তথাগত, সেখানে ফিরে এলিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে শুরু করেছে মানসিকভাবে এতটা ক্লান্ত তো আমি না হলেও পারি, ক্ষতি কী তাতে? চারপাশের পরিস্থিতি তো আমাকে বিধ্বস্ত করবেই—কিন্তু আমি তা হব কেন!—ঠিক সেরকম সময়েই, সুজাতা এসে বলল—নমস্কার। আমি 'মহানন্দা' পত্রিকা থেকে আসছি। কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে। তথাগত, একইরকম ভঙ্গিতে, এলিয়ে বসে, সিগারেট টেনে যেতে লাগল। ফুল যে ভাবে মালীর দিকে চেয়ে থাকে, পাখি যেভাবে আকাশের দিকে, প্রায় সেভাবে সুজাতার দিকে চেয়ে ছিল তথাগত। বক্তব্য শেষ করে উত্তরের অপেক্ষা করছিল সুজাতা। তথাগতর মধ্যে তার উপস্থিতির ন্যূনতম প্রতিক্রিয়া না দেখে, বেশ রেগেই যাচ্ছিল সুজাতা।...নিজের বক্তব্য দ্বিতীয়বার জানিয়েও কোনও লাভ হল না দেখে চলে যাবে কিনা, অন্য কোনও অফিসারের সঙ্গে কথা বলবে কিনা ভাবতেই সুজাতা বলে ফেলল, বসতে পারি? আর তখন, তথাগত, কথা বলার মতো অবস্থা ফিরে

পেয়ে প্রায় আত্মগত এক অসহায় অথচ অমোঘ উচ্চারণ উপহার দিল সুজাতাকে — সুমঙ্গল এখন কোথায়? ফাঁকা চেয়ারগুলোর একটাতে ধপ করে বসে পড়ল সুজাতা।...পাতাল রেলের এই কে সি দাশের দিকের প্রবেশমুখে, এতক্ষণ একটানা কখনও অপেক্ষা করেনি তথাগত। অপেক্ষা করার পক্ষে এ জায়গাটা নতুন তার কাছে। উল্টোদিকের রেলিঙে হেলান দিয়ে কয়েকজন ব্রিফ-কেস-ওয়ালা ঠায় দাঁড়িয়ে, দেখলেই বোঝা যায় তারা কোনও নির্দিষ্ট সুজাতার জন্য অপেক্ষা করছে না, আপাতত তাদের যে কোনও একজন সুজাতা চাই। এবং কোনও পরমান্ন নয়, তারা শুধু তাৎক্ষণিক ওই রক্তমাংসের সুজাতা-সহবাস পেতে চায়, যতই অর্থহীন হোক সেটা, তবু চায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগের ঐতিহাসিক ভিত্তি হল দুটো : ভালবাসা আর শোষণ। ভিত্তিগুলো আজকাল মিলেমিশে যাচ্ছে। এখন শুধু ফেলো কড়ি মাখো তেল! কলকাতার লোকজন ক্রমশ কেমন যেন হিংস্র, ক্ষুধার্ত, নির্মম হয়ে যাচ্ছে।·পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে তারা শুধু.....। হঠাৎ একজন সান্ধ্য সংবাদপত্র বিক্রেতা মুখে ধরে থাকা সিগারেটটা তথাগতর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল একটু আগুন দিন তো মুখে। হাত জোড়া।....পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তথাগতর উপর তার যেন কিছুটা অধিকার জন্মে গেছে। আগুন তথাগতর কাছে সবসময় থাকে। বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটার মুখে ধরে থাকা সিগারেটটা নিজের বিদেশি লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল তথাগত। সিগারেটটা মুখে রেখেই একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে তিনি বললেন— ভুল হয়ে গেল। তথাগতকে বলতেই হল—কী ভুল? একইরকম ভঙ্গিতে তিনি বললেন— আরও বেশি মাল তুললে ভাল হত। কম হয়ে গেল। আজ এত টানবে আগে বুঝতে পারিনি।... আর একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন— আসলে, ক্যাপশনটা ভাল দিয়েছে, বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙছে।.....চার পাঁচজন খদ্দের এসে যেতেই ভদ্রলোক অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তথাগত বেঁচে গেল। অনেকক্ষণ পরে কথা বলার লোক পেয়ে সে একসঙ্গে অনেক কিছু বলে ফেলতে চাইছিল প্রায়।

মনটা আবার সুজাতার দিকে ফিরে গেল বাধ্যত। বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙছে কিনা তা নিয়ে তথাগতর কোনও মাথাব্যথা নেই। কাগজের হকার কিংবা মালিকের লাভ হচ্ছে ওসব ছেপে, তা হোক না। তাতে তথাগতর কী যায় আসে। পৃথিবীর খুব দুর্দিন আসছে, সূর্যের মধ্যে ব্ল্যাকহোল দেখা দিয়েছে, আগামী বছর-দুয়েকের মধ্যে প্রকৃতির তাণ্ডবে, যুদ্ধে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে যেতে পারে, কমুনিজম একটা টোটাল ফেলিওর—মাতৃতান্ত্রিকতা আবার ফিরে আসবে পৃথিবীতে—জল, বায়ু, পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে কেবলই— এসব আলোচনা তথাগত আজকাল আর কোনও আগ্রহ পায় না। প্রথম দিন, ধপাস্ করে বসে পড়ে সুজাতা বলেছিল— এক গ্লাস জল। বেল টিপেছিল তথাগত। শুধু জল নয়, পুরো টিফিন, দুজনে একসঙ্গে খেয়ে, বিকেলের চা, এবং 'মহানন্দার' অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া অবধি ওরা একসঙ্গে ছিল।....বছর দুয়েক ধরে ডিভোর্স-কেসটা টেনে যাচ্ছে সুমঙ্গল,

কিছুতেই ছাড়ছে না।.....ওদের একমাত্র মেয়েটা সুজাতার কাছেই থাকে। ....'দশ মাস ধরে নিজের শরীরের মধ্যে যাকে লালন পালন করেছি, শুধু তার সঙ্গে ছাড়া.....আর কারও সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্কে আমি আর বিশ্বাস করি না'....সুজাতা কেমন যেন সুরে বলছিল।.....সুমঙ্গল সম্পর্কে যে সব তথ্য জানিয়ে গেল সুজাতা তথাগত নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তার সবটা অবশ্যই সত্যি নয়! নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে মেয়েরা অনেকরকম মিথ্যে ছলনা ও চাতুরির আশ্রয় নিতে পারে—তথাগত জানে। তবু, যে কোনও কারণেই হোক, সুজাতা তার স্বামীর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত এবং তার সম্পর্কে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর রাগ ছাড়া, তিক্ত স্মৃতি ছাড়া সুজাতার মনে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মেয়েরা অবশ্য নিজেদের ভূমিকাটুকু সযত্নে আড়াল করে রাখে, সম্ভব হলে নিজের কাছ থেকেও তথাগত সে তথ্যও জানে। পৃথিবীর কোনও রক্তমাংসের রমণীর কাছে তথাগত কখনও শোনেনি, আমারই অপরাধে আমি পস্তাচ্ছি। সম্ভবত সব মেয়েই এ ব্যাপারে একমত হবে যে, সবাই তাদেরই সঙ্গে অনবরত অন্যায় আর অবিচার করে যাচ্ছে, তারা নিজেরা যেন কোনও অন্যায় কিংবা অবিচার কারও সঙ্গে কখনও করেনি। তথাগত অবশ্য সুজাতাকে কোনও প্রশ্ন করেনি।...তবু সে জানে, সুমঙ্গল সম্পর্কে যা-ই বলুক সুজাতা, তার নিজেরও এই দাম্পত্য-ব্যর্থতায় যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।...যেমন পারমিতার সঙ্গে কথা বললে তথাগতকে আর কেউ ক্রিমিনাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারবে না। .... সব মিলিয়ে তথাগতর আজকাল মনে হয়, মেয়েরা এক ধরনের হাঁ-করা প্রাণী যারা শুধু বিভিন্ন মুখ দিয়ে অনবরত খেয়ে যেতে ভালবাসে....সময়, পুরুষ, সুখাদ্য, অলংকার, স্বাচ্ছন্দ্য... তাদের সবই চাই! বিনিময়ে, খরা বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ উপেক্ষা করে তারা শুধু সন্তানের জন্ম দিয়ে যাবে। ভাগ্যিস পুরুষেরা নিজের নিজের সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। টেস্ট টিউব বেবি হোক, আর যা-ই হোক, একটি পূর্ণাঙ্গ মনুষশরীরকে পৃথিবীর মাটিতে আনতে একজন নারীকেই প্রয়োজন। .....আর, শুধু এই কারণেই রমণীদের আরাধনা করে যেতে হবে! মদের টেবিলে এক বিখ্যাত মাতাল একদিন তথাগতকে বলেছিল, মেয়েদের সম্পর্কে, ও শালারা ভাল নেই.....নিজেরা নিজেরা ওরা কিছুতেই ভাল থাকতে পারে না বলে আমাদের উত্তক্ত করে মারে....। তখন নেশায় ছিল তথাগত, হো-হো করে হেসে উঠেছিল। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে আসলে কেউই মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের সমতা রক্ষা করতে পারে না, কারও একটা বেশি তো অন্যটা বেশ কম. আর, চেহারায় পুরুষ হলেও অনেকেই আসলে নারীস্বভাবের, কিংবা চেহারায় রমণী হলেও আসলে অনেকে.....। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সুজাতার আসার কথা ছিল সাড়ে ছটায়। তথাগত আর দাঁড়াল না। প্যান্টের দু-পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে ধীর পায়ে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে লাগল মদের দোকানের দিকে। আজও মদ তাকে টানছে, যা, হয়তো, নারীর, এমনকি ঈশ্বরের বিকল্প! তবে, আজ, কিছুটা এগিয়ে তথাগত আবার দাঁড়াল। মেট্রোর ঠিক উল্টো দিকের ফুটপাতে।

একটা তুচ্ছ অভ্যাসের কাছে, এইভাবে, রোজ কেন হেরে যেতে হবে? সুজাতা আসেনি বলে? পারমিতা চলে গেছে বলে? এখন আমার কিছু করার নেই বলে? কে সুজাতা? পারমিতাই বা কে, যে তাকে, তথাগত চক্রবর্তী নামের একজন রক্তমাংসের মানুষকে, এইভাবে ধীরে ধীরে....। রমণীস্বভাব আসলে কী? আমি যা চাই তা আমায় এনে দিতে হবে, ব্যস? আর কিছু নয়। না পেলেই, তুমি খারাপ, তোমার চোদ্দপুরুষ ফালতু...। একটানা চোদ্দটা বছর ধরে তাকে কী দিয়েছে পারমিতা? না সন্তান, না সাহচর্য, শুধু অপমান তিরস্কার আর গ্লানি ছাড়া? অথচ কী ছিল পারমিতা বিয়ের আগে, তথাগতর প্রেমে পড়ার আগে? কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে, পারিবারিক বিপর্যয়ের চাপে, বাড়ির ছাতে বসে হাঁটু অবধি মাথার চুল ছড়িয়ে, শুধু সারাদিন আকাশ-দেখা ছাড়া, আর কী করত? পাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে বেড়াতে না গেলে...। সকলের ভিড়ের মধ্যে, কেমন যেন হারিয়ে যাওয়া চোখে, অত লোকের মধ্যে একমাত্র তথাগতকেই প্রশ্ন করেছিল পারমিতা— লেডিজ টয়লেট কোথায় আছে বলতে পারেন? তথাগত তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু তাকিয়ে আছে দেখে পারমিতা শুধু বলেছিল 'ও, আপনিও'...। তথাগত সম্বিত ফিরে পেয়ে বলেছিল— চলুন। ও জিনিসটা যে কোনও লেডিজ হোস্টেলেই আছে। তবে মনে হচ্ছে আপনি এখানে নতুন। চট্‌ করে খুঁজে পাবেন না। আর, প্রশ্নটা কোনও মহিলাকে করলেই তো পারতেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তথাগতর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে দিয়ে পারমিতা বলেছিল 'আপনি পুরুষ কি না আমি এখনও জানি না। দেখতে তো মেয়েদের মতো! তবে, হঠাৎ আপনাকে, কেমন-যেন মানুষ মনে হল।'

সেই শুরু। তথাগত গোঁফ দাড়ি রাখে না কোনওদিনই। পাতলা ছিপছিপে চেহারায় পানপাতার মতো মুখ বলে তাকে সেই ছোট্ট বেলা থেকে অনেকেই 'মেয়েদের মতো' বলে এসেছে। যথেষ্ট পুরুষ হয়ে উঠতে গেলে কী কী করতে হয় তথাগত ঠিক ঠিক জানে না। তবে, সেদিন যে তোলপাড় তার মধ্যে তক্ষুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল—তাকে বোধহয় ....সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ....এরকমই বলা হয়ে থাকে। লেডিজ হোস্টেলের টয়লেট থেকে বেরিয়ে পারমিতা কীরকম যেন সঙ্গে জুড়ে গেল। ততক্ষণে নিজের বন্ধুদের হারিয়ে ফেলেছে তথাগত। পারমিতাও যার সঙ্গে গিয়েছিল তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। তথাগতই বলেছিল— 'খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। চলুন আমরা এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকি। ওরাই আমাদের খুঁজে নেবে।' চুপ করে অবশ্য বসে থাকেনি কেউই। বাড়ি কোথায়, ক ভাইবোন, তথাগত অভ্যাসবশত এসব দু-একটা টুকটাক প্রশ্ন করতেই পারমিতা আবার কপিল দেবের মতো ছয় মারল একটা, 'আপনি তো আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছেন? সেটা ও-ভাবে হয় না।' তথাগত বোকার মতো তাকিয়ে আছে দেখে পারমিতা আবার বলল! 'আসলে ডেটা-কালেকশন করে রিলেশনশিপ হয় না, জানেন তো? ওটার জন্যে যে কোনও

রকম একটা নীড ফুলফিলমেন্ট দরকার।'

তথাগত তারপর থেকে পারমিতাকে ছেড়ে যেতে পারেনি।

কলকাতায় ফিরে জোর করে কলেজে ভর্তি করিয়ে সোসিওলজিতে এম-এ পাশ করানো পর্যন্ত রোজ দেখা করেছে। ইউনিভার্সিটি হস্টেলে তথাগতকে আসতে দেখে পারমিতার বন্ধুরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত।....

জীবনে একটাই চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করেছিল পারমিতা। টেলিফোন ভবনের চাকরিটা তাতেই পেয়ে যায়। ....আর তার পর থেকেই নিজের মানসিক জগৎ থেকে তথাগতকে কেমন যেন মুছে দিল পারমিতা।...মর্নিং শিফট্ ইভনিং শিফট্ নাইট, বাপের বাড়ি, জিনিস কেনা, মেজাজ দেখানো, এইসব দিকে চলে গেল।.....এমনিতেই নিজের রান্নাঘরে কাউকেই ঢুকতে পর্যন্ত দিত না। তথাগতকে রান্নাটা শেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অবশ্য। লাভ হয়নি। সন্তানের জন্য তথাগতকে ডাক্তারের কাছে পাঠাত বার বার, তার অপরাধ সে মাঝে মধ্যে উদোম নেশা করে ফেলে।

অথচ তথাগত পরে জেনেছে পারমিতারই ছোট্ট একটা অপারেশন করিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল, যা করা হয়নি শেষ অবধি! নিজেকে চেক-আপ করাবার প্রশ্ন উঠলেই পারমিতা বলত আমার সবকিছু ঠিক আছে। এবং সব দোষ তথাগতর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে অফিস কিংবা রান্নাঘর কিংবা বাপের বাড়ির দিতে চলে যেত!

নাঃ। আজ কিছুতেই মদ খাব না। মেট্রোর উল্টোদিকের ফুটপাতে প্যান্টের দু-পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তথাগত। ওখানে তো সেই তুষার-পিনাকী-নির্মল-অনিন্দ্যরা জমিয়ে বসে আছে, রোজই থাকে, গেলেই দেখা হবে। আয় আয় বলে ওয়েলকাম জানাবে সবাই তথাগতকে দেখলেই। তারপর কী কী হবে সব যেন এখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল তথাগত। ও রুটিনটা একদম মুখস্ত হয়ে গেছে। আজ কেন যেন ওসব একদম ভাল লাগছে না।

সুজাতার গল্পটা অবশ্য উল্টো। পারমিতাকে যতটা মাথায় তুলেছিল তথাগত, সুজাতাকে ঠিক ততটাই পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিল সুমঙ্গল।

ট্যাক্সিতে একদিন বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় সুজাতা বলছিল আমাদের বাড়ির ড্রাইভার ওর চেয়ে বেশি মাইনে পেত। সেন্ জুয়েলারির মালিকের একমাত্র ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল।....সেই সুমঙ্গল যখন তরকারিতে নুন বেশি হয়েছে বলে আমাকে।.....শ্বশুড়-শাশুড়ি-দেওর-ননদ সবায়ের সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে....। এদিকে বাড়িতে একটা রান্নার গ্যাস পর্যন্ত নেই.....কয়লার উনুন আমি জীবনে চোখে দেখিনি....। শুধু সুমঙ্গলকে ভালবেসে সব মেনে নিয়েছিলাম আমি।

পারমিতারও হয়তো ঠিক এইভাবেই কাউকে বলবে....সবকিছু আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে শুধু খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে থাকবে—এ কী? আমার কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, অথচ রাত-দুপুরে পাঁচ-ছজন মাতাল ধরে এনে

বলবে রান্না করো। আমার হুকুম। এরা খাবে।....শুধু বন্ধু নয়, মাঝে মাঝে বান্ধবীদেরও বাড়িতে নিয়ে আসবে আর ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে গ্যাঁজাবে আর আমি ওদের....।

সুনীল গাঙ্গুলির কবিতাই তাহলে জীবনের শেষ সত্যি? 'ভালোবাসা চলে যায় এক মাস সতেরো দিন পরে?'...যদি চলেই যায়, তাহলে থাকে কী? ...'অভ্যাস অভ্যাস লিলি, তাই কাছে আসি, অভ্যাস অভ্যাস লিলি, তাই ভালোবাসি!'

পারমিতার সেই সোসিওলজি:

নীড়--ফুলফিলমেন্ট....? শুধু প্রয়োজন? আর কিছু নয়?

আরে চক্রবর্তী, ভরসন্ধেবেলা এখানে দাঁড়িয়ে? এনি নিউ কেস?

এসট্যাবলিশমেন্টের চৌধুরী। তথাগত ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। এই জায়গাটা আসলে এত বিচ্ছিরি! চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কোনও চেনা লোকের সামনে পড়ে গেলে সত্যি কিছু করার থাকে না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তথাগতকে সংক্ষেপে বলল— হ্যাঁ, একজন আসার কথা ছিল।

সুকান্ত চৌধুরী কিছু বলার আগেই একটা সিন্‌থেটিক শাড়ি পরা বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে একদম তথাগতর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল—একটু ফুচকা খাওয়ান তো। অনেকদিন খাইনি!

ফুচকাওয়ালা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুযোগ পেয়েই সে বেশ তৎপর হয়ে উঠল। ....আইয়ে মা-জী, আইয়ে।.....মেয়েটি তখনও তথাগতর দিকে খেলুড়ে চোখে চেয়ে আছে। তথাগত বলল— খেয়ে নিন। আমি দাম দিয়ে দেব...। কোনও বাক্যব্যয় না করে মেয়েটি প্রায় নাচতে নাচতে ফুচকাওয়ালার দিকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে আরও তিন-চারটি মেয়ে ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে ধরল প্রায়।

সুকান্ত চৌধুরী হঠাৎ আচ্ছা আসি, কাল অফিসে দেখা হবে বলতে বলতে পালিয়ে গেল।....

তথাগত আর একটা সিগারেট ধরাল।.....এই সুকান্ত চৌধুরীও অ্যানাদার ভিকটিম অফ কনজুগাল ফেলিওর। ও অবশ্য আবার বিয়ে করেছে। এই বউটা ওরই ছাত্রী ছিল। ভালখারাপ এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে আগের বউটা, একমাত্র ছেলেটা থ্যালাসেমিয়ায় মারা যাবার দিন পনেরোর মধ্যে একটা মস্তান জুয়ারি ছেলের হাত ধরে পুরী চলে গেল....সুকান্ত ব্যাংকে গিয়ে জেনেছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার জয়েন্ট ফিক্সড ডিপোজিট ফাঁকা.....ম্যানেজার বলেছিল—বৌদি তো কবে তুলে নিয়ে গেছেন...। সুকান্ত বলে মেয়েরা ভাল হলে এত ভাল হয়, তার যেমন কোনও জবাব হয় না, তেমনই, মেয়েরা নীচে নামলে এত নীচে নামতে পারে তারও কোনও তুলনা হয় না।....

ধর্মতলার, সন্ধেবেলার, তাৎক্ষণিক সুজাতারা ফুচকা খেয়ে কলকল খলবল করতে করতে চলে গেল। তথাগত ফুচকাওয়ালার কাছে এগিয়ে যেত ফুচকাওয়ালা বলল

সতেরো টাকা।

তথাগতর একবারও মনে হল না অপচয় হচ্ছে। পারমিতা চলে যাবার পর কিন্তু মনে হয়েছিল, জীবনের অনেকগুলো-বছর খুব ভুল ভাবে খরচ হয়ে গেল....

সুজাতার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকেও তো জীবনের অনেকখানি আধ্যাত্মিক অপচয় হয়ে গেল। আজ।....

সুজাতার জন্যে তথাগত কতখানি কষ্ট পায়, সে কথা, সুজাতা ছাড়া বোধহয় আর সবাই সঠিকভাবে বুঝতে পারবে।...

সুজাতারা, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে আজকাল।....

পরের দিন, কোর্টে, এক কথায় পারমিতাকে ডিভোর্সটা দিয়ে দেবে তথাগত।....আগের দিন, ডেট পিছিয়ে দেওয়াতে গম্ভীরভাবে বাইরে বেরিয়ে ফুটপাথে বসে পড়েছিল পারমিতা...হাতের ব্যাগ, কাগজপত্র, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল....কেন তুমি ডেট নিচ্ছ বার বার ? কেন ? সেই দৃশ্য তথাগত ভুলে যেতে চায়।.... একদিন, অনেক অনেক দিন আগে, অন্য এক জন্মে, অন্য এক জীবনে, একজন সুজাতা, একজন তথাগতকে, নিবেদন করেছিল পরমান্ন। সে জীবনে, নির্বাণের দিকে চলে গিয়ে, ভুল, খুব ভুল হয়েছিল। তারপর থেকে, বিভিন্ন সুজাতারা, বিভিন্ন তথাগতদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, যুগ-যুগান্তর ধরে।...

এখন, এই জন্মে তথাগত, এই রক্তমাংসের জীবনেই, নিজেকে অন্তত, নিখুঁত পরমান্ন করে তুলতে চায়।...

বাকি জীবন, তথাগত সেই সাধনায়, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।...

আশা ভরসা

তোমার কি ভয় করছে?

পর্দা ঢাকা কেবিনের মধ্যে সামনে খাবার নিয়ে কাঠ হয়ে বসে ছিল বীরা। কোনো উত্তর দিল না দেখে সুমিত আবার বলল, 'যদি হ্যাঁ বল, তাহলে...' আর যদি না বল, সব দায়িত্ব আমার।'

বীরা এবারও কিছু বলল না।

'খেয়ে নাও', বলে নিজের প্লেটটা টেনে নিল সুমিত। বীরা একইভাবে বসে আছে দেখে বলল, 'রেস্টুরেন্ট সারারাত খোলা থাকবে না।'

তবু বীরা একইভাবে বসে রইল। অপেক্ষা না করে সুমিত খেতে শুরু করে দিল। বীরাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে কিছু একটা বলতেই হয়। নির্লজ্জের মতো একা একা খেয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। সুমিত বলল, 'হস্টেলে ফিরতে পারবে না বলে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে?'

এবার বীরা তার বড় বড় চোখ দুটো এক পলক তুলেই আবার নামিয়ে নিয়ে আস্তে করে বলল, 'না।'

'সিনেমাটা ভাল ছিল না বলে অনুতাপ হচ্ছে? সময় নষ্ট হল মনে হচ্ছে?'

'না।'

হস্টেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সন্ধে আটটায়। এখন সাড়ে ন'টা বাজে। এত রাত্রে হঠাৎ বাড়িতেও যাওয়া যাবে না। সুমিত নির্বিকারভাবে খেয়ে যাচ্ছে দেখে বীরা কোনরকমে বলেই ফেলল, 'আমি কোথায় থাকব?'

হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে সুমিত স্পষ্ট করে তাকাল বীরার দিকে। 'আমার ওপর ভরসা হচ্ছে না?'

বীরা সোজা হয়ে বসল, 'তা নয়?'— তারপর দুম করে বলল, 'আমি হোটেল ফোটেলে থাকব না!'

'আমি তো সে কথা বলি নি।' মুর্গির মাংসে কামড় বসিয়ে সুমিত বলল, 'হোটেলের কথা তোমার মাথায় এল কেন?'

'তাহলে কোথায় থাকব?'

'এখন সে কথা ভাবছি না। আগে তো খাও। এখান থেকে বেরিয়ে ভাবা যাবে।'

খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে বীরা বলল, 'আমি এভাবে পারি না।'

সুমিত বলল, 'শুধু তুমি কেন, সব মেয়েরাই এই রকম। সবকিছু তারা আগেভাগে

পরিষ্কার করে জানতে চায়।'

'না চাওয়ার কি আছে?'

'পৃথিবীতে সবই কি তোমাদের ইচ্ছে মত হবে?'

'তাই বলেছি নাকি!'

'সব কিছু আগে থেকে ঠিক করা মানে তো তাই।'

'মোটেই না। একটা প্ল্যান থাকবে না তা বলে'!'

'প্ল্যান করে কি সব হয়? যখন যা ইচ্ছে হবে তাই করবো এটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?'

'অস্বস্তি হয়।' বলে খেতে লাগল বীরা।

বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর মুখে চলে এল ওরা, সুমিত আর বীরা। রাত সোয়া দশটা। এক সময় বীরা বলেই ফেলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

রাস্তার উল্টো দিকে একটা শেয়ার ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর 'শ্যামবাজার শ্যামবাজার' বলে চেচাঁচ্ছে। অল্প দূরে যে মহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তাকে বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে সুমিত বলল, 'আমি জানি না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বীরা। তিন পা এগিয়ে গিয়ে সুমিতও দাঁড়ালো। 'কী হল?'

'ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে না?' বীরার হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা।

সুমিত নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল। শেষ হয়ে এলে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। পাশ দিয়ে যাবার সময় দু'একজন লোক তাদের দিকে তাকিয়ে গেল বিশ্রীভাবে। এক সময় সুমিত বলল, 'ছেলেমানুষি তুমি করছ বীরা, আমি না।'

বীরা হাঁটতে শুরু করল আবার। কিছুক্ষণ হাঁটার পর এয়ার লাইন্স বিল্ডিংয়ের কাছে এসে বীরা বলল, 'এই উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি, এটা রাত সাড়ে দশটার সময় না হয়ে বিকেলের দিকে হলেই ভাল হত।'

'এখন সময়টাকে বিকেল করে দেওয়ার কোন ম্যাজিক আমি জানি না।'

সামনে বৌবাজার। মেডিকেল কলেজ। বীরা বলল, 'তোমার উদ্দেশ্য কী?' সারারাত হাঁটা?

'না।' বলে আর একটা সিগারেট ধরালো সুমিত।

'আমার ঘুম পাচ্ছে।' বীরা বলল।

একটা হাই তুলে সুমিত বলল, 'আমারও।

'আমি ঘুমবো।'

'কোথায়? ফুটপাথে?' নির্বিকার উত্তর দিল সুমিত।

'তোমার কি তাই ইচ্ছে?'

'তুমিই তো বলেছিলে, আমার সঙ্গে ফুটপাথে থাকতেও তোমার আপত্তি নেই!'

'ওহ্, সেই জন্যে!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি'... এবার দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিত। 'তুমি আমার ওপর কতটা ভরসা কর, আমি জানতে চাই।'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'হোক।'

বীরা তার বড় বড় চোখ তুলে আর একবার সুমিতের দিকে পূর্ণাঙ্গ তাকাল। তারপর বলল, 'আমার সঙ্গে এস।'

'কোথায় ?' সুমিত জিজ্ঞেস করল, আস্তে।

'নিরুদ্দেশের পথে নয়।' বীরা বলল।

বৌবাজার থেকে ডান দিকে ঘুরে একটা গলির ভেতর ঢুকল বীরা। রাত প্রায় এগারটা। একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপল। সুমিত কোন কথা বলছে না।

মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আরে, তুমি। কী ব্যাপার ? এস কাকলিকে ডেকে দিচ্ছি।'

সুমিত দেখল, বেশ সাজানো একটা ড্রয়িং রুম। হাউস-কোট পরা একটা মেয়ে এসে বীরাকে কী সব বলছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে মেয়েটি সুমিতের দিকে ফিরে বলল, 'আমার নাম কাকলি। কাল সকালে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আপনার বালিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকের রাতটা সোফাতেই কাটিয়ে দিন। আমি বীরাকে নিয়ে গেলাম। চল্ বীরা। গুড নাইট।' সুমিত বসে রইল চুপচাপ।

একটু পরে একটা বাড়ির কাজের লোক এসে সুমিতকে বালিশ দিয়ে গেল। চলে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'লুঙ্গি লাগবে নাকি, দাদাবাবু ? আমার একখান আছে, কাচা।'

সুমিত বলল, 'নাঃ। তুমি যাও। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

নিজের বাড়িতে হলে ন'টার আগে বিছানা ছেড়ে উঠত না সুমিত। এখানে বেশ ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল। অপরিচিত ঘর, অস্বস্তিকর সোফা। ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে সুমিত। আজ থাকল না। এবং উঠে বসেই বুঝতে পারল, এ বাড়িতে সকাল হয় বেশ বেলায়। চায়ের জন্য একটা তীব্র পিপাসা অনুভব করল সুমিত। অথচ কোন উপায় নেই। জানলার বাইরে গলির মধ্যে জীবনের স্পন্দন। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়া যায়। সেটা কি ঠিক হবে ? বীরার বন্ধুর বাড়ি এটা। অবিবেচকের মতো কিছু করে ফেলাটা খারাপ দেখাবে।

রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিল সুমিত। এত ভোরে অনেক দিন ওঠা হয় না। খবরের কাগজের হকার জানলা দিয়ে কাগজ দিয়ে গেল। কাগজটা তুলে নিয়ে প্রথমেই সুমিতের মনে হল জানলাটা যদি না খুলতাম তাহলে কাগজটা দিত কোথায় ? যাই হোক, আপাততঃ সময় কাটানোর কোনো সমস্যা নেই। মন্ত্রীদের ইস্তফা, উগ্রপন্থীদের আক্রমণ, এসব নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যাবে। সুমিত একটা

সিগারেট ধরিয়ে কাগজটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। অন্য দিন হলে শুধু হেড লাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দিত।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে বীরা একেবারে সুমিতের সামনে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'নাও, তোমার চা।'

মুগ্ধ হয়ে গেল সুমিত। মুহূর্তের জন্যে হলেও তার মনে হল এটা তার নিজের বাড়ি। রোজকার মত সকালে উঠে কাগজ পড়ছে। আটপৌরে একটা শাড়ি পরে বীরা চা দিয়ে গেল। যেন তার অনেককালের বাসি বৌ।

'কি, মাঝরাতে কলকাতার রাস্তায় হাঁটাহাঁটির চেয়ে বেশি ভালো লাগছে না?'

সুমিত চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। কাগজটাও সরিয়ে রাখল এক পাশে। বুঝতে পেরে বীরা একটু দূরে সরে এসে বলল, 'লোভী, সুযোগসন্ধানী।'

সুমিত বলল, 'খারাপ কি!'

কয়েকদিন পরে অফিসে কাজ করছিল সুমিত, টেলিফোনের কাছ থেকে সৌগত দত্ত চেঁচিয়ে বলল, 'সুমিতবাবু, আপনার ফোন।'

বিকেলের দিকে মাথাটা বেশ ধরে আসে। এমনিতেই বেশ দমবন্ধ ভাব লাগছিল। ফোনটা পেয়ে প্রায় নাচতে নাচতে গিয়ে সুমিত উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'হ্যালো।'

'কেমন আছেন?'

কিন্তু, বীরার গলা তো নয়!

'ভাল।'

'আমি কে কথা বলছি বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না'— বলাটা কি ভালো দেখাবে? কথা বলতে বলতে এমনিতেই কি বেরিয়ে পড়বে না পরিচয়টা?

'কেমন আছেন, ভালো তো?'

'সেদিন আপনি কিছু খেয়ে গেলেন না, রাত্রে তো খেয়েদেয়েই এসেছিলেন, সকালেও এমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন—'

সুমিত নিশ্চিন্ত হল; কাকলি, বীরার বন্ধু।

'একদিন বেশ ভাল করে খাওয়াবেন মনে হচ্ছে।'

'খাওয়াবই তো।'

'কবে?'

'আজকেই যদি হয়? অসুবিধে আছে?'

'আজ তো... বীরার সঙ্গে দেখা হবে কিনা ঠিক নেই—'

'নাই বা হল, একা এলে বাড়ি চিনতে পারবেন না? সাতের এগারো...'

'না না, তা নয়; বাড়ি চিনতে পারবো না কেন?'

'আসছেন তাহলে? এই ধরুন, ছ'টার মধ্যে...'

'আচ্ছা।'

'রাখছি।' বলেই রেখে দিল কাকলি।

সুমিত বেশ ভ্রূকুঞ্চিত অবস্থায় নিজের চেয়ারে ফিরে এল। কাকলির উদ্দেশ্য কি? পরীক্ষার কারণে বীরা বেশি দেখা করছে না আজকাল। কিন্তু হঠাৎ আলাদা ডেকে খাওয়াতে চাইছে কেন? টেলিফোন নাম্বার নিশ্চয়ই বীরা দিয়েছে!

ছুটির আগে পর্যন্ত সময়টা ফুর ফুর করে কেটে গেল। অন্য দিন যে সময়টা মাথা ভার হয়ে আসে, সারা পৃথিবীর ওপর বিজাতীয় রাগ হতে থাকে এক ধরনের, মাথা ধরা কাটানোর জন্যে ঘন ঘন চা খেয়ে আর সিগারেট ফুঁকে শরীরটা অবসন্ন লাগে আরও, আজ সেই সময়টা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ সেরে রাখলো সুমিত। ছুটির পর ভাল করে চোখ মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে অফিসের বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমিত ঠিক করল— হেঁটে যাওয়াই ভাল। বৌবাজার এমন কিছু দূর নয়। এইটুকু পথ যাওয়ার জন্যে ভিড় বাসে গাদাগাদি করে ঠেলাঠেলি সহ্য করে ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হওয়ার কোন দরকার নেই।

তাছাড়া, এমন কিছু তাড়াও নেই তার আজ। আজ কেউ তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। বাড়িতেই থাকবে।

বৌবাজারের মোড়ে এসে সেই জায়গাটায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল সুমিত, যেখানে দাঁড়িয়ে রাত প্রায় এগারটায় বীরাকে সেদিন চেপে ধরেছিল সে। তুমি আমার ওপর আসলে ঠিক কতখানি ভরসা কর...। সেদিন জানা হল না কিছুই, এভাবে কি কিছু জানা যায়? আজ এই সন্ধ্যাপূর্বের ব্যস্ত ভিড়ের রাস্তায় সেদিনের রাতের কোন পরিমণ্ডল খুঁজে পেল না সুমিত।

বেল বাজাতে কাকলিই দরজা খুলে দিল। চুল খোলা, হাউস-কোট পরা কাকলি স্মিত মুখে বলল, 'আসুন।'

সেই বসবার ঘর, সেই সোফা। ঘুম থেকে উঠে এই ঘরেই জানলা খুলে দিয়েছিল সুমিত! কাগজ দিয়ে গিয়েছিল কাগজওলা। বীরা চা নিয়ে এসেছিল। তখন যেন অন্য রকম ছিল ঘরটা। আজ কেমন ঠাণ্ডা, ভদ্র, শীতল। কাকলি বলল, 'বসুন।' সুমিত সোফায় বসল। অল্প দূরের একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল কাকলি। এতদূর থেকে কথা বলতে হবে? খুব সাজানো হবে না কি, সে সব কথা? কাকলির হাওয়াই চটি পরা পা বেশ গোলমাল, কিন্তু ফর্সা নয়। কাকলি বীরার চেয়ে বেশ কালোই। তবে চোখ দুটো বীরার মত শান্ত নয়, বেশ চঞ্চল, দুষ্টুমিতে ভরা। মাথায় বীরার চেয়ে লম্বা, তবে শীর্ণ নয়; হাউস-কোটের হাতা কনুই পর্যন্ত বলে শরীরের গড়ন কিছু বোঝা যাচ্ছে না ভালো করে। কয়েকগাছি চুল সামনের দিকে টেনে নিয়ে খেলা করতে বলল, 'অবাক লাগছে? হঠাৎ ফোন করে—'

সুমিত এগিয়ে এসে বলল, 'না না, অবাক হবার কি আছে?'

'বীরার সঙ্গে এখন আপনার অনেকদিন দেখা হবে না।' মাথা নিচু করে চুল নিয়ে খেলা করছে কাকলি।

'সে তো জানি। ফাইনাল পরীক্ষা।' একটা সিগারেট বের করল সুমিত।

'পরীক্ষা এ মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।' কাকলি ভাঙলো না বেশি।

সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও ধরালো না সুমিত। কিন্তু একটা গোলমালের গন্ধ। কলকাতায় একজন আত্মীয়ের বাড়ি থাকলেও বীরাদের আসল বাড়ি খড়গপুর থেকে দীঘার দিকে দুঘণ্টার রাস্তা। আত্মীয় বাড়িতে থাকার চেয়ে হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনার সুবিধে বলে বীরা হোস্টেলেই থাকে। পরীক্ষার পর হঠাৎ বাড়ি চলে গেল বীরাকে খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। বাড়ির গল্প অবশ্য অনেকে বলেছে বীরা, কিন্তু অতদূরে গিয়ে সুবিধে করে ওঠা খুবই কঠিন ব্যাপার নয় কি!

'আপনাকে ও কিছু বলেছে?' শেষ পর্যন্ত সিগারেটটা ধরালো সুমিত। হাতের কাঠিটা ফেলতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাল।

'অ্যাশট্রে দিচ্ছি', বলে কাকলি কাঁচের পাল্লা দেওয়া দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা ভারি সুন্দর চীনেমাটির আশট্রে বের করে দিল। আবার আগের জায়গায় বসে হাউস কোটের পকেট থেকে চিরুনি বের করে কোণের কাছে কয়েক গোছ চুল নিয়ে জট ছাড়াতে লাগল।

'আপনাকে ও কিছু বলেছে?' সুমিত আবার বলল।

ট্রেতে করে সুদৃশ্য লম্বা লম্বা কাচের গ্লাসে ফলের রস নিয়ে ঘরে ঢুকলো সেই লোকটা যে তাকে লুঙ্গি দিতে চেয়েছিল। সুমিতের সামনে সেণ্টার টেবিলে একটা গেলাস রেখে এক গাল হাসল। 'খাইয়া লন দাদাবাবু।' বলল। কাকলির গেলাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। কে জানে কেন, লোকটাকে একটুও ভাল লাগল না সুমিতের। লোকটার চেহারার সঙ্গে তার নিজের বাবার কোথায় যেন একটা মিল আছে!

'মদ নয় কিন্তু, ফলের রস।' ঠোঁট কামড়ালো কাকলি।

'বীরা সব কথাই বলেছে দেখছি।' সিগারেটটা হাতে নিয়ে তা থেকে ধোঁয়া উড়ে যাওয়া দেখছিল সুমিত।

বস্তুতঃ জীবনে যতদূর এগিয়েছে সুমিত, ততদূর আসতে পারা তার পক্ষে আশাতীত। মধ্যমগ্রাম বাজারে সুমিতের বাবার ফলের দোকান; জমিজমা যৎসামান্য। জবর দখলের জায়গার ওপরে দরমার বেড়ার বাড়ি সুমিত চাকরি পাওয়ার পর পাকা হয়েছে, তাও ছাদ এখনও টালির। কলকাতায় সুমিত মেসে থাকে। বাড়ি যেতে বাস্তবিক তার তেমন ইচ্ছে করে না। তার চেহারার সঙ্গে ভাইবোনদের আকাশপাতাল তফাত। খাটো ময়লা ধুতি পরা বাবা যখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরে তখন তাকে দেখে...। বরাবর ফ্রিশিপ পেয়ে স্কুলের গণ্ডি পেরোবার পর কলেজে ভর্তি হবার সময় বাবা বলেছিল— 'অত খরচ...। তার চেয়ে বাজারের মোড়ে জায়গা দেখে একটা পানের দোকান দিতে পারলে...।' রাতারাতি বাড়ি থেকে পালিয়েছিল সুমিত। সেসব দিনের কথা মনে পড়লে আজও গলার কাছটা কেমন যেন করে ওঠে। একটা শ্মশানে পুরো এক মাস ছিল সুমিত এক সাধুর আখড়ায়। সেখানকার এক ভক্তই তাকে শেষ পর্যন্ত কলকাতার কলেজে....। ক্লাস আর টিউশনি- সেই সঙ্গে চারপাশের নির্মম স্মার্টনেসের সঙ্গে পাল্লা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা...। মদ

খাওয়াবার বন্ধু যত বেশি জোটে, ভাত খাওয়াবার বন্ধু তত কম।... কলেজ থেকে বেরোবার আগেই সে যে একটা চাকরি পেয়ে যাবে কে জানতো! পরীক্ষাটা কি সহজ যে ছিল! সঙ্গে আর যারা তার সঙ্গে সেই চাকরির পরীক্ষায় বসেছিল তারা সবাই প্রায় বয়সে অনেক বড়। এত ছেলে একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে এসেছে দেখে সে ধরেই নিয়েছিল— চাকরি পাওয়ার কোন আশাই নেই। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই পাশ থেকে একজন ঢ্যাঙা মতন লোক যখন বলল, 'চলন্তিকা কার লেখা ভাই? রবীন্দ্রনাথের, না?' তখন থেকে পুরো আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেল সুমিত। তাছাড়া অঙ্কে সে বরাবরই একশো পায়। মাস ছয়েকের মধ্যেই মোটা চিঠি। বাড়িতে প্রথমে কিছু জানায়নি সুমিত। যোগাযোগ রাখত শুধু চিঠি দিয়ে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে যখন বাড়ি গেল...।

'লজ্জা পাবার কিছু নেই।' রঙিন ফলের রসের লম্বা গেলাস তুলে নিল কাকলি।

'লজ্জা?' বলে ম্লান হাসল সুমিত। ফুরিয়ে আসা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। 'কিন্তু, আপনি আমাকে ডাকলেন কেন বললেন না তো।'

'ওটা খাবেন না?'

বাধ্য ছেলের মত গেলাসটা তুলল সুমিত। এসব বাড়িতে এক চুমুকে গেলাস শেষ করে ফেলতে নেই, সুমিত জানে। বেশ কয়েক বছর কলকাতায় ওঠবোস করতে করতে অনেককিছু জেনেছে সে, শিখেছে। আস্তে আস্তে গেলাসটা খালি করছিল সে, ধীরে সুস্থে, রসিয়ে রসিয়ে।

'আপনি মদ খান কেন?'

'উঁ?' প্রায় যেন ঘুম থেকে উঠল সুমিত।

'শুনতে পাননি, আমি কী বললাম?'

'পেয়েছি।' গেলাসটা নামিয়ে রাখল সুমিত। কী বলা যায় কাকলিকে? মদে যে ঘোর আছে; চারপাশের সব আলো এক হয়ে গিয়ে যে চমৎকার ভাসমানতা একমাত্র মদই এনে দিতে পারে তার সর্বনেশে স্বাদ—মুখের ভাষায় কতটুকু বোঝানো যাবে কাকলিকে! মদ আর ঈশ্বরভাবালুতা- মানুষ নিঃস্ব হলে এ দুটোর একটা বেছে নেয়। অবশ্য ব্যতিক্রমও স্বাভাবিক খুবই।

সুমিত একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'এসব কথা জানবার জন্যে...'

'আপনাকে ডাকিনি।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকলি বলল। 'আপনার আজ খাওয়ার নেমন্তন্ন। কিন্তু সে তো অনেক দেরি। ততক্ষণ গল্প করতে হবে তো।'

'আর কোনো গল্প নেই?

'হ্যাঁ, আছে। আপনাকে একটা খবর দেবার আছে। এমনিতে সুসংবাদ, তবে আপনার পক্ষে বিশেষ ধরণের দুঃসংবাদ আর কি!'

সুমিত খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে কাকলির দিকে চেয়ে থাকে। খুব সন্তর্পণে শেষ করে হাতের গেলাসটা। তারপর বলে, 'কী সেটা?'

'বীরার বিয়ে।' দুম করে বলে ফেলে কাকলি।

ভুরু তুলে তীব্রভাবে কাকলির দিকে তাকালো সুমিত। কোনরকমে বলল, 'আমাকে তো কিছু....'

'বলেনি। বলতে পারেনি।' বাঁ-পায়ের ওপর ডান-পা তুলে বসে কাকলি।

সুমিত কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে। কাকলি দেখে, তার মুখে আঘাতের চেয়ে ক্রোধের চিহ্ন বেশি।

'আমি একটু বেরোবো।' উঠে দাঁড়ায় সুমিত।

'কোথায় যাবেন? বীরার কলেজে তো? এখন সাড়ে ছ'টা বাজে, যেতে যেতে আটটা বেজে যাবে। তাছাড়া, গিয়ে কোনো লাভ হবে না। কিছুই স্বীকার করবে না বীরা— বলবে, ওসব বাজে কথা। আমাকেও বলতে চাইছিল না। অনেক রাতে, সেদিন আমরা গল্প করেছি দু'জনে অনেক রাত অব্দি- অনেক রাতে, আমাকে বলে ফেলেছে। পরীক্ষার পর বাড়ি যাবে, আর ফিরবে না। সব ঠিক করা আছে অনেকদিন থেকে।'

'আমাকে বলতে পারত।'

'দুঃখ পাবেন অযথা। তাই...আপনার কাছে সিগারেট আছে আর? একটা দিন তো।'

বেশ অবাক হয় সুমিত। কাকলি সিগারেট খায়? অবশ্য, এরকম বাড়ি, এরকম বসবার ঘর, খেতেই পারে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল সুমিত। কাকলি সেটা ঠোঁটে লাগিয়ে সুমিতের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ধরিয়ে দিন।'

এরকম অভিজ্ঞতা সুমিতের আগে কখনো হয়নি। খুব দ্রুত সে দেশলাই জ্বেলে কাকলির মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা বাঁ-হাতে নিয়ে কাকলি বলল, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমি এমনিতে স্মোক করি না। হঠাৎ ইচ্ছে হলে খাই।... আমার যখন যা ইচ্ছে হয় করি।... সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় চলি আমি। ... মা-বাবার একমাত্র সন্তান বলে কেউ বাধা দেয় না!'

মুহূর্তের জন্যে মধ্যমগ্রামে নিজেদের বাড়ির কথা মনে হল সুমিতের। মাথা নিচু করে নিজের জন্যে আর একটা সিগারেট বের করল।

'একদিন আপনার ছোট বেলার গল্প শুনব। বীরা বলছিল আপনার খুব কষ্টের জীবন। ...এক্ষুনি বিয়ে করারও অনেক অসুবিধে, মেস ছেড়ে ফ্ল্যাট দেখতে হবে— নিজের বাড়ির লোকদের দিকেও নজর দিতে পারবেন না ভাল করে—'

'সেই জন্যেই কি...' কথা আটকে যাচ্ছিল সুমিতের।

'ওর কথা যাক। এই একদল আছে, প্রেম করার বেলা আমি আর বিয়ের বেলা বাবা... ধুৎ! আর ছেলেদের ওপর এত চাপ দেবারই বা কি আছে। যা দরকার নিজে জোগাড় করে নিলেই তো হয়। বাবা তো আমাকে এখনই গল্‌ফ্ গ্রীনে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে, ওয়েল ফার্নিশ্‌ড্— যদি কোনোদিন বিয়ে করি—'

'যদি মানে?'

'এমনিতে আমার ইচ্ছে করে না! ছেলেদের এত বায়না! বিয়ের আগে অনেক ভাল ভাল কথা বলে বিয়ের পরেই তারা একটা নিখরচার ঝি পেয়েছি মনে করে— আবার একই সঙ্গে উর্বশী চাই- তখন হাতে দাগ থাকলে চলবে না!'

'বাঃ, বেশ বলছেন।'

এই আড্ডায় সন্ধেটা প্রায় উড়ে গেল সুমিতের। কাকলির মা-বাবাকে খুব ভাল লাগল তার। এক টেবিলে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বিদায় নিয়ে যখন চলে আসবে সুমিত, হঠাৎ সেই কাজের লোকটা এসে বলল, 'দাদাবাবু, আপনার ফোন...।'

সম্পূর্ণ নতুন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সুমিত। কাকলির বাড়িতে তার ফোন শুনেই সুমিত বুঝতে পারল, বীরা। আর, বিয়ের কথাটা সম্পূর্ণ সাজানো। তার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে বীরাই নিশ্চয় কাকলিকে বলতে বলেছিল। ইস্, কাকলি কি সব বলে দেবে? ইতিমধ্যে কাকলির বাড়িতে মাঝে মাঝে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছে সে। এবং বীরার সঙ্গে কোনদিন দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাকেও তেমন গুরুত্ব দিতে পারেনি।

কাকলি অন্যরকম গলায় বলল, 'আসুন।'

বধ্যভূমিতে যাবার ভঙ্গিতে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল সুমিত।

'সাতাশ তারিখে পরীক্ষা শেষ হচ্ছে। আটাশ তারিখে তুমি একটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম আনবে...'

আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল বীরা। সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না সুমিত।

শূন্যতার স্বভাব

জানো, কাল বিকেলে, রঞ্জনের মা মারা গেল। শেষবার, বোধহয় মাসখানেক কি মাসদেড়েক আগে, রঞ্জনের মা-কে তুমি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে, মনে পড়ে? পি-জিতে, না অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চে? ঠিক খেয়াল নেই; আমি তো যাইনি সঙ্গে। আগের দিন সন্ধেবেলা, দেবুর দোকানে আড্ডা দিচ্ছি এলোমেলো— মোহন আর রঞ্জন কেমন পাংশু মুখে এসে দাঁড়াল; নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় গম্ভীরভাবে কীসের যেন আলোচনা করছিল ওরা, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে; ভেতরে আসছিল না। কিছু একটা হয়েছে মনে করে আমি বেরিয়ে আসতেই মোহন বলল— সারা উত্তরপাড়ায় একটা কম্পাউন্ডার পাওয়া গেল না। বললাম— কেন, কম্পাউণ্ডার দিয়ে কী হবে?

—আরে, রঞ্জনের মাকে কাল সকালে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে এট্টু। সব ঠিক করে ফেলেছি, অ্যামবুলেন্স ফ্যাম্বুলেন্স। শুধু— ইয়ে, মানে রঞ্জন বলছে, পথে যদি কিছু হয়, সঙ্গে একজন কম্পাউন্ডার অন্তত থাকলে, মানে—

—কেন, তোমার বৌদিকে বলো না।

মোহনের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেলি। রঞ্জন গম্ভীর। ও প্রায়ই এসে তোমার সঙ্গে ওর মায়ের অসুস্থতা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করত না? বোধহয় স্বস্তি পেত। আমি সব কথা, কানে গেলেও, ঠিক শুনতাম না। রেনাল ফেলিওর, কিডনি ড্যামেজ, হাত-পা ফুলে যাওয়া, হার্ট উইক, আই সাইট কমে যাচ্ছে, ব্লাডে ইউরিয়া বেড়ে গেছে— ফলত নানাবিধ পাগলামি— সে অনেক ব্যাপার। আমার ভাল লাগত না একদম। আর তুমি যেহেতু একজন মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার নার্স, যেন তোমার এসব কথায় একচেটিয়া অধিকার— এইভাবে কী ক্যাজুয়ালি রঞ্জনকে বোঝাতে— এরকম হলে তো এরকম হবেই, এতে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। বয়স হলে তো রোগবালাই হতেই পারে— বাড়াবাড়ি হলে একটু খরচের ব্যাপার— এই যা। কী কী ওষুধ পড়ছে? রঞ্জনও গড় গড় করে বলে যেত—

সেসব গাদা গাদা ওষুধের নাম আমি কোনওদিন শুনতাম না। আর তুমি সেগুলো শুনে, এটা কেন দিল? ও আচ্ছা; তা বটে, এটা দিলে তো ওইটা দিতে হবে। এরকম কত কী বলে যেতে। যেন বিয়ে বাড়ি ফেরত দু-জন মানুষের বিভিন্ন মেনু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কোন খাবারের স্বাদটা কীরকম ছিল। কিছু মনে কোরো না, আমার ওরকমই লাগত।

—বৌদিকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে ? রঞ্জনের উদ্‌গ্রীব অথচ সংযত, স্বাভাবিক অথচ বিনীত প্রশ্ন।

—একটু আগেই ফিরল। চলো, কথা বলি। কাল অবশ্য ওর অফিস আছে। চলো দেখি কামাই করাতে পারি কিনা।

স্কুটারের স্টার্ট দিতেই রঞ্জন মোহনের দিকে একবার তাকিয়ে পেছনে এসে বসল।....

তুমি সেদিন চা দাওনি রঞ্জনকে; বোধহয় ভুলে গেছো, কিংবা ইচ্ছে করেই হয়তো দাওনি, কিংবা পরিস্থিতি বেশ গম্ভীর ছিল বলে হয়তো। অন্যদিন যেরকম সহজ ভঙ্গিতে কথা বলো, সেদিন কিন্তু সেরকম ছিলে না; আমার মুখে রঞ্জনের প্রয়োজনের কথা শুনে হঠাৎ কীরকম প্রফেশনাল হয়ে গেলে। তোমার এরকম চেহারা, ভাবভঙ্গি, আমি খুব একটা দেখিনি। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে কেমন অন্যরকম গলায় বললে— আপনার তো উপায় নেই দেখছি, আমাকে ছাড়া। রঞ্জন তার স্বভাবসুলভ ভদ্রতা বজায় রেখেই অত বিপদের মধ্যেও— হেসে ফেলল অল্প; বলল— তা, একরকম তা-ই, বলতে পারেন। মানে, আদারওয়াইজ, আমি বেশ নার্ভাস ফিল করছি। তুমি বললে— স্টেশনের কাছে আরোগ্য নিকেতন থেকে তো ? সকালে ? সাতটার আগে নিশ্চয়ই নয় ? রঞ্জন বলেছিল— আমরা ঠিক আটটায় বেরোব। তোমার সংক্ষিপ্ত শেষ কথা ছিল— আমি পৌনে আটটায় পৌঁছে যাব।

মনে আছে, কী যে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল রঞ্জন।

তোমার যে দজ্জাল, মুখরা, ঝগড়াটে, জেদী— ইত্যাদি বিভিন্ন বিখ্যাতি, তা যে কত কাজে লাগে মানুষের বৈষয়িক জীবনে— তা তো আমি আগেও দেখেছি। অনেকবার। সেই যে, দিল্লি যাবার পথে, একবার, তুমি খাবার বের করে দিচ্ছিলে, আমাকে, সবে সাজানো শেষ হয়েছে, কোথায় যেন ট্রেন থামল, আর জানলা দিয়ে একের পর এক ভিখারির হাত... আমি কিছু একটা দিতে যাব— বোধহয় এক টুকরো রুটি বা ওইরকম কিছু— তুমি হঠাৎ উঠে দুম করে জানলার শাটার ফেলে দিলে। ভারী নিষ্ঠুর লেগেছিল তোমাকে, সেই মুহূর্তে, ভারী কঠোর, অমানবিক। যেন, আমার দৃষ্টি থেকে মনের কথা পড়ে নিয়ে তুমি বলে উঠলে— তুমি যাতে নিশ্চিন্তে খাবারটা খেতে পারো, সেই ব্যবস্থা করে দিলাম বলে ? বলার কিছু নেই, তাই চুপ করেই থাকতে হল। অতগুলো বাড়িয়ে দেওয়া হাতের সামনে— নানা বয়েসি, নানারকম রুক্ষ, সবগুলোই কমবেশি ময়লা, অতগুলো হাতের সামনে, অম্লান বদনে খাবার খেয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। ট্রেন ছাড়লে তবে শান্তি।... আর একদিন, ফেরার সময়, একটা কুলি— পঁচিশ টাকা চাইছিল, তাকে তুমি পাঁচ টাকা দিলে শেষ পর্যন্ত। সে এক কাণ্ড। সে সব কথা থাক।

রঞ্জনের মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার দিন, ঠিক সাড়ে সাতটায় তুমি বেরিয়ে

গেলে। আমার হাতে একটা মুদিখানার মাল আনার ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে। ক্রাউন গেটের দিকে, মালগুলো নিয়ে, সিগারেট কিনছি, এমন সময় অ্যাম্বুলেন্সটা ওখান দিয়েই গেল। আমি সিগারেটের দোকানটার সামনে থেকেই তোমাকে দেখতে পেলাম। স্ট্রেচারে শোয়ানো রঞ্জনের মায়ের শরীর ছুঁয়ে, তোমার সেই মগ্ন বসে থাকা, আহ্। মাথার দিকে বোধহয় রঞ্জন ছিল, পায়ের দিকে ওর ভাই আর তার দু-একজন বন্ধু, তুমি ঠিক মাঝখানে ছিলে।

রঞ্জনের মৃত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সেসব কথা হু হু করে মনে পড়ে গেল।

রঞ্জনের মাকে আগে কখনও দেখিনি। তুমি অবশ্য প্রায়ই দেখতে যাবার কথা বলতে। আমি রাজি হতাম না কিছুতেই। রঞ্জন বেশ অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও, বয়সে ছোট, দাদা বলে ডাকে, রোজই দেখা হয়, রোজই খবর পাই, আলাদা করে দেখতে যাবার মতো সামাজিকতা করার কী আছে। সেসব অবশ্য বলতাম না তোমাকে, অন্য কথা বলতাম। রাগিয়ে দিতাম তোমাকে, ঝগড়া লাগিয়ে দিতাম।— বন্ধুর মা-কে দেখতে যাবার কথা রোজ বলো, কই, আমার মাকে দেখতে যাবার কথা তো একদিনও বলো না।

এই কথাটা বললেই, কাটা ঘা-য়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতো, তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে তুমি। পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষকেও তুমি যদি ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করো— তো, সে আমার মা। যে আমায় মানুষ করেনি, তোমার ভাষায় পাগল, ধান্দাবাজ, মাতাল ও ছিঁচকে করে তুলেছে, ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গটা এত বিরক্তিকর রকম অসহায়তামাখানো, যে এসব কথা ভাবতে ভাল লাগছে না। ক্যাসেটে সুবীর সেন চালিয়ে দিলাম।... হাওয়ারা হঠাৎ এসে জানাল, তুমি যে আমার কাছে আসবে....। আমার সেই ছোটবেলার গান। এটা যে এমন নির্মম হয়ে উঠবে, সত্যি হয়ে উঠবে এইভাবে আমারই জীবনে, কে জানত।.... সারাদিন গাছের ছায়ায়, উদাসীন দু'চোখ মেলেছি— যা শুনে ভেবেছি এসেছো, তা শুধু পাতারই আওয়াজ.... খুব ন্যাকা, না? তবু কি মিষ্টি সুর, আর কী সত্যি, এই মুহূর্তে। কলিং বেল বাজলেই মনে হয়, যদি তুমি হও।

আজকাল মনে হয়, শূন্যতা জিনিসটা আসলে মানুষেরই কল্পনামাত্র, শূন্যতা কোথাও নেই। এই যে ডাইনিং-হলটা ফাঁকা হয়ে আছে, বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মতো, লাল সানমাইকা দেওয়া ডাইনিং টেবিলটা নেই, ফ্রিজটা নেই— যার ফলে টেবিল-টেনিস-খেলা যেতে পারে এখানে বলে মনে হয়, কিংবা কোনও ঘরোয়া গানের আসর— আসবাবগুলো নেই কারণ তুমি নিয়ে গেছ— রান্নাঘরের গ্যাসটা পর্যন্ত; সে যাক্; ফাঁকা ডাইনিঙে আমি একটা মাদুর পেতে রেখেছি মাঝখানে— সেটা দেখে রঞ্জন একদিন বলে গেল— মাদুর দিয়ে কি আর শূন্যতা ভরাট করা যায়? কেমন একটা দুষ্টু দুষ্টু হাসির ছোঁয়া ছিল যেন তখন রঞ্জনের

সুদৃশ্য গোঁফের আড়ালে।

সেই থেকে কথাটা ভাবছি, শূন্যতা কোথাও নেই, শূন্যতা মানুষের উর্বর কল্পনামাত্র। আসলে, রঞ্জনকে কীরকম বলেও ফেললাম— কেন, ভরাট করার কী আছে। দু-একটা জিনিস না থাকলেই কি ঘর শূন্য হয়ে যায়? ঘরের মধ্যে ঘরটা তো থাকে অন্তত।

কিছু বলেনি রঞ্জন। বৌদির অনুপস্থিতি ওকে অস্বস্তি দিচ্ছিল বলেই হয়তো। আমার একাকীত্বও অনেকটাই অনুভব করে বলেও হতে পারে। শুধু একাকীত্ব বলে নয়, রঞ্জন আমাকে অনেকটাই বোঝে, অনুভব করে, গত বছর শীতে, বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক থেকে ফিরে— তুমি কিছুতেই গেলে না সে পিকনিকে, তোমার কাজ ছিল— ম্যাটাডোরে, ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া আসা— রাত্রে একটা ফিক ব্যথা উঠল কোমরে। তুমি বললে— তোমার তো হয় মাঝে মাঝে, ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে। সকালে বেশ বাড়ল ব্যথাটা। তুমি বললে— একটু শুয়ে থাকো, বেলা হলে কমে যাবে। তারপর রোজ যেকম সাতসকালে ছুটতে ছুটতে কাজে চলে যাও, সেরকম চলে গেলে— মানে, বিয়ের পর থেকে, এই একটানা এগারো বছর ধরে যেকম দেখে আসছি। সেরকমই, সেরকমভাবেই কাজে বেরিয়ে গেলে। 'সকালে ক্লিনিক আছে'— এরকম একটা কী যেন অস্ফুটে বললে কি বললে না। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়েই পড়লাম। এমন কি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম আর একবার। জোর করে ঠেলে তুলে দিলেও, সকালবেলা ওই ঘুমচোখে তোমার বেরিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে— আমার আরও ঘুম পেয়ে যায়। এমনিতেই। উত্তরপাড়ায় এসে প্রথম যেদিন তোমাকে স্কুটারে বালি স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম, সাতটাও ভাল করে বাজেনি তখনও, তুমি চলে যাবার পর এখানে অদ্ভুত উপেক্ষার মতো প্রবাহিনী গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম; স্তব্ধ এক নিরালম্ব অস্থিরতার মধ্যে, ওপারে আদ্যাপীঠ, বনানী; বালী ব্রিজের ঠিক ওই কোণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির— সব কেমন নির্লিপ্ত, বহমান স্রোত কারও জন্য বিমর্ষ হয় না, থেমে থাকে না, আমি একা দুঃখ পাব কেন। তখন তোমার অফিস ছিল কৃষ্ণনগরে। রোজ যাতায়াতের অসুবিধে বলে আমিই বললাম হস্টেলে থাকতে; তুমি ইচ্ছেমতো আসতে; কখনও তিনদিন, কখনও সাত-আটদিন পরে। একা থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠতাম, দম দমবন্ধ হয়ে আসত; অফিস, বন্ধুদের আড্ডা, সিনেমা, গান, মদ, সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত— কী করব বুঝতে পারতাম না কিছুতেই— এরকম অবস্থায় দু'তিনদিন একটানা শুয়ে থাকতাম চুপচাপ, শুধু খুব খিদে পেলে উঠে গিয়ে খেয়ে আসতাম বাইরে থেকে; এখানে একটা ভাতের হোটেল আছে, মালিক ছেলেটা আমার চেয়ে ছোট— দাবা খেলতে খুব ভালবাসে; খেতে গেলেই বোর্ড সাজিয়ে বসে থাকত, খাওয়া হয়ে গেলে গম্ভীর ভাবে বলত— আসুন। একদিন তো সারাদুপুর দাবাই খেললাম। ছেলেটা খালি খালি হেরে যায়। খেলবার সময় একদম ভাবে

না। বেঁচে থাকার সময় আমি যেমন করি। কোনও কাজ ভেবে চিন্তে করি না। খেলার সময় কিন্তু ভেবে খেলি। ওটা খেলা, না ?

সেদিন, তুমি বেরিয়ে গেলে, আমি অনেক বেলায় উঠলাম। মনে হল, ব্যথাটা যেন কম। স্নান, খাওয়া, জামাকাপড় পরা, ফ্ল্যাটের জানলাটানলা বন্ধ করা, দরজায় তালা দেওয়া, সবই ঠিকমতো করেছি, কোলাপ্‌সিবল গেটটা টানতে গিয়ে কোমরে কেমন একটু খিঁচ করে লাগল যেন। কাল থেকেই তো লাগছে, ভেবে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। নীচে নেমে স্কুটারের হ্যান্ডেলের লক্‌টা খোলবার জন্যে নিচু হতেই, ঘটনাটা ঘটে গেল। ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম ঝাড়া একঘণ্টা। তবু বিশ্বাস হল না, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। কোমরে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। স্কুটারের সিট ধরে ওইভাবেই বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনে হল— আজীবন এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কোনও দিনই আর সোজা হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব না। বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল, অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল প্রাণপণ, কিন্তু কী করব, আমারই এতদিনকার, নিজের কোমর— আমার আয়ত্তে নেই, মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে, পুরো উর্ধ্বাঙ্গ যে জায়গাটার ওপর নির্ভরশীল, সেই জায়গাটায় সহ্যশক্তির অতীত একটা ব্যথা, এবং আমার সোজা হয়ে দাঁড়াবারই কোনও ক্ষমতা নেই, হাঁটাহাঁটি করা তো দূর অস্ত্।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ওইভাবেই কেটে গেল। পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট ধরার যে, তা-ও পারছি না। কোমরের যন্ত্রণা আগেও হয়েছে, একবার, তখন সিঙ্গুরে থাকতাম, তুমি তখন সিঙ্গুর লেথ্ স্কুলের সিসটার-টিউটর ছিলে, আমাকে অফিসের কাজে কুচবিহার যেতে হবে কিছুদিনের জন্য— টিকিট কাটা হয়ে গেছে, যাবার ঠিক দিন-দুয়েক আগে ব্যথাটা শুরু হল ; ওই একই জায়গায় পিছ কোমরে, অবিরাম যন্ত্রণা, সোজা চিত হয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও ভঙ্গিতেই স্বস্তি পাই না, ব্রুফেন বা সুগানরিল মুড়কির মতন খেয়ে গেলাম— কিছুই হচ্ছিল না ; তখনও তুমি কোনও গুরুত্ব দাওনি ব্যাপারটাতে— এরকমই ভঙ্গিতে, সাতসকালে বেরোবার সময় বলে গেলে মাস্টারমশাইকে বলো না, হোমিওপ্যাথিতে অনেক সময় সেরে যায়। ভারী হাসি পেয়েছিল তখন, মনে আছে। মাস্টারমশাই মানে বাড়িওলা। শান্তিপ্রিয়, সিঙ্গুর স্কুলের বাংলার টিচার। সৌম্যকান্তি। বাবা নাম করা ডাক্তার ছিলেন। সেই সূত্রে প্র্যাকটিস, নিজে পাসও করেননি— যার মানে কিনা হাতুড়ে। ভোরবেলা দেখা করলাম, নীচে গিয়ে, আমরা থাকতাম ওপরে।— কাল সন্ধেবেলা আমায় কুচবিহার যেতে হবে, অথচ... কী যে করি ; কোমরে এমন যন্ত্রণা.... সব কথা ভাল করে না শুনেই মাস্টারমশাই বললেন— মুখটা ধুয়ে আসুন। নিজের ছোট চৌকো বাক্স থেকে ওষুধ বের করে, একটা, একটাই মাত্র পুরিয়া, পরিষ্কার মনে আছে, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— খেয়ে ফেলুন। একটু পরে কমে যাবে।

কী নির্লিপ্ত আত্মবিশ্বাসী, প্রশান্ত সেই উচ্চারণ।

যাবতীয় সুশিক্ষিত অবিশ্বাস নিয়ে ওষুধটা খেলাম। আমতা আমতা করে বললাম- টাকা, মানে কত দিতে হবে?

একইরকম গলায় মাস্টারমশাই বললেন— ওপরে গিয়ে শুয়ে থাকুন। কাল ট্রেন ধরতে পারবেন। যেন অন্যরকম কিছু হতেই পারে না।

হয়ওনি। বেলা সাড়ে দশটায় সব ব্যথা সাফ্। কুচবিহারে গিয়েও কোনওরকম অসুবিধে হয়নি।

এবারের ব্যথাটা অবশ্য আরও অনেক তীব্র। কোমরটা কিছুতেই সোজা করতে পারছি না। সামনের প্যাসেজ দিয়ে লোকজন আসছে যাচ্ছে। কেউ বুঝতেই পারছে না আমাকে দেখে, অফিসে বেরোবার মতো জামাকাপড়-পরা একটা লোক, স্কুটারটা ধরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন গাড়িটা সিঁড়ির তলা থেকে বের করবে এক্ষুনি— তার মেরুদণ্ডের ভেতরে এমন সাংঘাতিক একটা আয়ত্তঅতীত বিপর্যয় যে ঘটে গেছে, কেউ কিছু বুঝতেও পারছে না। তিনটে বউ সামনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল— তারাও কিছুই বুঝতে পারেনি অনেকক্ষণ। একসময় তাদেরই একজন এগিয়ে এসে বলল—আপনার কী হয়েছে?

আমি কোনরকমে বললাম— দারোয়ানকে একটু ডেকে দিন তো। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। কোমরে অসম্ভব একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

দারোয়ান বলতে তখন ভাগ্নারায়ণ ছিল। সে এক পলক আমাকে দেখেই সোজা চ্যাংদোলা করে তিনতলায় তুলে এনে আমার ঘরের বিছানায় আমাকেই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

দরজা খোলাই রইল। সারাদিন বোকার মতো শুয়ে রইলাম চিত হয়ে। পাশ ফিরতে গেলেই স্পাইনাল কর্ডের নীচের দিকটা মচমচ করে উঠছিল।

সন্ধে হয়ে আসছিল। হঠাৎ মনে হল, আরে— তুমি যদি না ফেরো আজ! বিছানা থেকে নামা তো দূরের কথা, আমি তো পাশ ফিরতেই পারছি না। তোমার তখন ডিউটি কৃষ্ণনগরে। হয়তো সেই শনিবার ফিরবে। আমি তো ততদিনে না খেতে পেয়ে মরে যাবো। অসুখের চিকিৎসা তো দূরের কথা।

কোনরকম জানলার কাছে গেলাম। প্যাসেজের ওপাশের ফ্ল্যাটের লোকটাকে চেঁচিয়ে অনেক কষ্টে বোঝানো গেল আমার অবস্থাটা— দয়া করে যদি দেবুর দোকানে একটা খবর দেন, সে অনুরোধও করলাম।

দোকান ফেলে রেখে দেবু চলে এল। সঙ্গে সুধা, মানে সম্বিৎসুধা, আর রঞ্জন। তারপর ডাক্তার, ওষুধ, বিস্কুট, গরম দুধ...।

দিন তিনেক পরে তুমি এসে বললে— না না, ছুটি ফুটি নিতে পারব না। কৃষ্ণনগরে একদিন গেলে টাকা পাব। কাজ কামাই করে তোমার কাছে বসে থাকলে তো সারাদিন তোমার খিদমত খাটতে হবে।

অন্যদিনের মতো, তুমি চলেও গেলে।

আর আমি, সারাদিন, ফাঁকা ঘরে, শুধু চিত হয়ে শুয়ে থাকি।

দুপুরে সেবক এসে বিস্কুট দিয়ে যায়। সন্ধেয় রঞ্জন এসে বসে বসে গল্প করে। বিকেলে দোতলার মাসিমা রোজ ফ্লাস্কে চা নিয়ে চলে আসে। শুধু তুমি....।

রাত নটা-দশটায় বাড়ি ফিরে সারাদিনের যাতায়াতের ক্লান্তি, কাজের বিরক্তি সব নিয়ে তিতিবিরক্ত থাকো আর ঘুম ভাঙলে কৃষ্ণনগর চলে যাও।

সেই প্রথম, বলা যেতে পারে, প্রকৃত শূন্যতাকে আমি চিনে নিতে শুরু করি। ফাঁকা ঘরের শূন্যতা আমার কী করবে! শূন্যতার সঙ্গে আমার অনেকদিনের জানাশোনা!... সেই কবে, তোমার দিল্লি যাওয়ার অনেক আগে, তখন হরিপালে থাকি আমরা, তোমার পোস্টিং তখন সিঙ্গুরে, হরিপাল থেকে তিনটে স্টেশন— তাই তুমি ভোর হলেই ছুটে ছুটে চলে আসতে। একদিন, বোধহয় অফিসে স্পোর্টস ছিল, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল দুপুরবেলা, রোজ দেরি করে বাড়ি ফেরার বদনাম ঘোচাতে, সোজা-ট্রেন ধরে বাড়ি চলে এলাম। সেদিনই, তোমার কীসব মিটিঙ ফিটিঙ ছিল, তুমি অনেক দেরি করে এলে। আর ছবিদি, আমাদের কাজের লোক— আমাকে দেখেই শুরু করে দিল হা-হুতাশ— 'আমনারা বেইড়ে যাবার পরপরই আম্‌নার মা এয়েছেল, দরজার তালাটা ধরে ঠায় ডাঁইড়ে রইলে গো, বললে— ওরা সেই বিকেলবেলা ফিরবে, তাহলে আমি যাই।' অনেক, অনেকদিন পরে, মায়ের কথা শুনলাম, মায়ের মরণাপন্ন অসুখ করেছিল, বাড়িতে বাবা আর আমার ক্লাস সেভেনের ছোট্ট বোন— অনেক কষ্টে....। তোমার সঙ্গে অশান্তি হতে পারে ভেবে আমাকে ওরা কোনও খবরই পাঠায়নি....। আজ রঞ্জন আমাকে শূন্যতার স্বভাব বিষয়ে নতুন কী আর তথ্য দেবে বলো!... তুমি বাড়ি ফেরার পর তোমাকে সব কথা বলতে তুমি বললে— যাও, বাড়ি গিয়ে মায়ের সেবা করো, আমি নাহয় হস্টেলে চলে যাচ্ছি।... কী উত্তর।

ডাক্তার বলল, লাম্বাগো। হোমিওপ্যাথি ছাড়া উপায় নেই কোনও। ঠিক পনেরো দিন পরে, যেদিন প্রথম হামাগুড়ি দিতে পারলাম— কী যে আনন্দ হল! অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেললাম, প্রায়, আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত হয়ে ফ্ল্যাট কিনে, নিজের ফাঁকা ঘরে হামাগুড়ি দিতে দিতে। আবিষ্কার এক— পশুদের মেরুদণ্ড আর মানুষের মেরুদণ্ডের যতই পার্থক্য থাক, পশুদের মতো চার পায়ে হাঁটলে, মানুষের মেরুদণ্ডে কোনওরকম চাপ পড়ে না। দুই— একজন স্বনির্মিত মানুষের, পুরুষমানুষের বিভিন্ন গভীর গোপন অনুভূতি সঠিকভাবে অনুভব করা, তার ভার বহন করা, জীবনের প্রকৃত অংশ নেওয়া, কোনও রমণীর পক্ষে সম্ভব নয়। তিন— পৃথিবীর বেশির ভাগ মেয়েরা, অন্তত বাঙালি মেয়েরা, চাকরিজীবী হলে তো অবশ্যই— বড্ডো আত্মমুখি হয়, নিজের সুখ, নিজের বাপের বাড়ি, নিজের ইচ্ছে— এসব ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। স্বামীরা সাধারণত তাদের অর্ডার-সাপ্লায়ার হয়ে থাকে।

চার— একজন মানুষ অন্য আর একজনকে ভালবাসে, অথচ সে তার প্রেমিকের বা প্রেমিকার মা-বাবা কিংবা অন্য কোনও প্রিয়জনকে ঘৃণা বা অপছন্দ করে— এরকম হয় না, হলে বুঝতে হবে, সেটা ভালবাসা নয়, উদ্দেশ্যপূরণের ছল। পাঁচ— মানুষ, জিততে ভালবাসে, নিতে ভালবাসে, দিতে ভালবাসে না কিছু, কেউ হারতে চায় না যেমন তেমনি সবাই শুধু পেতে ভালবাসে, সে যাইহোক না কেন। ছয়— মেয়েরা নিজের ঘরের ন্যাতাটাকেও নিজের ঘরের লোকের চেয়ে বেশি ভালবাসে! সাত—

পরের আবিষ্কারগুলো আর নাই বা বললাম। আসলে, এসবই হল রাগের কথা। একজন অক্ষম, ব্যর্থ, প্রেমহীন, দুঃখি মানুষের কথকতা। সবাই তো আর এরকম নয়। তোমার চাকরির শর্তটাই তো অন্যরকম। প্রতি মুহূর্তে টেনশন, ঝকমারি, ঝামেলা। বাপের বাড়িতেও অনেকগুলো অবিবাহিত বোন, মা-মরা মেয়ে বলে সবাই কেমন অসামাজিক, এক একজন এক একরকম! সবাইকে সামলে, তোমার পক্ষে, হৃদয়ে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, হয়তো অসম্ভব হচ্ছিল। আমিও তো, আসলে, খুব একটা, সুবিধের লোক নই। সারাজীবন উৎপীড়নই করলাম। ঘরে বাইরে, অফিসে বাপের বাড়িতে, সব জায়গায়, সব সময়, নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্যে থেকে থেকে তোমার মন-মেজাজ কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ, সহজ, শান্তিময় জীবনযাপন তোমার তো কোনওদিনই হয়নি। আমিই বা তোমাকে সেভাবে সুখে শান্তিতে রাখতে পারলাম কোথায়! শুধু অভিযোগ আর ঝগড়া করলাম। আমি তবু তো অনেককিছু ছেড়েছি— বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, নেশা, মা-বাবা-ভাই-বোন সব— আমার পক্ষে, সেটা একটু বেশি হয়ে গেছে নাকি? অবশেষে, এই ফ্ল্যাট কিনতে গিয়েই কাল হল; তোমার বদলির চাকরি— আমারও কোনও উপায় ছিল না অবশ্য। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়ে, দেখলাম— তুমি একইরকম আছো। সেই অফিস আর বাপের বাড়ি— আমার কাছে যতটুকু থাকো, ততক্ষণই মেজাজ সপ্তমে; এই এগারো বছরের বন্ধ্যা দাম্পত্যের পরে— আমিই বা কেন সহ্য করব বলো!

হস্টেলে দেখা করতে গেলে কেমন নিস্পৃহভাবে বলো— আর হয় না! আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

একদিন তো এমনও বললাম— আইনসঙ্গতভাবে দূরে চলে গেলেই কি কেউ কারও কাছ থেকে দূরে চলে যেতে পারে? তোমার কোনও বিকার হল না! আমি জুতো পর্যন্ত পরতে পারতাম না, মনে আছে? হাওয়াই চটি পরেই ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়াতাম! তুমি আমাকে জুতো পরতে শেখালে, দাড়ি কামিয়ে, জামা গুঁজে, জুতো পরে— বাড়ি থেকে বেরোতে শেখালে, নিজের মধ্যে নিজে কেমন করে থাকতে হয় সে সবই তো তোমার কাছেই শেখা। সেই তুমি— আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে কী করে? রোজ জুতো পরতে গেলেই যে আমার তোমাকে মনে পড়বে, মনে হবে, আমি না, তুমিই বেঁধে দিচ্ছো ফিতেগুলো! বেঁচে থাকাটা যে

তোমার কাছ থেকেই নতুন করে শিখেছি, আর কেউ না জানুক, তুমি তো সেটা জানো! তুমি চলে গেছো বলে আমি সব ভুলে যাব কী করে? যে কোনও শূন্যতার স্বভাবই তো পূর্ণকে আবাহন করা, আরতি ও আক্রমণ করা— কে কখন জিতবে কোনও ঠিক নেই। হারিয়ে যাওয়াতেই তো শূন্যতার আনন্দ, পূর্ণতারও। সে জন্যেই— বেশিক্ষণ কেউ এক জায়গায় থাকে না ওরা, জানো তো!

শ্বেত ঊর্ণনাভ

(প্রস্তাবনা)

বাড়ি ফেরার সময় গলির ভেতরকার এই বিশেষধরণের অন্ধকার আচ্ছন্নতার মধ্যে, দরজার ওপর একটা হাত রাখলে— সেই হাতের ওপর ঝুঁকে আসে মাথা, নিজের অথচ মনে হয় যেন নিজের নয়, কপাল নাক মুখ ঠোঁট লেগে যায় কাঠের দরজায়, পা মুচড়ে আসে, শরীর দরজার খুব সংলগ্ন হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, যতক্ষণ না কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসে দরজা খুলে মা বলবে— 'কেন এত রাত...।' এ সময়টুকু— একবার সজোরে কড়া নাড়ার পর থেকে দরজা খুলে দেওয়া পর্যন্ত,— এক নিরাবয়ব শূন্যতার মধ্যে ঝুলে থাকবে শরীর, অবলম্বহীন, সারাদিনের পুরনো ঘটন'বলী শেষবারের মত, না শেষবারের মত নয়, নতুন করে তখনকার মত লোফালুফি করতে থাকবে তাকে নিয়ে, এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ সেই অবসন্নতায় যা অনেকক্ষণ মাথার মধ্যে থেকে যায়, ঝিমঝিম করে। নিচু ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পরার পর আবার।....ঘুম ভাঙার পর পাশ ফিরে শুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার দৃশ্য ও অফিসে বিকেল হয়ে আসছে, ক্রমশঃ এক অভ্যস্ত ক্লান্তি ও তার অভ্যস্ত বিনোদন সেই সন্ধ্যেবেলা, অনাদির ঘর কিংবা রুমা এবং রেস্তোঁরা, রুমার হাসির শব্দ রুমার হাসির শব্দ রুমার অবান্তর কথা বলা এবং কথা বলা, ক্লান্তি ঠিক কিভাবে যে পরিশ্রুত হচ্ছে তা স্পষ্টতঃই পর্যবেক্ষনের মধ্যে রুমার স্লিভলেস জামার প্রান্তে বাহুমূলে হঠাৎ কথাচ্ছলে হাত রাখা অথবা না রাখা, রুমার নাক, নাকের ওপর ঘাম ও ছোট ছোট চোখের অস্থিরতা। অথবা অনাদির ঘর, ঘরের দেয়াল-ঘেঁষা বিরাট টেবিল, পাহাড় করা বই, কবিতার পত্রিকা, সাদা পাতা, চেয়ারে বিছানায় ছড়িয়ে এলিয়ে বসে শুয়ে যৌনতা সিনেমা ডায়ানা মাদার টেরেসা লালুপ্রসাদ গুজরাল ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি অথবা দাঁত দিয়ে বোতল খোলা আর অনাদির তখনও অবিবাহিত বোনের সতর্কতা ও তৎপর সাহায্য...। খুব দীর্ঘ খোলামেলা প্রান্তরের ওপর যেমন নম্র সন্ধ্যা, নেমে আসে ঘুম খুব গাঢ় আমার দু-চোখের পাতার নিচে, আর তখন, রুমার নাভির স্পষ্ট স্মৃতি, নাভিমূল যেহেতু এখনো দেখিনি...এবং কোমরের নরম ভাঁজগুলি অন্ধকারে ঘুমের পর্দায় বড় চমৎকার কাঁপে।

(পূর্বকথা)

কলকাতায় আসার পর থেকে, সময়যাপনে, অনাদির ঘর এক অনিবার্য সংযোগ,

সমস্ত জীবনে। মনে পড়ে 'নিউ লাইফ' নার্সিং হোমের জানালা, যেখানে বসে পরম্পরাহীন কিছু ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছি কেবল একলা যা এই মরপৃথিবীর সুস্থ লোকেরা আর কেউ কখনো করেনি।...এক বালক ট্যাক্সির পিছন ছুঁয়ে ছুটে যাচ্ছে শহর থেকে গ্রামের দিকে, মফস্বল থেকে আরও অন্য কোথাও..বিশাল এক প্রায়ান্ধকার ঘরে বাউলের মতো দোতারা বাজানোর ভঙ্গিতে দু-হাত শূন্যে তুলে দিয়ে সিনেমার স্বপ্ন-দৃশ্যের মত ভেসে ভেসে হেঁটে বেড়াচ্ছে কে? বাবা? না আমার অনেক জন্ম আগেকার আমি? পায়ের কাছে অনেক মৃত নারীর শরীরাংশ বিক্ষিপ্ত অথচ ভ্রুক্ষেপ নেই...। মাঝে মাঝে কথা বলে উঠতে চাইছে তারা.. আবার সুযোগ দাও... আবার ঘর...। দীঘির সবুজ ঢালু পাড়ে কোনো চন্দ্রতাড়িত সন্ধ্যেরাতে দুজন উৎক্ষিপ্ত পরস্পর নির্ভর যুবক নিজস্ব উত্থানপতনময় যৌবন ভাসিয়ে দিল শ্বেতাভ জ্যোৎস্নাসিক্ত স্বচ্ছ জলের মধ্যে— 'অতঃপর পৃথিবীর কোনো নারী আমাদের আর'— ইত্যাদি উচ্চারণে কি আরও ঘন হল তাদের উত্তাপ..। কিংবা, অনেক রাতে বিছানা থেকে উঠে এসে বাইরে ছেলেবেলার গ্রামের পথ দিয়ে এগারো বিঘের জলার দিকে শ্মশানকালীর মন্দিরের দিকে চলে যাওয়া খুব একা একা..। কি যে গোলমাল হয়ে গেল তারপর কোথায়, ঠিক দু-বছর সময়ের কোনো হিসেব জানি না, তারপর রোজ দুটো করে ইলেকট্রিক শক্ ওই 'নিউ-লাইফ' নার্সিং হোমে একমাস, তারপর আবার দ্বিতীয় জন্ম এই কলকাতায়। পুনর্বাসনের কালক্রম শুরু ওই অনাদির ঘরে। মনে আছে, সেসময়, দুপুরবেলা ঘর অন্ধকার করে আমার ছেলেবেলার গল্প শুনে চাইতো অসিত গৌতম অনাদিরা। কত গল্প। কমলার গল্প, রাস্তার পাশের টিউবওয়েলে স্কুলে যাবার আগে স্নান করতুম। আর, একটুখানি বেঁকে, কেমনভাবে যেন দাঁড়িয়ে, এটা সেটা বকবক করতে করতে আমার স্নান দেখতো কমলা, স্নানের পর বাড়িতে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার খাওয়া দেখতো, সব ভাত ভালো করে না খেলে ভারী সুন্দর শাসন করতো একটা, তারপর একসঙ্গে স্কুলে যেতো। সেই কমলা আগে আগে দাদাদের ক্লাশে ছিল, তারপর আমার, পরে রূপংকরদের ক্লাশে চলে যায়। ফর্শা গোল-মুখ কমলাকে, সদাউৎফুল্ল কমলাকে, ওর দাদার কাছে অঙ্ক শিখতে যেতুম— একদিন তাল পেয়ে ওর শোবার ঘরে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরলে খিল-খিল করে কি-যে হেসে উঠে ছিল— 'তুই তো একটা এইটুকুনি বাচ্চা ছেলে'— আহ্, কি-যে রাগ হয়েছিল আমার তখন। ... শিখার গল্প, টগরতলার কাছে পোড়োবাড়ির সিঁড়িতে বসে থাকতো শিখা আর শিখার বন্ধুরা, হুস্-হুস্ খেলতে গিয়ে আমি চোর না দিয়ে শিখার সঙ্গে গল্প করতুম কত-কি।.. 'ছেলেরা যখন দৌড়োয় তখন একটা জিনিস টঙাস্ টঙাস্ করে';—'মেয়েদের এপাশ ওপাশ করে, ধপাস্ ধপাস্'— 'না ভাই, বাঁধা থাকে',— 'আমাদেরও বাঁধা থাকে'...। সেই শিখা, শেষমেষ রাজহাটি ছেড়ে চলে গেল..দিলীপকে আমি একদিন দুপুরবেলা ছোটকাকার ঘরে শুয়ে কানে কানে বলেছিলুম— 'জানিস্ তো, শিখাকে

না, বিয়ে করবো'— আর তারপর শিখার মাস্টার কালীবাবু স্যারকে বলে দিল দিলীপ, কালীবাবু স্যার শিখার দাদুকে— স্কুলের দেয়ালে যুক্ত যুক্ত দিয়ে লেখা হল আমার সঙ্গে শিখার নাম— আর সেই লাস্ট পিরিয়ডে লালমোহন স্যারের জীবনবিজ্ঞান— শিখার দিকে খুব চেয়ে আছি জীবন ভুলে— লালমোহনস্যার— 'এই শ্যামল, এক চড় মারবো ঠেলে'— বলে উঠলে ছুটির পর সবাই আমাকে...।

সেই শিখার সঙ্গে ঠিক সাত বছর পরে দেখা হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। এক মেজাজ খারাপের বিকেল বেলায়। কি একটা খ্যাঁচা ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরছি কলেজ ষ্ট্রিট দিয়ে হ্যারিসন রোড, হঠাৎ দিলখুশা কেবিনের সামনের বাসস্টপে শিখা আর দুজন ঝাঁ চকচকে ছেলে, আর একটা মেয়েও ছিল। জানা গেল, শিখা আর তার এক বান্ধবী তাদের প্রেমিকদের নিয়ে সকাল থেকে এক পরিকল্পনাহীন অলসভ্রমণে বেরিয়েছে, এখন একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরবে, কদমতলা। দেখা হবার পর খুব উল্লসিত হল শিখা,—'তোর ছেলেবেলার সুইটনেসটা একদম নেই, একেবারে পাল্টে গেছিস্'— এই সব বললো। প্রত্যুত্তরে আমি— 'খুব লোভনীয় সুন্দরীর মতো চেহারা করেছিস'— বলতে হঠাৎ পাত্তা না দিয়ে— 'শোন'— চকিতে আমার বুকের মাঝখানটা ছুঁয়ে দিয়ে,— 'বিশ্বাস কর গা ছুঁয়ে বলছি, সারাদিন ওর সঙ্গে ঘুরছি তবু কিরকম যেন একা একা লাগছিল, তোকে দেখে সেটা কেটে গেল।' বললে,—'তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে'— শুনে, 'না, কোনো কথা নেই, এখন আর কোনো কথা থাকা উচিত নয়'— বললো শিখা। 'না না, সেরকম কিছু নয়, শুধু—মাঝে মাঝে তোকে বড় মনে পড়ে যায়, আর— আমার জন্যে তোকে অনেক দিতে হয়েছে তো, অপমানিত হতে হয়েছে, রাজহাটি থেকে চলে আসতে হয়েছে, এগুলো ভাবলে'— এসব কথার উত্তরে হঠাৎ— 'তুই এখন ভালো আছিস্ তো, মানে, মাঝখানে তোর সেই মাথার অসুখের ব্যাপারটা শুনে আমার এতো খারাপ লেগেছিল। এখন আর ওসব নেই তো?'— বললে, তার দিকে ঈষৎ আহত ও নিবিড় চোখে তাকিয়ে— 'তোর সেরকম কিছু মনে হচ্ছে নাকি?' বলে ফেলে ওর অসাধারণ চোখে অল্প আবৃত দুঃখ দেখি আমি। ওর প্রেমিকের সঙ্গে আলাপের পর আমি তাঁকে তাঁর নিরীহ 'কোথায় থাকেন'-এর উত্তরে— 'এই কলেজ ষ্ট্রিটেই বলতে পাবেন'—বললে তিনি আহত ভঙ্গিতে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে, ট্যাক্সি পাওয়া গেলে ওরা উঠে গেল আর শিখা দরজায় হতে রেখে আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে— বাল্যপ্রেমিক আর সদ্যপ্রেমিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোধ হয় জীবনের হাস্যকর পরিবর্তনশীলতার কথা বুঝতে পেরেই হঠাৎ ঝরঝর করে হাসতে শুরু করলো এবং অনেকক্ষণ আমাকে যথেষ্ট করুণ ও বিহ্বল করে দিয়ে, হাসতেই থাকলো। পরে তার সদ্য প্রেমিকের মৃদু আহ্বান শুনে, ট্যাক্সির ভেতরের দিকে একবারমাত্র ক্ষুদ্র কটাক্ষ হেনে আরো হাসতে লাগলো।

ছেলেবেলা বলতে আর আমার মনে পড়ে মায়ের ঘরে মায়ের সুতোর কাজ

করা দুটি লেখা— "সোনার হরিণ কোন বনেতে থাকো ?"— আর — "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।" ছেলেবেলা থেকে, কতবার যে মেলাতে চেষ্টা করেছি, 'কোন্ বনেতে থাকো ?'— এই প্রশ্নের উত্তরে— 'সোহাগ করে যে.. সেই বনেতে'...নাহ্ হচ্ছে না, কোনোদিন হয়নি আমার মেলানো।

(অবান্তর বর্তমান)

বসন্ত কেবিনে রুমার সঙ্গে চা খাচ্ছি এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায়, রুমা হঠাৎ 'তোমার হেমন্ত' বলে কোণের টেবিলে আমার দিকে পিছন করা কয়েকজন বন্ধু ও দু-জন বান্ধবীর সঙ্গে বসে আছে হেমন্ত, তার চওড়া বিশাল পৃষ্ঠদেশ চেয়ারের ওপর ছড়িয়ে আছে, আমাকে দেখালো। আমার বন্ধুপ্রীতি রুমাকে স্তিমিত ও ঈর্ষান্বিত করে তোলে, তাই মোটা হেমন্ত সম্পর্কে আমি কোনো উৎসাহ বোধ করি না সেই মুহূর্তে। কিছুক্ষণ পরে, আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে এল হেমন্ত— 'দেখেছিস্ তবু ডাকিস্নি'— বিশাল স্থূল শরীরে হাঁসফাঁস করতে করতে রুমার দিকে তাকিয়ে— নাকের পাশে ছোট, গোলাপী নতুন ব্রনটার দিকে তর্জনী তুলে— 'কি হয়েছে এখানে'— বলে উঠলো। মিষ্টি ও অপ্রস্তুত হেসে— 'কি যেন হয়েছে, খুব ব্যথা করে হাত দিলে'— এরকম কিছু বলে রুমা ও আমরা কিছুক্ষণ অর্থহীন কথাবার্তা বলে যাই। একই সঙ্গে হেমন্ত ও রুমাকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে বিভ্রান্তিকর— রুমা বুঝে ফেলে এবং ঠিক সেসময় হেমন্তর চশমা-পরা একটু-দাঁত-উঁচু বান্ধবী তার দিকে তাকাতেই আমরা তিনজন একসঙ্গে উঠে পড়ি, হেমন্ত তার বন্ধুদের দিকে ও আমরা বাইরে চলে যাই। পরে অনেকক্ষণ আমার বন্ধুপ্রীতি, এলোমেলো জীবনযাপন, অন্তহীন মদ্যপান ও শেষশেষ রুমার সম্পর্কে উত্তাপহীনতা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ অনুযোগ শুনতে থাকি, যথারীতি মাঝে মাঝে রুমা তার মায়ের গল্প, বৌদির গল্প, দাদাদের গল্প, বাড়ির ভৃত্য রামনাথের গল্প, বিবাহিত প্রিন্সিপালের সঙ্গে রেখাদির ভালোবাসার গল্প ইত্যাদি বলে যায়। বলে যেতে থাকে, আমি শুনি, শুনতে, সত্যি, ভালো লাগে, রুমার সপ্রাণতা প্রফুল্ল করে রাখে।

শুধু, একসময়, অনর্গল কথা বলার স্রোত যখন থেমে আসে, আশ্চর্য— একসময় আসেই, রুমা তখন, প্রাত্যহিক অনিবার্যতায় জয়তীপ্রসঙ্গ তোলে, ও আমাকে অনেকবার করা কয়েকটি প্রশ্ন পুনর্বার করে, যেমন আমি আজীবন অবিবাহিত থাকতে চাই কেন, জয়তী জেল থেকে ছাড়া পেলে আমি আবার তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো কিনা, রুমার মত একজন নির্বোধ আবেগসর্বস্ব মেয়েকে আমি সহ্য করে যাই কেন, যখন আমি তাকে মন থেকে ভালোবাসতে পারি না...।

এই মহিলা, ইনি শিল্পী, ছবি টবি আঁকেন বেশ ভালোই, সুতরাং অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ। পিতৃদেব যথেষ্ট ধনী সুতরাং, আদরে ও আলস্যে বেড়ে উঠেছে শরীর, যেটা ততো পরিণত নয়। তবে তীক্ষ্ণ, বড় অনভিজ্ঞ ও সেকারণ, বেশ অবিন্যস্ত। এঁর পিতৃদেব একদা আমাকে ডেকে বলেছিলেন মাই ডটার হ্যাভ্ সাম্ আনকন্ট্রোলেব্ল্

হুইম্‌স্‌। লিভ্‌ হার অ্যালোন। ইয়ং ম্যান, গো হোম অ্যান্ড্‌ মেক্‌ ইয়োর কেরিয়ার।... আমাকে কিছু বলতে দেয়নি রুমা।... খুব ছেলেবেলায়, এক প্রায় মধ্যরাতে— যখন রুমা প্রায় জ্বরে অচৈতন্য, তখন তার মা তার পাশ থেকে উঠে ধীর পায়ে বাবার ঘরে চলে যান, ইনি তাই মাতৃদেবীকে ক্ষমা করবেন না ইহজীবনে কদাপি।... বৌদিকে, বিয়ের পরদিন, এক অচেনা যুবকের সঙ্গে কণ্ঠলগ্না দেখে ও আপন দিদিকে, বিয়ের দশবছর পরে দেওরের সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক যৌনতায় ব্যাপৃত দেখে, মানবিক সম্পর্কের অন্তরীন শূন্যতাগুলি জেনে ফেলেন, ও 'আমাকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ না'— ইত্যাদি বোধের মধ্যে অন্ধের মত পথ হাতড়ান। একবার, পরীতে, সমুদ্রসৈকতের অনতিদূরে— এক নির্জন ভগ্নস্তূপাকার সাদা পোড়োবাড়ি ইনি দেখেছিলেন, দরজা-খোলা-যায়-না এরকম বালির স্তর জমে আছে উঁচু পাহাড়ের মত দরজার ওপারে, এক রহস্যময় সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা উঠে যাওয়ার পর, ভয়াবহ এক নির্জনতা ও নিষ্প্রাণতা তাকে তাড়িত করে। আক্রান্ত করে আরো বেশী। আর একবার, ট্রেনে ভ্রমণের সময় এক প্রসন্ন প্রদোষে, দিগন্তের কাছে এক একাকী তালগাছ দেখে বড় মুগ্ধ ও প্রায় বিক্রীত হয়েছিলেন; ও তিনি ইহজীবনে সেই 'একটি তালগাছের' কাছে পৌঁছতে চান, একবার, যে কোনো মূল্যে...।

'...ইয়েলো শার্ট আর ফ্রেম চোখে, তার নিচে তুলনাবিহীন দুটি চোখ, ঘনপক্ষ্ম, সামনের একটা দাঁত একটুখানি ভাঙা তাই আরো সুন্দর দেখায়, হাত দোলাতে দোলাতে হেঁটে আসা চলে যাওয়া, সিগারেট ধরানো, তোমার সব, স-ব আমার প্রত্যেক মুহূর্তে মনে পড়ে, তুমি, তুমি জানো না আমি এক মুহূর্ত্তও তোমার কথা না ভেবে থাকতে পারি না... জানি, তুমি আমার থেকেও জয়তীকে অনেক বেশী ভালোবাসো, আমার ব্যাপারটা তো শুধু আমারই, কি করবো বলো, আমার উপায় নেই তোমার কাছে না এসে,... জয়তীকে আমি শ্রদ্ধা করি, জেলের মধ্যে ওকে আরও কতদিন রাখবে কে জানে, নিজের সুখ স্বাস্থ্য কেরিয়ার সমস্ত বিসর্জন দিয়েছে সে... কিন্তু আমি তো পারিনি, আমাকে যে বিশ্বাস করেনি কেউ, বড়লোকের মেয়ে, ঠাট্টা করেছে, অনভিজ্ঞ বলেছে, ইমোশনাল বলেছে, পাগল বলেছে, কত কি-যে...। ভারতবর্ষের জনগণ ? আমি তাদের চিনি না। আমি শুধু আমার মানুষটাকে চিনি, তাকে ভালোবাসি। ব্যাস্‌। আমি, আর কিছু জানি না। ...শোনো, আমার ঠাকুমা যখন মারা যায়, আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি, বালবিধবা তাই মাছ খেতেন না, তিনতলায় ঠাকুমার ঘরে খুব একটা যেতো না কেউ, আমাকে কি-যে ভালোবাসতো ঠাক্‌মা, একদিন ভোররাত্তিরে বাথরুমে যেতে গিয়ে পড়ে গেল আর মরে পড়ে রইলো অনেকক্ষণ, সকালবেলা আমিই প্রথম দেখলাম। জানো, তখনও বুঝতে পারিনি, মাকে বললুম, ঠাকুমা মাটিতে পড়ে আছে, কথা বলছে না, তারপরে মায়ের কান্নার শব্দ আমাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করেছিল, মানুষটাকে তোমরা... আর জানো, আগের দিন রাত্তিরে ঠাকুমা আমার কাছে একটা মাছ খেতে চেয়েছিল, খুব সতর্ক

আর সন্ত্রস্ত হয়ে— 'একটা মাছ দিবি আমায়, কেউ দেখতে পাবে না'— সেই কণ্ঠস্বর আমার মনে পড়ে এখনো, শোনো, আমার কি ঠাকুমাকে মাছ এনে দেওয়া উচিত ছিল, লুকিয়ে? আমি বুঝতে পারি না। সারাজীবন যে মাছ খায়নি, মৃত্যুর আগে তার অন্তিম লোভ মেনে নিলে কি ক্ষতি হয় মানুষের! আমি বুঝতে পারি না।... আমি খুব অবিন্যস্ত, না? কি রে বাবা, সবাই বুঝে ফেলে, তো, কি আর বলবো। আমি এরকম; বাড়িতে আমার কাউকে ভাল্লাগে না, দিদি খারাপ, বৌদি খারাপ, সবাই খারাপ। কেউ কারুর ঘরে যায় না। দরকার ছাড়া কথা বলে না, কেউ কারুকে বোঝে না। সবাই কিরম একলা একলা থাকে। আর তোমাদের— একটা ঘর। অতগুলো মানুষ কত কাছাকাছি আছে, বাইরে থেকেও কাছাকাছি, অন্তরেও। কি সুন্দর। ...সেদিন সকালে, তোমাকে ডাকতে গেলাম, তুমি কি-যে ঘুমোচ্ছিলে, শিশুর মতো, কুঁকড়ে মুকড়ে, হাত-পা গুটিয়ে, মুখটা কি অসম্ভব পাপহীন, কি নির্মল, আর আমি সেই মুহূর্তে মনে মনে বললুম— 'এই মানুষটাকে আমি পৃথিবীর আর সব কিছুর থেকে বেশী ভালোবাসি।'...

(আততায়ী হন্তারক অতীত)

আমি নই, আমি-ভিত্তিক, আমার চোখ-মুখ কথাবার্তা কালো ফ্রেমের চশমা ঘন চুল ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত একটি কাল্পনিক অবাস্তব সত্তাকে ভালোবাসে রুমা। জয়তীও, জয়তী মজুমদারও পারেনি এই অনিবার্য উত্তরণআশ্রয় থেকে দূরে থাকতে, আমার মধ্যে এক প্রাজ্ঞ নির্ভরসাপেক্ষ ব্যক্তিত্বের উন্মেষ তার অভিপ্রায় ছিল; অথচ দাড়ি কামিয়ে আমি ব্লেড ধুয়ে রাখতে ভুলে যাই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করি, বস্তুত স্বভাব-অলস, তেমন দায়িত্ববান বিস্তৃতবক্ষের পুরুষ নই, আমি নই। প্রেসিডেন্সি জেলে, বিপ্লবপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ততার কারণে, শীর্ণা, তন্বী, চোখে-চশমা, বুদ্ধিদীপ্তা জয়তী মজুমদার এখন কারাবৃতা। নার্সিংহোম থেকে দ্বিতীয়বার সহজ জীবনযাপনে ফিরে আসার পর যখন যোগাযোগহীন সম্পর্কবিহীন পারিপার্শ্বের অন্য অনেক মানুষের সঙ্গে ছিল আমার নিরুত্তাপ বসবাস, এই জয়তী মজুমদার আমাকে তখন ফিরিয়ে দেয় অনেক ঐশ্বর্য্য, সম্ভাবনাময় মেরুদন্ড ও সাহচর্যের এক ঘনিষ্ঠ মায়াময় সংযোগ যা আমাকে সেই দ্বিতীয় জন্মের বিকাশ ও বিবর্তনে বড় আত্মীয়ের মতো লালিত করেছে। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়িতে এক নরম পউষের শান্ত সন্ধ্যায়। যখন আপাত-পলাতক জীবনের সাময়িক আশ্রয় ছিল তার সেই বান্ধব-আত্মীয়ের গৃহ। সেই দীর্ঘ সান্ধ্য আলাপের পর জয়তীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় দেখা ঠিক এক বছর পরে, তার নিজের বাড়িতে— অন্য এক পউষের বিকেলে গভীর ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ডেকে দিয়েছিল সে: এসো। অবিন্যস্ত কেশরাশি খোলা পিঠে বুকের ওপরে, হালকা নীল তাঁতের শাড়ি ছিল গায়ে, তুমি হিম হেসেছিলেঃ এসো। তারপর তিনবছর অনেক অনেকবার

দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে জয়তী, কথা হয়েছে অনেক। পৃথিবীতে একমাত্র অনিবার্য বলে তোমাকে জেনেছি; খুলে দিয়েছি হৃদয় ও আত্মা, এক করুণ ও অনিবার্য স্বীকৃতির সঙ্গে তুমি উপেক্ষা করোনি। কিছুটা আপ্লুত হয়েছিলে শুধু। তোমার এক আশ্চর্য মাত্রাবোধ ছিল জয়তী, তুমি যার মধ্যে নিবিড় ছড়িয়ে দিয়েছিলে নিজেকে। কোনোদিন তার থেকে বাইরে আসোনি। করণীয় কাজের উচিত বা অনুচিতের এক আশ্চর্য অভিধা ছিল তোমার, পরিবৃত ছিল, তোমার সীমানা।

বস্তুতঃ আমি ভাবি, রাজনীতি সেই লালবর্ণ মদ, জনগণ নামের নীলাভ পানপাত্রে ভরে যাকে পান করা হয়, আমাদের দেশে। সামগ্রিক বলে কিছু নেই, ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির পাঁকে ডুবে আছে সব আয়োজন। তবু কেন জয়তী বলবে— রাজনৈতিক একাত্মতা না থাকলে সব সম্পর্কই হয় শারীরিক, আর্থিক সঙ্গতিনির্ভর? প্রায় সে-কারনেই তার সঙ্গে আমার কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক হল না। সেও পারল না চিরকালীন কোনো সম্পর্কে পৌঁছতে আমার সঙ্গে।.... রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছাড়া যারা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে না, জয়তী তাদের প্রতিভূ।...আর 'শোষিত জনগন', 'নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব'— ইত্যাদি পরিবাহক শব্দের দিকে আমার যাত্রা প্রায় অতর্কিত, অনধিকার-জনিত। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বালকবয়স থেকে আমার বেড়ে ওঠা, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, কালক্রম ও প্রতিধ্বনি।... এই প্রতিধ্বনির কাছে তুমিও হেরে গেছো, জয়তী। জানি না, আবাল্যের রাজনীতিময় পরিমন্ডল তোমাকে আপন পক্ষ্মের নিচে ঢেকে না নিলে, সে কেমন হতো। সম্ভবতঃ 'শোষিত জনগণ'— ইত্যাদি শব্দবন্ধের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত হতে না দিয়ে— 'মানুষ'— এই শব্দটির কাছে ঋনী থাকতে পারতে।...

আপাততঃ এক ক্লান্ত ও অবধারিত দর্শকের মতো, এক ছদ্ম পরিব্রাজকের মতো, এক অলস ও উত্তেজনাহীন কুঁজো কেরানীর মতো, একজীবনের এ তুচ্ছ আয়ুভাগ অতিবাহিত হোক। মহান নই, আমি আর্ত আত্মনেপদী।

(ও নির্মম দোলাচল)

এবং আপাত-দিন এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায়; বাড়ি ফেরার সময়, বন্ধ গলির অস্পষ্ট অন্ধকার-আচ্ছন্নতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, দরজায় কড়া নাড়লে, কিছুটা সময় আমার চারপাশে সহায়হীন ঝুলে থাকে, মাথা ঝুঁকে আসে বুকের ওপর, কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসে মা দরজা খুলে দিয়ে 'কেন এত রাত' ইত্যাদি; বারান্দার স্বল্প আলোয় মায়ের শাদা অসম্ভব সুন্দর মুখশ্রী, খুব হাহাকার শব্দ বহে যায় বুকের ভেতর, মা আমার মা, আমি তোমাকে...। ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা নেই কেন পৃথিবীতে আর...। ঘুম ভাঙলে পাশ ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার দৃশ্য ও অফিসে বিকেল হয়ে আসছে, ক্রমশঃ এক অভ্যস্ত ক্লান্তি ও তার অভ্যস্ত বিনোদন সেই সন্ধ্যাবেলা, অনাদির ঘর কিম্বা রুমা এবং রেস্তোঁরা, রুমার হাসির শব্দ হাসির শব্দ, রুমার অবান্তর কথা বলা এবং কথা বলা, ক্লান্তি ঠিক কিভাবে যে পরিশ্রুত

হচ্ছে তা স্পষ্টতঃই পর্যবেক্ষনের মধ্যে রুমার স্লিভলেস জামার প্রান্তে বাহুমূলে হাত রাখা এবং না রাখা, রুমার নাক, নাকের ওপর ঘাম ও ছোট ছোট চোখের অস্থিরতা। খুব দীর্ঘ খোলামেলা প্রান্তরের ওপর যেমন সন্ধ্যা, নেমে আসবে ঘুম আমার দু-চোখের পাতার নিচে; আর তখন, রুমার নাভির স্পষ্ট স্মৃতি, নাভিমূল যেহেতু দেখিনি এবং কোমরের মাংসল খাঁজগুলি অন্ধকারে ঘুমের পর্দায় বড় চমৎকার কাঁপতে থাকবে, কাঁপতে থাকবে।

আর বাড়ি ফিরে আমার দু-বছরের ছোট্ট বোনকে কোলে তুলে নিলে সে স্বচ্ছ নির্ঝরের মতো স্রোতময় হেসে উঠবে ও আমি এক পরিত্রানমুখরতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকবো, মনে হবে, মনে হবে, আহ্— কি ভীষণ বেঁচে উঠছি আমি। দেওয়ালে কালো ধোঁয়ার দাগ ধরা চিল্‌তে রান্নাঘরে খুব ঘেমে-যাওয়া মাকে হঠাৎ খুব তুচ্ছ কারণে অহেতুক হাসিয়ে দিয়ে সেই অপার্থিব সুখসিক্ত মুখ দেখতে দেখতে মনে হবে— কি ভীষন বেঁচে উঠছি আমি। পুরনো প্রিয় বই বিক্রি করে ভাইকে খাতাপেন্সিল কিনে দিয়ে মনে হবে— সত্যি, বেঁচে আছি।

(মধ্যপথের প্রার্থনা)

অদূরে, সমুদ্রশব্দ নিরন্তর, পিছনে বনঝাউবীথি, অবিন্যস্ত দীর্ঘসার— মধ্যে বালিয়াড়ি ; এখানে সৈকত, দৃষ্টি যত দূর যায় মানুষ নেই, এমন নির্জন। সংখ্যাহীন নির্লজ্জ নক্ষত্র ঝুঁকে এসেছে প্রায় কাঁধের খুব কাছে, আকাশ এমন পরিচ্ছন্ন ; বালির স্তূপের পাশে পা ছড়িয়ে দু-হাত পিঠের পিছনে দিয়ে স্বচ্ছন্দ বসে আছে রুমা, কৃষ্ণপক্ষ, নক্ষত্রের আলোয় তার চোখ দেখা যায় না। শীত ঋতু।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ও তার পরিবাহক সংলাপ স্তিমিত হয়ে আসে একদা, আমার মনে পড়ে, এখানে যার আসার কথা ছিল সে এখন শাদা দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে অবসন্ন হচ্ছে ক্রমশঃ— আসা হয়নি তার কারণ খুব তুচ্ছ, অবসরহীনতা ও অযোগাযোগ— তবু কথা ছিল এ-কথা মনে পড়ে আমার— বাম বাহুমূলে মাতা রেখে ঝুঁকে আসছে রুমা। 'কেন, কেন তোমার এই আশ্চর্য মৃগয়া,' আমি এই অনুচ্চারিত শব্দবন্ধজাত নিঃশব্দ ক্রোধে বড় মমতাময় হয়ে উঠি, শরীরে এক চতুর পুরুষের সতর্ক চলাফেরা অনুভূত হয় ; তখন, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত প্রথম রাত্রের সদাউন্মুক্তনয়ন সকল নক্ষত্রের সামনে, সমুদ্রশব্দের শ্রান্তিহীন মোহমুগ্ধতায়, আমি রুমাকে অনাবৃত হতে বালি, নির্জন বালিয়াড়ি ও শব্দমথিত সমুদ্রের আদিম আকর্ষণের কাছে তাকে ছলনাহীন, অকৃত্রিম ও উন্মুক্ত হতে বলি, চুমু খাই, অদ্ভুত শীত করে ওঠে। সমুদ্রবাতাস হিহি করে ঢুকে যায় প্রতি রোমকূপে। কিছু দ্বিধাগ্রস্ততা ও স্বভাবসুলভ লজ্জাবনতা এক সময় দুর্মর ভেঙে যায়, কিছু দূর থেকে নক্ষত্রালোকের স্বল্পান্ধকারে স্বপ্ননর্তকীর মতো হেঁটে আসে রুমা, পোশাকহীনা, নীল সিল্কের প্যান্টি অন্ধকারে অস্পষ্ট, অনিবার্য দু-হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে, আমি কত আদর করি তাকে।... অনাবৃত বুকে রাখি জিভ, মেদহীন মধ্যদেশে চলাফেরা করে উদ্দাম আঙুল, শ্বেতকদম্ব

ঊরুর সঙ্গে ঊরু লেগে থাকে, দূরে বহে যায় সমুদ্রশব্দ, বোধশক্তি অন্ধ ও আপ্লুত হয়ে আসে, অনন্তের মতো অবয়বহীন আরেক সমুদ্রের মধ্যে আমি তলিয়ে যেতে থাকি। এক সময় শীত সহ্যাতীত হতে থাকলে, অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠতে থাকলে, দ্রুত পোশাক পরে নিই, নির্বাক ফিরে আসি ঘরে। মস্তিষ্কে খেলা করে কিছু স্বপ্নদৃশ্য, হন্তারক অতীত, বহুদূরের কলকাতা,—ঠিক এসময় বাড়িতে, টেবিলল্যাম্প্ জ্বেলে পড়তে পড়তে আল্‌তো ঘুমিয়ে পড়েছে ভাই, তার শান্ত মুখ চকিতে মনে পড়ে। যুক্তিহীনভাবে মনে পড়ে, দূরপাল্লার ট্রেনের ব্যাংকে শুয়ে, সে অনেকদিন আগে, একদিন, মুখ বাড়িয়ে পাশের বাংক থেকে ডেকে নিয়েছিল জয়তী। স্বল্পপরিসর বাংকের ঘনিষ্ঠতায় আমরা দীর্ঘক্ষণ, সেই রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা আমাকে বড় আক্রমণ করে এখন। আরো শীত করে ওঠে। কাছে না থাকলেও একটি অস্তিত্ব আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। থাকবেও, আমৃত্যু, দ্বিধাহীন বুঝতে পারি আমি। আমার চশমা খুলে নেবার এক ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিমা চিল জয়তীর, শান্ত চোখে তার তখন আর্ত সহজপাঠ : চুমু দাও।...কিন্তু সে এখন জেলে। আর, আমি...। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা চোখের সামনে নিরন্তর অত্যাচারের চাবুক। শাদা দেওয়াল।

পরদিন, স্নিগ্ধ প্রত্যূষে, আমি সম্মোহিতের মতো উঠে আসি নিদ্রিত রুমার পাশ থেকে, অবধারিতের মতো হেঁটে আসি সমুদ্রসৈকতে, প্রায় নির্ধারিত পদবিক্ষেপে পৌঁছে যাই সেই বালিয়াড়ির কাছে, নতজানু হয়ে বসে পড়ি— বালির ওপর স্পষ্ট ও নির্মম বিগতরাত্রির শরীর- লেপনচিহ্ন— পা যেখানে ছিল সেখানে অগভীর গহ্বর, বর্তুলাকার। কত দ্রুত সমুদ্রপ্রকৃতি এই চিহ্ন অবলুপ্ত করে দেবে— আমি ভাবি। সমুদ্রবাতাস হি হি করে ওঠে। বালকবয়স থেকে উঠে আসে সমস্ত আয়োজন, দীর্ঘ জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতারাশি খুব অর্থহীন ও নিঃস্ব করে যায় হৃদয় ও আত্মা, অর্ধমৃতের মতো ফিরে আসতে চাই ; কিছুদূরে এসে দেখি, এক শুভ্র অন্তিম করোটি রুক্ষ বালির স্তরে বাঙময় অপেক্ষায় ছিল এতদিন, এতাবৎকাল। সমুদ্রবাতাস হি হি করে ওঠে। দেখতে পাই, সংখ্যাবিহীন লিকলিকে সরু শাদা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার চারপাশ থেকে, এক নির্মম শ্বেত ঊর্ননাভ, আমার সর্বস্বে তার জন্ম-জন্মান্তরের অধিকার। হায়, জয়তী— বাকি জীবনের দীর্ঘ কালক্রমব্যাপী তার সেই লাল সঙ্গমসাধ থেকে আমাকে পরিত্রাণ দাও ; আমি জানি, আমার অস্তিত্বের মতো অনিবার্য তার এই আসঙ্গলিপ্সা, অগুনতি অলীক শীর্ণ হাত দিয়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাকে সে অধিকার করছে ক্রমশঃ, আমি জানি, হিম মৃত্যু তার তুষারতুহিন স্পর্শে আমাকে এক নিশ্চিন্ত নিদ্রা দিতে পারে শুধু, ততদিন, ওই শ্বেত অদৃশ্য ঊর্ননাভ তার শাদা জাল ছড়িয়ে রাখবে।

নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠি একা! হে সমুদ্র, হে পাপহীন প্রত্যূষবেলা, হে শেষ রাত্রির নিঃসঙ্গ নক্ষত্র, আমাকে বাঁচাও, পূর্ণ ও প্লাবিত করো, আমাকে ইচ্ছেসুখে বাঁচতে দাও।

প্রভাতের হিমার্ত সমুদ্রবাতাস হি হি করে ওঠে।

কে কাকে বাঁচাবে।

দূর থেকে হেঁটে আসছে রুমা। তার চুল ও আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। নিতান্ত অপত্য স্নেহে, সৈকতে পড়ে থাকা করোটি, তুলে নিই হাতে। ঝেড়ে দিই বালি।

এ করোটি, হয়তো আমারই।

ছমছম পর্বতমালা

শাদা সর্বনাশ আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে। শংকরনারায়ণ প্রথমবার কুড়ি টাকা দিয়েছিল। নীলাঞ্জন তিরিশ। অনিকেত কিছু দেয়নি। উল্টে একটা হিশেব দিল। টিফিন এনে দিয়ে ছকু পঞ্চাশ টাকার চেঞ্জটা আর ফেরৎ দেয়নি। মাসের বাইশ তারিখে এরকম অবিচার, ইত্যাদি। হোয়াইট মিশচিফ নব্বুই টাকা এ দোকানে। পাঁচটাকা বেশী। বিপ্লব সেটা শোনাতে ছাড়েনি। রোগা লম্বা সুন্দর চেহারার ছেলেটি একই উত্তর দিয়েছিল অন্যান্য দিনের মতো। আমার ব্যাপারটা স্পেশাল জানেন তো। আসলে সেল কম। দোকান হিসেবে পোজিশনটা এত খারাপ। রাস্তার ধারে তো নয়ই। উল্টে অনেক ভেতরে। অফিস পাড়ার মাঝ মধ্যিখানে, এটুকুই যা সুবিধে। যে যার অফিস থেকে টুক টুক করে চলে আসতে পারে। জল গ্লাস পাওয়ার অসুবিধে নেই। ত্রিপাঠী আছে। সামনের ফুটপাথে তার চাইনিজের দোকান। প্যাসেজের মুখে বিশাল লোহার গেট। ঢুকেই বাঁদিকে তার রাজ্যপাট। বড় বড় দুটো জলের কলসী রকের এক কোণে। রান্নার বাসন টুকি টাকি। ছেঁড়া চটের টুকরো। পিচ বোর্ডের বাক্স। তার পিছনে অনেক গ্লাস। বাবুদের দিতে হয়। মরা মরা অফ্ শপটা একাই বাঁচিয়ে রেখেছে ত্রিপাঠী। এমনি দিনে যেমন তেমন, ড্রাই ডেতে বিক্রি সবচেয়ে বেশী। ত্রিপাঠী আগে থেকে তুলে রাখে। দাম একটু বেশী। কিন্তু অফিসপাড়ায় হাতের কাছে, দোকান বন্ধের দিনে জল গ্লাস সহ... প্লাস বসার জায়গা। এত আর কে দেবে ত্রিপাঠী ছাড়া! অনিকেত জিগ্যেস করেছিল একদিন— কেন এত করে ত্রিপাঠী। আমাদের অ্যাটেন্ড করে ওর তো কোনো লাভ নেই। অনিকেত আসলে সাউথ মার্কা আছে একটু, দক্ষিণ কলকাতার ছেলেরা এরকম অনেক সহজ ব্যাপার বোঝে না। ত্রিপাঠী খদ্দেরদের হাতে রাখে— এতো সিম্প্ল্ কেস। বিপ্লব বুঝিয়েছিল অনিকেতকে। কিন্তু তার জন্যে এত? অনিকেতের সন্দেহ যায় না। ও খারাপ ব্যবহার করলেও আমরা তো ওর কাছে থেকেই কিনতাম। এ তল্লাটে তো আর কোনো ঠেক নেই। জলটল না দিলে অন্য জায়গায় খেতাম। ও এত দেখাশোনা করে কেন আমাদের। মনে মনে বিরক্ত হলেও কথা বাড়ায়নি বিপ্লব। কি জানি, ত্রিপাঠীর বোধ হয় পরোপকারের রোগ আছে। অনেকের থাকে না? বলেছিল।

আজ তুঘলক আসেনি। আসল নাম কি ছিল আজ আর মনে নেই কারুর।

তুঘলককে দেখলেই অন্যরা লাফিয়ে ওঠে আনন্দে। তিন চার ঘণ্টা কোথা দিয়ে উড়ে যাবে, বোঝা যাবে না। এত মজা দিতে পারে তুঘলক। কথা বলে যেতে পারে অনর্গল। সবচেয়ে বড় কথা, তুঘলকের টাকা বেশী থাকে কাছে। ফুরিয়ে গেলে, এ পকেট ও পকেট ঘেঁটে দু-তিনটে দোমড়ানো মোচড়ানো একশো টাকার নোট তো বের করেই যখন তখন।

জায়গাটা আবিষ্কার করেছিল ভিকি। বিক্রম। দু-দুটো খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, এন্তার শেয়ার কিনে, এখন কাঠ বেকার— লায়েন্স রেঞ্জে যাতায়াত করার পথে, জায়গাটা পেয়ে যায় ভিকি। প্যাসেজের দু ধারে রক খানিকদূর ওব্দি। সেখানে দিনদুপুরে লোকে বোতল খুলে বসে আছে, গেটের সামনে পুলিশ, পাহারায়, দেখেও দেখছে না— ব্যাপারটা চোখে লাগে ভিকির, একটু খোঁজ করতেই পেয়ে যায় ত্রিপাঠীকে। এত কাছে, প্রকাশ্য দিবালোকে। ভাবা যায়! সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই বলেছিল ভিকি— বিদায়, বার-সভ্যতা। খরচ কমল মনে হয়। একদিনের খরচে তিন দিন চলবে।

বিপ্লব বলল— খালি মনে হয় পালিয়ে যাচ্ছি। একটা পরিবেশ থেকে আর একটা পরিবেশের দিকে পালিয়ে যাওয়াই আসলে বেঁচে থাকা। ঘুম ভাঙলে বাড়ির চারপাশের অবস্থাটা থেকে পালিয়ে আসি অফিসে। দুপুরের পর থেকে অফিসটা অসহ্য লাগে। তখন পালিয়ে আসি ত্রিপাঠীর কাছে। খানিকটা নেশা হয়ে গেলে মনে হয়, ধার বেশী হয়ে যাচ্ছে। নেশা বেশী হয়ে যাচ্ছে। এবার গোলমাল হবে। তখন পালাতে চাই বাড়ির দিকে। বাড়িতে আবার বৌ বেশী ঝামেলা করলে মনে হয় পালিয়ে যাই বিপাশার দিকে। বিপাশা বেশী অভিমান করলে মনে হয়, বৌ কি ভালো।

এসব শুনে সবচেয়ে বেশী হাসে শংকরনারায়ণ। হাসতে শুরু করলে সে থামতে পারে না সহজে। রিজার্ভ ব্যাংকের ওপাশে একটা বেঁটে মতন বটগাছের তলায় মাজুম পাওয়া যায়। শংকরনারায়ণ সেসব কিনে রাখে। সারাদিন মাঝে মাঝে খায়। তাই হাসে বেশী।

সে হাসি দেখে অন্য একজনের হাসি হাসি মুখ মনে পড়ে গেল বিপ্লবের। নিউলাইফ নার্সিং হোমে। একই রকম দাড়ি। সব সময় হাসি হাসি মুখ। বিপ্লব ওই নার্সিং হোমে একবার জীবন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, অনেকদিন আগে। সেখানে ছেলেটি ঘুরে ফিরে আসতো, হাসতো আর বলতো, জানেন— আমি না আসলে যিশুখ্রীস্ট। মোট পনেরো দিন থাকতে হয়েছিল তাকে সেই অ্যাসাইলামে। ব্রেনে ইলেকট্রিক শক দিতো রোজ। মনে হতো, সুইচটা এক-দু সেকেন্ড বেশী টিপে রাখলে, মানে ভুল করে টিপে রাখলে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই, একদম মরে যাবে বিপ্লব। তা অবশ্য হয়নি। উল্টে ঠিক হয়ে গেল সব। অতিরিক্ত রাতজাগা, শুকনো নেশা— সব বন্ধ। সিগারেট পর্যন্ত খেতো না। মানে খেতে দিত না কেউ।

মানে নার্সিং হোমে। কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল নার্ভ। অতিরিক্ত ধূমপান, রাতজাগা, গাঁজা চরস হেরোইন, সব দিয়ে যা খারাপ করে ফেলেছিল বিপ্লব। সেসব অনেক, অনেকদিন আগের কথা।

চরস উঠে গেল কলকাতা থেকে হেরোইন তাড়াতে গিয়ে। বাজারে এল নিপ। একার পক্ষে এক সন্ধ্যায় যথেষ্ট। সরকারের ইনকামও বাড়ছে। শুকনো ভুলে গিয়ে জলের দিকে যাচ্ছে পাবলিক। ভিকির সঙ্গে সদর স্ট্রিট বা পার্ক লেন থেকে হঠাৎ তোলতাই। থানায় দু-তিন ঘন্টা বোকা হয়ে বসে থাকো। তারপর এন্তার উপদেশসহ মুক্তি। তারপর আবার পার্ক লেন কিংবা একবালপুর কিংবা টেরিটি বাজার কিংবা রাজাবাজার। নীল আলোর ঘর ছিল বড় বড়। ব্যাংক অফিসার থেকে মেডিকেল স্টুডেন্ট কতরকম লোকজন ছেলেছোকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে থাকতো। আর ঘুরতো ছিলিম। ধোঁয়া। ঘরে ও জীবনে। তখন চেনা লোক দেখলে ভয় পেত বিপ্লব। আবার কথা বলতে হবে। মানুষের বেশীর ভাগ কথাই তো অবান্তর।

তখন অফিসে শুধু সইটা করতো বিপ্লব কোনরকমে। ঘন্টা দুয়েক এদিক ওদিক করে, অ্যাসোসিয়েশনের নেতা, কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি— এরকম দুচার জায়গায় ঠেকা দিয়ে চলে আসতো রাজাবাজার বা টেরিট্রি। মোগলের ঠেকে একটা হরিণ ছিল, টেরিট্রিতে। সেটাকে ঘাস খাওয়াতো বিপ্লব। চাকরিটা নেহাৎ সরকারি বলে বিপদে পড়েনি খুব একটা।

শংকরনারায়ণ একটা গল্প শোনালো। দাম্পত্য অশান্তির গল্প। বড় প্রকাশনা থেকে নীলাঞ্জনের উপন্যাস বেড়িয়েছে। তার মতামত জানতে চায় শংকরনারায়ণ। অনিকেত খেয়ে যাচ্ছে চুপচাপ। বিকেলের আলো সন্ধের অন্ধকারে মিশে যাবে আর কিছুক্ষণ পরে। তার মধ্যে শেষ করতে হবে গল্পটা। সব অফিস ছুটি হয়নি বলে নিজের রকে বসতে দেয়নি ত্রিপাঠী। এটা একটা বাতিল সিঁড়ি। ভেতর দিকটা ঘুটঘুট্টি, অন্ধকার। দরজার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে লম্বা নীলাঞ্জন, তার বুকসমান উঁচুতে গল্পের পাতাগুলো ধরে আছে শংকরনারায়ণ। পড়ছে— অভাবীদের কোনো যৌনতা হয় না।

হয় না কি! পিছনের অন্ধকার সিঁড়ির ধুলোর মধ্যে ভূতের মতো বসে শাদা সর্বনাশের গ্লাসে, মানে হোয়াইট মিশচিভ ভদ্‌কায়, চুমুক দিতে দিতে ভাবল বিপ্লব। অভাবীদের কোনো যৌনতা না হলে, ফুটপাথে এত বাচ্চা জন্মায় কী করে। গল্পের বাকি লাইনগুলো কানে ঢুকছে না। মাথায় কাজ শুরু করে দিয়েছে শ্বেত সন্ত্রাস। রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে তরল আগুন।

চরসে এরকম হতো না একেবারেই। টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার ধারাটা পাল্টে যেত। ফাঁপা হয়ে যেত মাথাটা। কি ভাবছিলাম একটু আগে, মনে পড়তো না। বিপ্লব ভাবল এখন। মদ অন্য জিনিস। খামোকা গরম হয়ে যায় মাথা। বেশী খেলে গোলমাল হয়। আজও হবে। কি ভাবে, কার সঙ্গে, কখন হবে— কে

জানে। নীলাঞ্জনের সঙ্গে হবে না। ওর মাথা খুব ঠাণ্ডা। ব্যাংক অফিসার। নিজেরা কাগজ করলে বিজ্ঞাপন দেবে বলছে। কম বয়সে লিট্‌ল ম্যাগ করতো। এখন বড় কাগজ ছাড়া লেখে না। অভিজ্ঞতার অভাব নেই। মনে হয় যেন নীলাঞ্জন জীবনের সব দিকটাই বোঝে। তুঘলকের মতো শুধু যে-কোনো-মূল্যে আমোদ-চাই ধরনের খ্যাতিপ্রিয় নিষ্ঠুরতম অহংকারী বোকা নয়। কিংবা বিক্রমের মতো অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান-বুদ্ধিমান; অতএব বুঝে-নেব-যে-কোনো-শালাকে জাতীয় অত্যাচারপ্রিয়ও নয় মোটেই। বেশ সেন্সিবল। কেউ বাজে বকলে তাকে এড়িয়ে যেতে জানে। জড়িয়ে পড়ে না।

শংকরনারায়াণ পড়ে যাচ্ছে : ললিতা পাশ ফিরে শুলো। দীপংকর জানে, এখন পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলে খ্যাঁক করে উঠবে ললিতা।...

এইটুকু শুনেই বিপ্লব আবার হাতের এক গ্লাস সর্বনাশ এক চুমুকে শেষ করে ফেলল। মাথাটা শাদা হয়ে যাচ্ছে। অনেক পুরনো একটা ঝাপ্‌সা রাত মনে পড়ল। বিছানায় বালিশের বদলে একদিন বোতল সাজিয়ে রেখেছিল মল্লিকা। সেসব কথা আর ভাবতে চায় না বিপ্লব। খালি-বোতল বিক্রি করবে বলে একটা শিশিবোতলওয়ালা ধরে এনেছিল বিপ্লব। চিৎকার করে উঠেছিল মল্লিকা— ফ্ল্যাটের দরজায় তুমি সক্কলের সামনে বোতল বিক্রি করবে? আমি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো! নিঃসন্তান চোদ্দটা বছর যে কি ভাবে কেটেছে। ঝগড়া করে করে এমন হলো, বিপ্লব রোজ স্বপ্নই দেখতো— ঝগড়া করছে মল্লিকা! কোর্টে যেদিন মিউচুয়াল ডিভোর্সের মামলায় জজ জিগ্যেস করল মল্লিকাকে— কেউ জোর করে সইটই করিয়ে নেয়নি তো? তখন ভারী হাসি পেয়েছিল বিপ্লবের। ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে বলে— জোর করে সই তো আমাকে করিয়েছে মল্লিকা। সবসময় ছেলেদেরই শুধু অত্যাচারী ভাবা হয় কেন যে!

বিকেল শেষ হয়ে গেল। গল্পও শেষ। এখন আলোচনা চলছে। মনস্ক বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে নীলাঞ্জন। বাতিল সিঁড়ির অন্ধকার থেকে নিচে নেমে এল বিপ্লব। অন্যরাও নামলো। এখন রকে বসতে আপত্তি নেই। হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠলো অনিকেত। ভিকি তুঘলক আর অনিন্দিতা আসছে। আজ জমে যাবে। কেউ কিছু বলার আগেই বিপ্লব আর একটা আনতে গেল। আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়। পেটে মাল পড়লেই অনিন্দিতা গানটান গায়। বেশ লাগে তখন। ওর প্রথম স্বামী ব্যাংক অফিসার ছিল নীলাঞ্জনের মতো। তবে লেখক ছিল না। কবি-বৌকে মেনে নিতে পারল না বেশীদিন। মিউচুয়াল কি ছিল ওদের কেসটাও? কে জানে। ছিল না বোধহয়। ওদের তো মেয়ে আছে। এখন কার্শিয়াঙে থাকে। ডাউহিলে পড়ে। অনিন্দিতা কলকাতায় চাকরি, আড্ডা, মদ, কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি করে। মৃত্যুশয্যায় মা নাকি বলেছিল ওকে— বয়স হলে দেখবি, কেউ ঠিক কাছে নেই।... কবিতা লিখছিস্ লেখ, তার জন্যে জীবনটাকে মরুভূমি করে ফেলার কী

দরকার।... এসব গল্প বলার সময় অনিন্দিতা কেমন একটা খুকখুক করে হাসে। উপেক্ষার হাসি? কবিতা লিখলে জীবনকে উপেক্ষা করার এত শক্তি পাওয়া যায়? কে জানে। অনিন্দিতার সঙ্গে মেশাটাই বেশ বিপজ্জনক। আজকাল আর কারুর সঙ্গে নিজেকে অবশ্য খুব বেশী জড়িয়ে ফেলে না। আড্ডায় মদ পেলে জলের মতো খায় আর হাসে। খুব হাসে। আর গান গায়। প্রায় সর্বস্ব দিয়ে গায়। কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো। প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো।... তখন যেন চেহারাটাই পাল্টে যায় অনিন্দিতার। কে শুনছে তার গান, কে শুনছে না— এমন কি, সে নিজে কোথায় বসে আছে, কেন যেন মনে থাকে না তার এসব কিছুই। শুধু গেয়ে যায়— না বাঁচাবে আমায় যদি, মারবে কেন তবে।... অনিন্দিতার কবিতার যেমন তেমন— গানের ভক্ত যে কে নয়! গতবছর সে চ্যালেঞ্জ করে সব কটা বাঙলা বাণিজ্যিক পত্রিকার পুজোসংখ্যায় কবিতা লিখেছিল।

জিগ্যেস করতে অনিন্দিতা বলল, ধুস্। ওরা তো কেউ কিছু মনে রাখে না। ওদের আসলে পাতা ভরানোর দরকার। যাকে হোক পেলেই হলো। তিন-চার জন সিনিয়র আছেন— নেহাৎ তাদের লেখা না ছাপলে ইজ্জত থাকে না। তাই—।

—ইজ্জৎ?

—ওই আর কি! এদের ইজ্জৎও খুব জটিল। একজন বিখ্যাত কবি তো ওদের ব্যবহারে রাগ করে তিন-চার বছর লেখাই দেননি। গতবছর একটা কবিতার জন্য আটহাজার টাকা পেয়েছেন। টাকাটা নেবার সময় তো প্রতিষ্ঠানকে খারাপ লাগেনি!

বেশী নেশা হয়ে গেলে পুরুষ বন্ধুদের খুব আওয়াজ দেয় অনিন্দিতা— কি, বৌ বকবে? ভয় করছে নাকি!

দুই

জলযান, টলমল করে ওঠে, ছুঁড়ে দিয়েছি হার্পুন সমস্ত নৈপুণ্য দিয়ে— তিমি ওই ডুবে গেল জলের অতলে পুনর্বার, জলে ঢেউ, লক্ষ্য বিফল হলো ফের। ওই তিমির ছদ্মবেশে কে তবে? ছলনা না সার্থকতা? অলৌকিক, ভ্রষ্ট কোনো অধিদেবতার অতর্কিত রসিকতা নাকি! মা বলতো, ওদিকে ছমছম পর্বতমালা আছে— ওদিকে যাস্ না। ছোটবেলায় নীলডাউন করে দিয়েছিল একবার হেডস্যার— বাড়ি ফিরে সে কি কান্না! ইস্, সবাই দেখল। আর যাবো না ওই বিচ্ছিরি ইস্কুলে। মা বলতো, ছমছম পর্বতমালা থেকে বাঘ বেড়িয়েছে, তোকে খাবে। ভালো করে পড়, মন্ত্র শিখবি, পোষ মানবে বাঘেরা, হালুম না বলে ম্যাও বলবে তখন, আর খাবে না তোকে, বরং পিঠে করে নিয়ে যাবে এক লাফে ছমছম পর্বতমালার একদম ওপারে— সেখানে অনেক তাঁবু, তাঁবুর ভেতরে কত লাল নীল হলুদ সবুজ আলো, আর কত নাচ, আর কত গান! তারপর সব জল, লতাগুল্ম, জলজ উদ্ভিদ—

মা, এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলে? মা, আমি তোমার সেই ছোট্ট টাবলুসোনা, আমি একা মাঝরাতে স্কুটার চালিয়ে পেরিয়ে এসেছি ফাঁকা হাওড়া ব্রিজ— তুমি দেখতে পাচ্ছো! কিন্তু আমার চারপাশে এত মাছ কেন? একটা ভাঙা কেবিন ঘর মনে হয় এটা, ছোট বড় মাছেরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলা দিয়ে, মাঝখানে একটা রাগী, খুনে অভিশপ্ত নাবিকের মেয়ে শুয়ে আছে নাকি, মসলিন কাপড়ে ঢাকা— অলুক্ষুণে বলে তাকে ঠুকরে যাচ্ছে বেগুলি মাছেরা, সারা গায়ে লাল ডুরে ডুরে ক্ষত— প্রতি রাতে ওরা তার রক্ত শুষে খায়। যেন গোপন সিন্দুকের সঞ্চয় ব্যবহার করে নিষ্ঠুর তেজারতি ব্যবসায়ী, বোম্বেটে মেয়ের রক্ত তবু ডানায় এত আলোড়ন কোথা থেকে আনে? সে কি তবে পরী ছিল? লেজ নেড়ে নেড়ে জাহাজ ভাসিয়ে দেয় মাছেরা আবার। ওরা কেউ তিমি ছিল না তো! এতদিন তবে কাকে শিকার করেছি? হার্পুন ছুঁড়েছি বৃথাই।

এই স্তব্ধ মধ্যরাতে কে কোথায় মশাল জ্বালালো, এত আলো, এ নিশ্চয়ই মশালেরই হবে। উৎস কেন যে যায় না দেখা। পাহাড়ের অন্য দিক থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। জয়ঢাক অবশ্যই হবে। পাহাড়? না, পরিত্যক্ত, অব্যবহৃত কোনো প্রলম্বিত কসাইখানার ধ্বংসস্তূপ? কে জানে কি, ভোর রাতে, টলমলে পায়ে দুটি শিশু নদীর কিনারে কি যে খোঁজে— চাষীর মুখের মতো কাদাজল, মাঠ পার হয়ে নদীতীরে খুঁজে পায় পোড়া নিমকাঠ, উড়ে আসা শাড়ি... আর লাল সুতোর মতন রক্ত ভেসে আসছিল পাহাড়ের গা বেয়ে, আর কয়েকটা তামা রঙ চুল জড়িয়ে যাচ্ছে কচুরিপানায়; ওই চুল কার! বনজ কুসুমের পাপড়িতে আজ কার রক্ত লেগে আছে। মা, তুমি আমার হাত ধরো— আমার এই যৎসামান্য, হত্যাকারী, অপবিত্র হাত। মল্লিকা, তুমি দেখ। মানস চক্ষে দেখ আমাকে, আমি বিপ্লব, এই ঘোর রাতে নিজের ঘরে, নিজের শাওয়ারের নিচে একা ও উলঙ্গ। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার চোখের জলে লজ্জা পাচ্ছে শাওয়ার— আমার শাস্তি হচ্ছে কি সুন্দর, দেখ। ছমছম পর্বতমালা তুমি পেরিয়ে গেছ, আমি পারি, আমি ঘুরে মরছি সেই একই গোলকধাঁধায়, আমি তাই চাই। এই স্বরচিত, অনিবার্য শাওয়ারের নিচে থেকে আমি আর কোথাও যাবো না। আমি কাঁদবো। হাসবো সকালে, আগামীকাল। যখন ভোর হবে। একটা পুরনো সূর্য যখন নতুন করে আমাকে ডাকবে। বলবে, ওঠো, বেঁচে থাকো— বলবে, ওঠো, জেগে থাকো আরও কিছুকাল। গভীর, গহন, এই গূঢ় নিরুপায় গোলকধাঁধার মধ্যে ঘোরাফেরা করো। এই তোমার নিয়তি।

তিন

এসময়, পৃথিবীতে, বিভিন্ন হাসপাতালে ও প্রসূতিসদনে, মানুষের জন্ম হচ্ছে এন্তার, আমি জানি। আমাকে তুঘলক বলে লোকে। মানুষ, না কালো বেবুনের

কর্কশ কালিমা ? জন্ম নিচ্ছে কারা ? হাসপাতালের বারান্দায় অনবরত কুচকাওয়াজ করছে মানুষের বাবার চটি। এসময়, পৃথিবীর বিভিন্ন পানশালায়— অমরতার কুমাংস নিয়ে কিচিরমিচির করছে কয়েকজন আত্মমগ্ন কবি। তারা মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। নারীকে পতিতা করে যে মানুষ, তারা কবি নয়, পতিতার পায়ে বা কোমরের বিভিন্ন খাঁজে, যে মানুষ কবিতা খোঁজে শুধু— তারা কবি। তাদের সমাজ নেই কোনো। যেমন ছদ্মবেশী চোর অথবা পকেটমার। ধরা পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তারাও মানুষ। অস্তিত্বের অভিধানমূলক বদনাম পাল্টে যায় পরে। আমরা খাই মানালি চরস গীর্জার সিঁড়িতে বসে একা, বুঝতে পারি— আঁধারে নিশ্বাস সত্য, থুতু সত্য, কেয়োকার্পিনের সুবাস সত্য, আর সত্য— কর্কটক্রান্তির নিচে আমাদের এইসব সাময়িক বসবাস, প্রেম ও বমন, আর সত্য ফুটপাথ দ্রৌপদীর হাই ও আড়মোড়া ভাঙা, ওম্, হামেশা মৃত্যুর প্রেম ও তার অমোঘ প্রণালী। ভুল টার্মিনাসে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি কতবার। বেকার, বেল্লিক ও বেতো গণিকার ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছি ডাকনাম, আমরা যারা জানি কিছু শস্তা বুলি শুধু, হয়েছি বাচাল— কখন কোথায় যাই নিজেই জানি না, মৃত্যুর আগে প্রতিবিম্ব সইতে পারে না আমাদের বিষণ্ণ পোড়ামুখ— ভুল করে এসে পড়েছি অলীক এক ফানুস উৎসবে— শেষে জলকন্যাদের খাবার টেবিলে মাছ হয়ে গেছি। তবু কেন নক্ষত্র ভেবেছি নিজেকে, শূন্যতাকে কেন মনে হয় নক্ষত্রনারীর কেশপাশ ?

জন্মেছিলাম কলকাতায়। রক্তুতুলো, চরস ও ত্রাসের এ চারণভূমিতে, মরতে মরতে মরিনি বহুবার। বরং প্রমেহ উপদংশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হয়েছি সারমেয়। স্বরবর্ণ খুঁজেছি নাভিতে।...

অবশেষে প্রবিষ্ট হয়েছি নিজস্ব সুড়ঙ্গে, কবিতার রসাতলে। কিন্তু এই বিষের শহর, আহ্। পলেস্তরা খসে পরা রঙচটা বাড়ি, মূত্রপুরীষের গন্ধবহ এই বাতাস। পসারীর চিৎকারে তোলপাড় এই ফুটপাথ, হাইরাইজ আর ঝুপড়ির মধ্যবর্তী— যত মধ্যবিত্ত বিষাদনিয়তি— কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, কোথায়! এখানে চক্কর খাই রোজ, গুমঘর লেন দিয়ে একা একা হাঁটি, ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরে হৃৎপিন্ড জড়িয়ে, বেঁচে আছি, অধোবদনে ঈষৎ, এখনও কেন যে। ভালোবাসা- ভালোবাসা খেলা, অনেকদিন তেমন জমে না।...

একুশ শতকে কি বেঁচে থাকবে কিছু ধর্ম, কিছু কোকাকোলা ? আমরা কি দেখে যাব তার ফুল্ল মুখ ? তখনও কি, তুমুল মৈথুন থেকে জন্মাবে বিদ্যুৎ-পংক্তি, কবিতার বই ? ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাবে, বৌ-ফৌ বুড়ি হয়ে যাবে, আমরা হবো নাকি কিছুটা বাতিল ? কি থাকবে তখন, ঈশ্বর ত্রিপাঠী ছাড়া ! কার্জন পার্কের ঘাসে জেগে উঠে হঠাৎ দেখা ছাড়া— ধর্মযাজকের হাত প্রসারিত করেছে পুলিশ। ঘরে ফেরার সময়, নেড়িকুকুরের সাথে, তখনো কি সামান্য বচসা হবে পথে! বিপ্লব না যদি থাকে ধূসর সন্ধ্যার সঙ্গী, অনিকেত, শংকরনারায়ণ নীলাঞ্জনও না থাকে যদি,

অনিন্দিতার কে রাখে ঠিকানা; অন্তত। ভিকি তো থাকবে। বিক্রম, আনন্দপ্রতিভূ। পিঁড়ে ধরবে মেয়ের বিবাহে? ও যে সবই বড় অনায়াসে পারে। অনুকূল করে তোলে সময়প্রবাহ। তুমি থেকো, ভিকি। চারপাশের মানুষেরা, আলোর সন্তান কেউ নয়, সব জেলির ঝাঙাল। এইসব মধ্যবিত্ত রিরংসার লাভা থেকে আমাকে রক্ষা কোরো তুমি। আমি গঙ্গা নামে বেশ্যার বিছানা থেকে উড়ে যাবো শৈশবের ডালে।...

চার

শেয়ার ট্যাক্সি থেকে নেমে; আবছায়া বনমালী নস্কর লেনের মুখে নির্জন রাস্তার আলোয় মুখের সামনে রিস্টওয়াচটা অনেক কষ্টে তুলে ধরে সময় দেখার চেষ্টা করল অনিকেত। বাড়ির ভেতরের ছবিটা ভাবার চেষ্টা করল মনে মনে। বাবা জেগে নেই নিশ্চয়ই। এবং মা কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়েনি। ঘুমিয়ে পড়েছে পুবালী, চূর্ণিকে দুহাতে জড়িয়ে, যাকে খ-অক্ষরটা লেখাশেখানোর কথা ছিল আজ অনিকেতের, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে। তাড়াতাড়ি? প্রায় বারোটা দশ। আর একটু পরেই তো ভোর হবে। তখন চূর্ণি স্কুলে গিয়ে হাতের লেখা পরীক্ষা দেবে আর কাঁদবে। বাবা কেন খ-লেখা শেখাল না? বাবা কেন তাড়াতাড়ি বাড়ি এল না? কে আটকে রেখেছে বাবাকে? চূর্ণি তাকে গুলি করে মেরে দেবে। ভাবতে ভাবতে অনিকেত বেল টিপল দরজায়। খুলে দিল মা। যথারীতি অনিকেতকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, 'আবার জন্ডিস হলে আমি জানি না'— বলে ভেতরে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে অনিকেত সিঁড়ির রেলিঙ ধরে ধরে দোতলায় উঠল। ডাইনিং যদিও নিচে। মা-বাবার ঘরও নিচে। দশটার বেশী রাত হয়ে গেলে পুবালী অনিকেতের খাবারটা ওপরে নিয়ে যায়। অনেকেতের রাজ্যপাট দোতলায়। এক ছেলে, ভাইবোন নেই বলে অতিরিক্ত স্নেহ ও সুযোগ পেয়ে আসছে অনিকেত বরাবরই। বিপদটাও সেখানেই। অতিরিক্ত স্নেহেরও একটা চাপ থাকে। সেসব সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই অনিকেতের। ঘরে আলো জ্বালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল পূবালী। টেবিলে কাঁধের ব্যাগটা কোনরকমে নামিয়ে, টেবিলটা দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনিকেত। স্লিপিং গাউন পরা ঈষৎ ভারী চেহারার পূবালী অনিকেতের জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বলল, কি, আনন্দ হচ্ছে? হাই পাওয়ারের চশমাটা খুলে টেবিলে রাখতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল অনিকেত। সবল হাতে তাকে ধরে ফেলল পূবালী। আনন্দ পাওয়ার জন্যেই তো খাও। নাকি? বলল, আড়াই মাস যখন জন্ডিসে শুয়ে ছিলে বিছানায়, তখন কোথায় ছিল এসব বন্ধুরা? কেউ তো একবার খোঁজ নিতেও আসেনি। খোঁজ শব্দটা শুনে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল অনিকেত। জড়ানো গলায় বলল, চূর্ণি খ লিখেছে? কাল পরীক্ষা। ইস্ কি অন্যায়। বন্ধুবান্ধব দেখলে এত লোভ হয়। আহ্, ক-ত দিন পরে...। হঠাৎ হিস্ হিস্ করে উঠল পূবালী—

খুব হয়েছে। বন্ধু বন্ধু করে তুমি নিজেই খ হয়ে যাচ্ছো দিন দিন। মেয়েকে আর খ-লেখাবে কি! যাও, এখন স্নান করো ভালো করে। তোমাকে দেখে আমারই বমি পাচ্ছে। কি যে এত আনন্দ পাও কে জানে। গুচ্ছের পয়সা নষ্ট, শরীর নষ্ট, ধুত্তোর! বলতে বলতে অনিকেতকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল পূবালী। চশমা খুললে কিছুই প্রায় দেখতে পায় না অনিকেত।

বক বক করতে করতে হুড় হুড় করে জল ঢালছিল পূবালী অনিকেতের মাথায়। বাবু হয়ে বসে, কিছুই প্রায় শুনছিল না অনিকেত। শুধু ভাবছিল, অনিন্দিতা কার সঙ্গে বাড়ি গেল? বিপ্লব, না শংকরনারায়ণ? বিক্রম বা তুঘলক তো ওকে পাত্তাই দেবে না। ওরা আরও খাবে। অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো ব্যথা... অনিন্দিতা লিখেছিল। কিসের এত ব্যথা, মানুষের? সবাই কি খ হয়ে যাচ্ছে কিছুটা, যা লিখতে পারে না চূর্ণি কিছুতেই।

পাঁচ

ছেলেরা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলে আমার এত বিরক্ত লাগে, কি বলবো। ট্যাক্সিতে জানলার ধারে বাইরের দিকে মুখ করে বসে অনিন্দিতা বলল। চুল উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। ফর্শা গোলগাল মুখে নেশাগ্রস্ত আভা। ফাঁকা রাস্তা। রাত সাড়ে দশটা। শংকরনারায়ণ তাকে লেক-টাউনে নামিয়ে দিয়ে বাগুইহাটি যাবে। বিক্রম, তুঘলক আর বিপ্লব একসঙ্গে ভিড়িয়ে দিল শংকরনারায়ণকে। তুই তো ওই দিকেই যাবি। তুই যা। তুই যা। নেশাতুরা কবি রমণীকে সঙ্গ দেবার লোভ কার না থাকে। কিন্তু ওরা এত উদাসীন হয়ে রইল কি করে। আরও মদ খাবে বলে? কি আছে মদে, যা জ্বলজ্যান্ত রমণীর চেয়েও বেশী আকর্ষণ করে পুরুষদের! তিনজনে মিলে 'তুই যা, তুই যা' বলার ভঙ্গিতে এখন একটা চাপা অশ্রদ্ধা ও ঝামেলা হটানোর প্রচেষ্টা ছিল, যে হঠাৎ বিগড়ে গেল অনিন্দিতা। খেলনা ভেঙে যাবার পর কোনো নিতান্ত বালিকার মতো অপমানিত মুখে অনিন্দিতা বলেছিল, কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারবো। ততক্ষণে, ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছে ঈশ্বর ত্রিপাঠী। শংকরনারায়ণ নিজে থেকেই বলল— আমি তো ওই দিকেই যাবো। চলো, ওঠা যাক। এত রাতে তোমাকে একা ছেড়ে দেওয়াটা বন্ধুত্বের কাজ হবে না। ততক্ষণে সোজা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে অনিন্দিতা। বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর কথাটা বলল।

—সব সময় সব ব্যাপারে অত রিঅ্যাক্ট্ করতে নেই। সান্ত্বনা দেয় শংকরনারায়ণ। বিশেষ কাজ হয় বলে মনে হয় না।

—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালো করে আড্ডা মারা যায় না বলে আমি সংসার পর্যন্ত করলাম না। অনিন্দিতা আবার বলল— বিপ্লবটাও কেমন যেন হয়ে গেছে।

—মল্লিকা চলে যাবার পর থেকে।

—আবার বিয়ে করেছে তো।

—আড়াই বছর একা থাকার পর। তখন ওর ফ্ল্যাটে আমরা কত হুল্লোড় করেছি! সেসব বন্ধ করার জন্যেই বোধ হয় চব্বিশ পরগণার এক প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েকে।

—এ ভাবে কি ভালো থাকা যায়? কি জানি।

—তুমিও তো বিয়ে করলে পারো।

—আবার? ধূর, আর ভালো লাগে না। তাছাড়া, বিপ্লবকে তো আর পাবো না আগের মতো! উঃ, কতদিন পরে দেখা হলো। ভাগ্যিস্ নিয়ে এল বিক্রম।

—কোথায় পেলে ওকে?

—পার্ক স্ট্রিটে। ও আর তুঘলক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পেপসি দিয়ে খাচ্ছিল আর খুব হাসছিল। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম; মেয়েটা সামারের ছুটিতে এসেছে। ভাবছিলাম ওকে নিয়ে শপিং করবো। ভিকি আর এক কাপ পেপসি কিনে বলল, একটু কমিয়ে নিন। গ্রীন লেবেল আছে ব্যাগে। মিশিয়ে দিচ্ছি। কেউ বুঝবে না।

—ভিকি পারে। সবুজ সর্বনাশ ঢেলে দিল?

—কি সর্বনাশ?

—ও একটা আমাদের কথা। শাদা ও সবুজ সর্বনাশ। যা খাই আমরা।

এতক্ষণে খিল খিল করে হেসে উঠলো অনিন্দিতা। সর্বনাশ খাই। বলতে বলতে হাসতে লাগল।

—ওটা হোয়াইট। মিশচিফ বলতে গিয়ে শংকরনারায়ণ বুঝল, যাকে বলছে সে কিছু শুনছে না। শুধু হাসছে। অনিন্দিতা ফিরে আসছে অনিন্দিতার মধ্যে।

হাসি থামলে হয়তো গেয়ে উঠবে: আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।...

আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়। তখন কি গলা মেলাবে শংকরনারায়ণ। পারবে কি!

দগ্ধতার দিন

গল্পটা কৃষ্ণার না দময়ন্তীর, বলতে পারব না। গল্পটা গোপার না আরতির, বলতে পারব না তা-ও। কিংবা, গল্পটা আশিসের না কল্লনের, বলতে পারব না তা-ও। এখন, এদের মধ্যে সম্পর্ক সূত্রগুলো বলা যাক। দময়ন্তী হল কল্লনের মা। আশিস কল্লনের খুড়তুতো ভাই। গোপা বোন। আরতি বউ। কৃষ্ণা আয়া। আপাতত এটুকুই যথেষ্ট।

হয়েছে কী, এক রবিবার, ধরা যাক ১৪ই মার্চ, ১৯৪৯— বিকেল শেষ বা সন্ধের শুরু হবার মুখে, কল্লন সরকার, রবিবারের কেরানি-ঘুম থেকে উঠে— শান্তশিষ্ট ধর্মপ্রাণ গৃহবধূ আরতির দেওয়া চা-টা মুখে দিয়েছে সবে— ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বাজল। খুড়তুতো ভাই আশিস। দাদামণি, জ্যেঠাইমা পুড়ে গেছে। শিগ্গির চলে এসো। ব্যাস্। সেই শুরু। ঝামেলার। এবং গল্পেরও।

ঘুমটা তখনো ভালো করে ছাড়েনি বলে— কিংবা পুড়ে গেছে না পড়ে গেছে সেটাও ভালো করে বুঝতে পারল না বলেও হয়তো— টেলিফোনটা আরতিকে দিয়ে বাকি চা-টা শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কল্লন। হাতটা চলে গেছে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে। অপ্রসঙ্গত, আশিসের বউ মিনতি— আরতির বোন। আশিসের কথাবার্তা আরতি তাই বুঝতে পারে ভালো। পারলও। ফোনটা রেখে দিয়ে বলল— চলো। তৈরি হয়ে নাও। তোমার মা পুড়ে গেছে।... কসবা থেকে বেলঘরিয়া— ট্রেনে ট্রেনে গেলেও তো, অন্তত, ঘণ্টাখানেক লাগবে, না কি? কাউকে ফোন করার থাকলে করে নাও। আরতি থামল। চা-টা দ্রুত শেষ করে শাড়ি পরতে চলে গেল।

এতাদৃশ পরিস্থিতিতে মদ্যপানের তীব্র পিপাসা জাগে কল্লনের। আজকাল এরকমই অভ্যাস তৈরি হয়েছে। যৎসামান্য বিপন্ন লাগলেই মন ও শরীর শুধু মদ চায়। এ অবস্থা অবশ্য একদিনে হয়নি। দীর্ঘ নিঃসন্তান জীবনযাপনের ক্লান্তি, বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনা— নিঃসঙ্গতা, সব মিলিয়ে আজকাল এরকম হয়েছে। রবিবারের সন্ধেটা অন্তত, সারাসপ্তাহের মধ্যে এ-জন্যেই তোলা থাকে। বড়বাজার ব্রাঞ্চের ব্যাংক অফ্ ইন্ডিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দত্ত কাছেই থাকে, আই-টি-ও তালুকদারও কাছেই থাকে, এক এক রবিবার এক জনের বাড়িতে সব হয়। এই রবিবার কল্লনের পালা ছিল। অতএব কিছু টেলিফোন তো করতেই হবে। অন্তত, একটা তো করতেই

হবে। একজনকে বললেই চলবে। তাই করল কল্পন। পুড়ে গেছে বলতে, কল্পন লক্ষ করল— সেও ওই— পড়ে গেছেই শুনল। দত্ত বলল— পড়ে গেছে? কোথায়? বাথরুমে? আমার স্ত্রীরও তো একবার মিসক্যারেজ হয়েছিল বাথরুমে পড়ে গিয়ে। কল্পন বলল— পড়ে যায়নি, পুড়ে গেছে। কী করে কী হয়েছে ঠিক জানি না এখনো। এক্ষুনি ও বাড়িতে ছুটতে হবে। আজ আর...। দত্ত বলল— না না, সে তো বটেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিয়েছে আরতি। এ বাজারে এত ডিউটিফুল ওয়াইফ পাওয়া ভার। তবে, সন্দেহবাতিক কল্পনের সন্দেহ— ও বাড়ি যাবার কথা উঠলেই আরতি কেমন চনমনে হয়ে ওঠে— শুধু মিনতির সঙ্গে দেখা হবে বলেই। কথায় বলে, রাজায় রাজায় দেখা হয়— বোনে বোনে দেখা হয় না! প্রথম যখন আশিসের সঙ্গে মিনতির বিয়ের কথা হয়—। না সে গল্প অন্য। এক গল্প থেকে অন্য গল্পে যাওয়া ঠিক নয়।

যে কোনো যৌথ পরিবার যে ভাবে ভেঙে যায়, ছড়িয়ে যায়, কল্পনরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ছড়িয়ে যেতে যেতে যারা শেষ অব্দি থেকে গেছে, তারা হল— কল্পনের মা, ছোট ভাই আলাপন; কাকিমা, খুড়তুতো ভাই আশিস, আর নকাকা এবং নকাকিমা। বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে নকাকা ইন্টারেস্টে খায়। নিঃসন্তান। পাগলাটে কাকিমাকে সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত। মেজোকাকি বিধবা। আশিস পাড়ার দাদা, পার্টির নেতা, একটা ওষুধের দোকান আছে বাড়ির নীচেই। পাশেই আলাপনের দোকান। টেলারিং প্লাস ইলেকট্রিকাল গুড্‌স্ প্লাস স্টুডিয়ো। সে এক খিচুড়ি। নিজেই সামলায় সব। আসলে কিছুই সামলাতে পারে না!

প্রায় সর্বাঙ্গে সোফ্রামাইসিন মাখানো, পোশাকের কোনো প্রশ্ন নেই— দময়ন্তী কাতর আর্তনাদ করছেন অনবরত বিছানার একপাশে শুয়ে শুয়ে— ভালো করে শুনতেও পারছেন না— দৃশ্যটা দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল কল্পন। আরতি দ্রুত বাইরের কাপড় পালটে শাশুড়ির সেবায় লেগে গেল। সেটা দেখে অনেকটাই আশ্বস্ত হল কল্পন। আশিস বলল, সন্ধে জ্বেলে দেশলাই কাঠিটা না নিভিয়ে এমন ভাবে ফেলেছে— দোকানে যাবে বলে তাড়াহুড়ো করছিল জেঠাইমা— জ্বলন্ত কাঠিটার আগুনে তাঁতের কোরা কাপড়টা ধরে গিয়ে— বয়েস হয়েছে তো, কাপড় খুলতে যতটা সময় লেগেছে তাতেই— শায়ার গিঁট খুলতে পারেনি....। কল্পন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল— সামান্য একটা ধূপকাঠি জ্বালতে গিয়ে...। ডাক্তারবদ্যি কাউকে...। আশিস বলল— আজ তো রোববার। কাল বিকেলের আগে কাউকেই পাওয়া যাবে না।.... কল্পন বলল— সে কী রে! কাল বিকেলের আগে কাউকেই পাওয়া যাবে না? ওষুধের দোকান আছে বলে ডাক্তারদের বেশ ভালো করেই চেনে আশিস। ছোট্ট করে বলল— নাহ্।

এ বাড়িতে ঘর কম বলে দময়ন্তীর সঙ্গে এক ঘরেই থেকে গেল কল্পন ও

আরতি। আলাপন শুয়ে পড়ল দোকান ঘরেই। রাতের খাওয়া সারতে হল মিনতির কাছে।

রাতটা যে কী ভাবে কাটল! দময়ন্তীর আর্তনাদ শুনে যেতে হল ক্রমাগত। ঘুমের কোনো প্রশ্নই নেই। সমানে সান্ত্বনা দিচ্ছে আরতি। মাঝরাতে একবার বাথরুমে যেতে গিয়ে বিছানা থেকে নামার সময় পড়েই গেলেন দময়ন্তী দড়াম করে। সতর্ক ছিল আরতি। তবু সামলাতে পারল না। বলল— একবার ডাকবেন তো! অন্ধকারে বুঝতেই পারিনি। বাথরুমে যেতে হবে না। এখানেই যা করার করুন। আমি ধুয়ে দোব'খন।

সেই শুরু।

ছোট বোন গোপা খবর পেয়ে এল সকালে। কোঠারি হাসপাতালের স্টাফ নার্স। এসেই ঘরটাকে কেবিন বানিয়ে ফেলল প্রায়। ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে, দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে, মাঝবরাবর দড়ি খাটিয়ে— সেখান থেকে স্যালাইনের বোতল ঝুলিয়ে— দময়ন্তীকে স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা করে ফেলল চটপট। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল কল্পন। এই মেয়েটা এই তো সেদিন ইস্কুলে যাবার আগে বলত দাদা, দট্টা পইসা দেবে?

সময় কীভাবে পালটে যাচ্ছে। অথচ...!

মনে হয়, এই তো সেদিন।

বাবা বাতে পঙ্গু। হাসপাতালে যেতে পারবে না। কল্পনই কোলে করে নিয়ে এসেছিল এই গোপাকে। সেই গোপা। মা-মেয়ের সম্পর্ক এমনিতেই অন্যরকম হয়। এখন তো পরিষ্কার বুঝল কল্পন— গোপা নার্স হয়েছে বলেই হোক বা না হোক, সে না থাকলে মাকে বোধহয় ইনফেকশন থেকে বাঁচানোই যেত না। যেভাবে স্যালাইন দিল! চিন্তা করা যায় না!

ডাক্তার দেখেই বলল, বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না।

আশিস অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এল দ্রুত। গোপা ততক্ষণে ব্যান্ডেজে ব্যান্ডেজে মুড়ে দিয়েছে প্রায় সারা শরীর। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে পোড়া ঘা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কল্পনের বার বার মনে হতে লাগল— মেয়েটা এত কিছু শিখল কখন।

বেলঘরিয়ায় নার্সিং হোম নেই তা নয়। কল্পন তাতে রাজি নয়। এখানে দেখাশোনা করার তো কেউ নেই। আশিস বিপদটা সাময়িক সামলে দিয়েছে ঠিকই— কিন্তু তার ওপর তো নির্ভর করা যায় না। আলাপনের ওপর নির্ভর করার তো প্রশ্নই নেই। কেন? সে কথা আলাদা। আলাপন যে কী করে আর কী করে না...।

সোজা কসবায় বাড়ির কাছে একটা নার্সিং হোমে মা'কে নিয়ে এল কল্পন। ডাক্তারও জানাশোনা। ভর্তি হতে হতে রাত একটা বাজল।

সকালে 'ডিউটি আছে' বলে একবার দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করে কাজে চলে গেল গোপা। 'দোকান খুলতে হবে' বলে চলে গেল আলাপনও। কল্পনই বা অফিস

যাবে না কেন? সকাল বিকেল আরোগ্য নিকেতনে যাতায়াত করতে লাগল আরতি। খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন আসতে লাগল এন্তার; সবাইকে সমান আতিথ্য দিতে লাগল আরতি। আত্মীয়স্বজন আসা তো প্রায় উঠেই গেছে আজকাল।

দিন সাতেক পরে নার্সিং হোমের রিসেপশনে বিলের খোঁজ করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল কল্লনের। সাড়ে বারো হাজার প্রায়। গোপা দু-এক বার ইঙ্গিত দিয়েছিল, মনে পড়ল এখন। তিরুপতি প্রবাসী বড়দাকে ফোন করেছিল গোপা। কাজের চাপ, আসতে পারবে না, টাকা পাঠিয়ে দেবে। পরের ভাই একদিন দেখা করে গেল। সঙ্গে এনেছিল মাত্র একহাজার। সে-ও ওই— গোপার ফোন পেয়ে। সবচেয়ে ছোটবোন— কিন্তু তার কথা ঠেলতে পারে না কেউ। আসলে, যেটা ঠিক, সেটা যেই বলুক— ঠেলতে পারে না কেউ।

কুড়িয়ে বাড়িয়ে টাকাটা জোগাড় করে ডাক্তারকে বলতে বাধ্য হল কল্লন— যদি কিছু মনে না করেন, আমরা পেশেন্টকে বাড়ি নিয়ে যাব। এখানকার যা খরচ...। ডাক্তারবাবু বললেন— আমার কোনো আপত্তি নেই। ইনফেকশনের আর কোনো ভয় নেই। তবে বন্ডে সই করতে হবে। পেশেন্ট পুরো কিয়োর না হলে তো রিলিজ দেবার নিয়ম নেই।... কল্লন বলল— ঠিক আছে। তাই হবে।

পিজি-তে ওয়েটিং লিস্ট দেড়শো। এই প্রথম কল্লন জানল— হাসপাতালের বার্ন ওয়ার্ডেও ওয়েটিং লিস্ট থাকে। হায়, ভারতবর্ষ।

মেডিকেল কলেজের কোনো কেবিন খালি নেই। অতএব বাড়ি। ভরসা সেই গোপা। এখানেও কল্লনের পড়ার ঘরটাকে হাসপাতালের কেবিন বানিয়ে ফেলল গোপা। দু-দুটো আয়া রাখা হল। দিনে কৃষ্ণা। রাতে শ্যামলী। শ্বশুরবাড়ির ফাঁকে, কাজের ফাঁকে, সময় পেলে গোপা।

নার্সিং হোমের কী হাল! কেবিন ভাড়া আড়াইশো, ডাক্তার ভিজিট ডেলি দুশো, আয়া চার্জ, ওষুধ-ইনজেকশন তো আছেই, স্যালাইনের বোতল পালটালে তারও চার্জ আছে। গোপা তো হেসে বাঁচে না। আমাদের অতবড় হাসপাতালেও এসব নেই— স্যালাইনের বোতল চেঞ্জ করবে, তার আবার চার্জ। অতবড় মানে কোঠারি।

বন্ডে সই করে মাকে তো নিয়ে এল কল্লন। ফ্ল্যাটে ঘর মাত্র দুটো। একটা ঘর ছেড়ে দিতে হল দময়ন্তীর জন্য। বইয়ের র‍্যাকে ধুলো, পোড়া ঘায়ের পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল সেটা। এক কোণে আরতির ঠাকুর পাতা। সে সব চলে এল পাশের বেড-রুমে। আরতির ঠাকুরের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সিংহাসনে ধরবে না বলে তিন থাকের র‍্যাক কিনে দিয়েছে কল্লন। সকালে সন্ধ্যায় ঝাড়া এক ঘন্টা করে ঠাকুরের সামনে রোজ ধ্যান করে আরতি। দময়ন্তীর জন্যে তার সে শান্তিও গেল বলে।

কৃষ্ণার পরিশ্রম দেখবার মতো। অসীম যত্নে সে দময়ন্তীকে ব্যায়াম করায়, স্নান করায়, বিছানা চাদর কাচে, বাথরুম করায়, সবকিছু পরিষ্কার করে। বরিশাল থেকে

এক কাপড়ে কোলের বাচ্চাকে নিয়ে এপার বাংলায় পালিয়ে এসেছিল। আরতির কাছে তার নানান গল্প শোনে কল্পন রোজ রাতে।

বরিশালের পটুয়াখালিতে বাড়ি। বিয়ে হয়েছিল চোদ্দো বছর বয়সে। নদীপথে সারাদিন লেগে যেত শ্বশুরবাড়ি যেতে। স্বামী ছিল স্কুলটিচার। একটা আইবুড়ো ননদ ছিল। সে রোজ কৃষ্ণার স্তন কামড়ে ছিঁড়ে রক্ত বার করে দিত। বলত কাউকে বলে দিলে গলা টিপে মেরে ফেলবে।... স্বামী ছিল মাতৃভক্ত, নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। শাশুড়ি খুব দজ্জাল। শ্বশুর ছিল না।... দিনের পর দিন মুখ বুজে সব সহ্য করত কৃষ্ণা। বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো বলে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিত রোজ শ্বশুরবাড়ি থেকে। স্কুল ছেড়ে ব্যাংকে চাকরি হবে বলে একবার কুড়ি হাজার টাকা এনে দিয়েছিল কৃষ্ণা বাবার কাছ থেকে। চাকরিটা হয়েওছিল। কিন্তু তাতে যেন আরো চেপে বসল ওরা কৃষ্ণার ঘাড়ে। বিভিন্ন অত্যাচার বেড়ে গেল আরো। একদিন ওর রক্তাক্ত স্তন দেখে ওর স্বামী...। সে অনেক কথা।

একদিন, এক কাপড়ে, একমাত্র সন্তান কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কৃষ্ণা। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল শাশুড়ি। কৃষ্ণা বলেছে— শুধু বাড়ি কেন দেশ ছেড়ে চলে যাব।

সে প্রায় বছর বারো আগের কথা।

এপারে এসে কত কাণ্ডই যে করেছে কৃষ্ণা।...

সে সব কথা এক এক দিন একটু একটু করে আরতিকে বলে কৃষ্ণা। আরতি বলে কল্পনকে।

গোপা আসে সময় পেলে। গোপাকে দেখলেই দময়ন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। প্রথম বক্তব্য— আমি আর বোধহয় ভালো হব না। তারপর— ব্যায়াম করানোর নামে কৃষ্ণা যা খুশি অত্যাচার করছে!

প্রথম প্রথম তেমন গা করত না গোপা। ক্রমশ প্রভাবিত হতে শুরু করল। একদিন তো খেপেই গেল খুবজোর। সারাদিন পায়খানা হচ্ছে বলে বউদি রোজকার ছোলা-বাদাম মা-কে দেয়নি। ব্যাস্। কী থেকে কী কথা যে বেরোল। মেয়েদের যেমন হয়। সেসব এ গল্পের বিষয় নয়।

যেমন নয় কৃষ্ণার দুঃখকষ্ট। যাকে ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। প্রথমে এক মাসির বাড়িতে উঠে— পরে শস্তাতম ঘরভাড়া নিয়ে, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে— কোলের বাচ্চাকে নিয়ে— কী ভাবে যে কাটিয়েছে কৃষ্ণা। সিগারেটের খোল একহাজার পাকালে তিন টাকা মজুরি— তাও পাকিয়েছে। তার ওপর সর্বোপরি— পুরুষসঙ্গীহীন মহিলার যে সব সমস্যা বাহাদুর পুরুষদের সমাজে হয়ে থাকে— সে সব তো দিবারাত্র লেগেই থাকত।...

কল্পনেরও, সমস্যা হত না। হল, কৃষ্ণা তার যাবতীয় সমস্যা বউদির বদলে যেদিন থেকে দাদাকে— মানে কল্পনকে বলা শুরু করল।

—জানেন দাদা, আমার বাড়ির সামনে একটা মুরগিওলা আছে।

কল্লনা বাধা দেয়— আমার বাড়ি ? তোমার আবার বাড়ি আছে নাকি ?

—ওই আছে একটা। লাইট নেই। জল নেই। কোনোরকমে চার দেওয়ালের ঘর তুলেছি একটা। বাবা টাকা দিয়েছিল। সে বাড়ি নিয়েও কী ঝামেলা যে গেছে।

—কী ঝামেলা ?

—আমার এক দিদি জামাইবাবু এসে থাকতে লাগল। দিদি একদিন বলল— এ বাড়ি আমার। তুই বেরিয়ে যা। বাড়ি তো বাবার টাকায় করা!

—তুমি সত্যি বেরিয়ে গেলে নাকি ?

—বেরিয়ে যাব বলে তো আর বাড়িটা করিনি। তবে কাজে তো বেরোতেই হবে। একদিন কাজ থেকে ফিরে দেখি দরজায় মস্ত একটা নতুন তালা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম থানায়। ব্যাস্। পুলিশই ভেঙে দিল তালা!

—মুরগিওলা না কি যেন বলেছিল ?

—হ্যাঁ, একটা বেআইনি পোলট্রি খুলেছে ঠিক আমার বাড়ির নাকের ডগায়। আর তার যাবতীয় জঞ্জাল রোজ ফেলবে ঠিক আমার বাড়ির উঠোনে। বলুন তো দাদা, আমার বাড়ির উঠোনটা কি ডাস্টবিন ?

—না না, তা কেন হবে। তা, তুমি কাউকে বলোনি কেন ?

—বলিনি ? মিউনিসিপ্যালিটির চেয়্যারম্যানকে বলেছি, থানায় বলেছি, নাগরিক কমিটিকে বলেছি, এস-ডি-ও সাহেবকে পর্যন্ত বলে এসেছি।

—বলো কী ? তুমি তো সাঙ্ঘাতিক মেয়ে দেখছি!

আর একদিন বলল— শালা মুরগিওলা আমার বাড়ির ওপর দিয়ে জলের লাইন নিয়ে গেছে। আপনি কিছু করবেন কি না বলুন দাদা— আপনার এত জানাশোনা।

কল্লন ভাবল এ তো ভারী বিপদ। মা অসুস্থ, তার আয়া, দিনে পঞ্চাশ টাকা— এমনিতেই লাগছে রোজ— তার ওপর সেই আয়ার এত অভাব অভিযোগ— সেসবেরও সমাধান যদি কল্লনকে করতে হয়!

শান্তভাবে পরামর্শ দিল কল্লন— পুলিশকেই চেপে ধরো। আর পাড়ার নাগরিক কমিটিকে। তাতেই কাজ হয়ে যাবে ঠিক, দেখো।

তখনকার মতো যেন শান্ত হল কৃষ্ণা।

ক'দিন পরে বলল— আপনি ঠিক কইসেন দাদাভাই। পুলিশ উয়োরে ডাইক্যা খুব জোর কড়কে দিসে...।

কল্লন একদিন বলল— তোমার ছেলেকে তো একদিনও নিয়ে এলে না ?

কৃষ্ণা বলল— আমি কি কাজ করি সেটা আমার ছেলে দেখুক, আমি চাই না! ও জানে, মা চাকরি করে। ও যেমন হস্টেলে আছে তেমন থাকুক না। যেদিন বাড়ি আসে সেদিন আমি আর কাজে যাই না।

এটা অবশ্য খারাপ লাগল না কল্লনের।

পরে আরতিকে একদিন জিগ্যেস করল— দশ বারো বছর তো হয়ে গেছে বলে। ডিভোর্স করে না কেন? আবার বিয়ে করলে তো পারে। একটাই তো ছেলে। ছেলেসুদ্ধ অনেকেরই তো ফিরে বিয়ে টিয়ে হয় আজকাল।

রাতের বিছানায় হিস্ হিস্ করে ওঠে আরতি— খুব মনে ধরেছে দেখছি! দেখতে শুনতে ভালো। ফরসা রং। তোমাকে যা দাদা দাদা করছে। আমার তো বাচ্চা-কাচ্চা হল না। তুমিই রেখে দাও না ওকে!

কল্লন চুপ করে যেতে বাধ্য হল।

পরে আরতি বলল— ইউটেরাসে টিউমার ছিল কৃষ্ণার। নার্সিং হোমে ধরে করে টিউবেকটমি করিয়ে নিয়েছে। ধার শোধ করে যাচ্ছে এখনো। ও আবার বিয়ে করবে কি?

প্রায় মাস তিনেক পরে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল কল্লনের। হঠাৎ একদিন হিসেব করে দেখল— এই তিন মাসে টোটাল খরচ হয়েছে প্রায় আঠারো হাজার টাকা, তিরুপতি থেকে তিন খেপে তিনহাজার করে বড়দা পাঠিয়েছে ন'হাজার, পরের ভাই এক হাজার করে দু-বারে মোটা দু'হাজার— বাকি সব কল্লনের। এ ছাড়া যত আত্মীয়স্বজন এসেছে দময়ন্তীকে দেখতে, তাদের চা-জলখাবার-মিষ্টি; দিনের রাতের মিলিয়ে দু-জন আয়ার খাওয়াদাওয়া এবং টিফিন; সব মিলিয়ে মাইনের টাকা, অফিস কো-অপারেটিভে যা ছিল, প্লাস পাড়ার ব্যাংকে— মোটামুটি সবই প্রায় শেষ। আরতিকে ব্যাপারটা বলতে গেলে আরতি পরিষ্কার বলে দিল— ওসব তো আমি জানি না। টাকা পয়সা তোমার ডিপার্টমেন্ট। কল্লন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল— তা বলে কি কোনো পরামর্শও দিতে পারো না? আরতি বলল— ও, পরামর্শ? তাই বলো। বেহালায় তোমার আর এক ভাই আছে না? মাত্র হাজার-দুই টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। তার কাছে এক মাস পাঠিয়ে দাও না মা'কে। কল্লন বলল— ওহ্। তাহলেই হয়েছে। গোপার বিয়ের সময় যা চাঁদা পড়ল তার অর্ধেক ঠেকিয়ে পালাল। আর বিয়েটা মেটার পরই নতুন একটা ঝাঁ-চকচকে হিরো হন্ডা কিনল! ওর কাছে মা-কে পাঠাব। ধুর। ও একটা না একটা ছুতো করে ঠিক কাটিয়ে দেবে।

পরে আরতির কাছে এসব গল্প শুনে কৃষ্ণা বলল— এ্যাদ্দিন ধরে এত কিছু করে শেষকালে যদি মাকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, আপনাদের সব চেষ্টা মাঠে মারা যাবে! উলটে আপনাদের বদনাম করবে আপনার ভাই!

মাসপয়লায় মাইনে পেয়ে মুরগি কিনছিল কল্লন, মাকে টেংরির জুস খাওয়াবে। ছাল ছাড়ানোর পর মাংসের যে রং হল, তা দেখে মনে মনে চমকে উঠল কল্লন। তাড়াতাড়ি ঘা শুকোবার জন্যে ডাক্তার পোড়া জায়গাগুলো খোলা রাখতে বলেছিল। বেশির ভাগ নিম্নাঙ্গটাই পুড়েছে বলে গায়ে শুধু একটা ব্লাউজ ছাড়া আর কিছু রাখত না মা।

আজ ছাল ছাড়ানো মুরগিটার ঠেংরি কাটার দৃশ্য দেখতে দেখতে কল্লনের মনে হল, লোকটা মাকেই কাটছে।

ছাল ছাড়ানো মুরগির গায়ের রংটা একদম মায়ের পোড়া ঘা-য়ে গজিয়ে ওঠা নতুন গোলাপি চামড়ার মতন।...

কিন্তু, শুধুই কি সে জন্যে?

বাঁক

সারাদিন বাড়ি থেকে না বেরোলেও পুরো নব্বুইটা টাকা জলে গেল। জলে মানে জলেই। স্নানের আগে দুপুরে একটা হুইস্কির নিপ্। রাত্রে নটার পর আর একটা। সেটা রুটিন।

অফিসে বেরোলে খরচ হওয়া স্বাভাবিক। দিনে পঞ্চাশটা টাকা লাগেই। শুধু হাত খরচ। ফেরার সময় পকেটে একটা নিপ্ না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অবিনাশ হিসেব করে দেখেছে— সব মিলিয়ে একশো দশ বিশ টাকা তার লেগে যায় প্রতিদিন। অর্থাৎ, সে তাহলে আজকাল— যাকে বলে রীতিমত সচ্ছল মধ্যবিত্ত।

নিজের ফ্ল্যাট আছে। স্কুটার আছে। ফ্রিজ আছে। রান্নার গ্যাস তো আছেই। ডাইনিং টেবিল। প্রায় একমাস হতে চলল, টেলিফোনও পেয়ে গেছে অবিনাশ। শুধু টিভিটা কালার নয়, সাদা-কালো। খরচের হাত বেশী বলে টাকা জমছে না কিছুতেই। তাই কালারও হচ্ছে না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছে— ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট্ এক্সচেঞ্জ করে ইনষ্টলমেণ্টে কালার টিভি দিচ্ছে একটা কোম্পানি। কিন্তু ইনস্টলমেণ্ট আর বাড়াতে চায় না অবিনাশ।

মাস পয়লার এমনিতেই এন্তার ইনষ্টলমেণ্ট দিতে হয় তাকে; জামা-প্যান্টের পিস্, শাড়ি, কাশ্মীরী শাল, সোয়েটার, এমনকি গানের ক্যাসেট বা গেঞ্জি বা শায়া পর্যন্ত অফিসে গুছিয়ে দিয়ে যায় বিভিন্ন লোক। কাউকেই চট করে 'না' করে না অবিনাশ টাকা তো লাগছে না এক্ষুনি, আর জিনিসটাও তো দরকার— এই ভেবে নিয়ে নেয়। ফলে মাস পড়লেই অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা তো যায়ই।

মঙ্গলবার আসে গোবিন্দ। তাঁতের শাড়ি। গোবিন্দর খাতায় যে একবার নাম লিখিয়েছে সে আর নাম মোছাতে পারেনি! এক একজন মহিলার তো দশ হাজার বিশ হাজার ধার আছে গোবিন্দর কাছে। সুদূর নদীয়ার কোন গ্রামের ছেলে গোবিন্দ। এখন ডালহৌসির বুকে খোদ আর এন মুখার্জি রোডে দোকান। প্রতি মঙ্গলবার দু'জন কর্মচারীর ঘাড়ে শাড়ির মোট চাপিয়ে এ-জি-বেঙ্গলে আসে। প্রতি সোমবার হয়তো রাইটার্সে যায়। অবিনাশ দীঘায় দেখেছে গোবিন্দকে। হোটেলের বারান্দায় উদাসীন বসে আছে একা। পরে বলেছিল হনিমুনে গেস্‌লাম স্যার! বারান্দায় বসে থাকা দেখেই অবিনাশ বুঝে নিয়েছিল— নাহ্, নতুন বৌ নিয়ে দীঘায় গিয়ে, মদ কিন্তু খায়নি গোবিন্দ। গোবিন্দ ঠিক মদের মানুষ নয়। মোটা একটা হিসেবের খাতা

হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাতে যত টাকার কথা লেখা থাকে, অত টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেনি অবিনাশ। অথচ গোবিন্দকে দেখেই মনে হয় সে ক্লাশ এইট ফেল আর ইংরেজিতে এম-এ অবিনাশ গোবিন্দকে টাকা দিয়ে যায় প্রতি মাসে।

কয়েকজন মহিলাও শাড়ি নিয়ে আসে। সংখ্যায় তারা বাড়ছে। একজন আছে— এম এস্ সি পড়তো, অসুস্থ মা আর ভাই আছে। একজন গৃহবধূ। একজন প্রৌঢ়া। অফিসের মেয়েরা এইসব মহিলাদের সাহায্যও করে নানারকম। এক ভদ্রলোক আসেন শুধু রুমাল নিয়ে! সারা বছর শুধু বিভিন্ন রকম রুমাল বিক্রি করে তাঁর কি এমন লাভ হয় কে জানে। অবিনাশ অবশ্য তাঁর কাছ থেকে রুমাল কেনেনি কখনও। তবে যে গেঞ্জি নিয়ে আসে তার কাছ থেকে প্রায়ই গেঞ্জি কেনে। ভদ্রলোক কোথায় যেন চাকরিও করেন। বাইশ টাকার গেঞ্জিতে কুড়ি টাকা দিতে গেলে একগাল হেসে বলবে— হচ্ছে না তো!

অফিস থেকে শাড়ি আনলেই চেঁচামেচি জুড়ে দেয় মিনতি। আবার ধার? খালি ধার ধার ধার ধার! ফেরৎ দিয়ে আসবে কাল। এক ধারের শাড়ি আমার দরকার নেই।... পাশের ফ্ল্যাট থেকে তমাল পালের বৌ অঞ্জনা মিনতির শাড়ি এল? দেখি, দেখি। মিনতির কি কপাল। রোজ রোজ শাড়ি আসছে। আমাদের তো সেই পূজো কি পয়লা বৈশাখ।

তা মিনতির কি আছে না আছে সেসব মিনতির নিজের চেয়ে অঞ্জনা বেশী জানে। শুধু মিনতির নয়, আশপাশের অনেক ফ্ল্যাটের বৌয়েরই হাঁড়ির খবর জানে অঞ্জনা পাল। অবশ্য তাতে উপকারও পায় অনেকেই। কারও স্বামী বাড়ি থাকবে না শুনলেই অঞ্জনা পাল হাজির হয়ে যাবে ভাতের থালা নিয়ে। আপত্তি করার কোনও প্রশ্নই নেই। অঞ্জনা পালের মুখের ওপর— 'তোমার রান্না আমার দরকার নেই'— এ কথা বলবার সাহস নেই কারও। মানুষ স্বভাবতঃ মধ্যবিত্ত। তার ওপর ভাতের থালা ফিরিয়ে দেওয়া...। ওরে বাবা, মা লক্ষ্মীর অবমাননা হবে যে!

একবার, মিনতির অসম্ভব গ্যাসট্রিক পেন উঠলো। অবিনাশ অফিসে! বিকেলবেলা। অঞ্জনাই জোর করে মিনতিকে নিয়ে গেল হাসপাতালে।.... কাম্পোজ ইঞ্জেকশন খাইয়ে আবার বাড়িও ফিরিয়ে নিয়ে এল। পকেটে রোজকার নিপ্ নিয়ে বাড়ি ফিরে অবিনাশ দেখে— বৌ শয্যাশায়ী। বিছানা ঘিরে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'জন মহিলা, যারা কেউ ভুলেও অবিনাশের খোঁজখবর নেয় না কখনো।

অবিনাশকে দেখেই নানা ছুতোয় পালিয়ে গেল মহিলারা। মিনতি বিছানায় মিশে আছে। শুয়ে শুয়েই সব বলল। শুনতে শুনতে অঞ্জনা পালের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল অবিনাশের মন। এমনিতে এতদিন অঞ্জনা সম্পর্কে একধরণের শীতল বিরক্তি ছিল তার মনে। রান্না চাপিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মিনতির কাছে এসে— দুটো আলু— কি একটা পিঁয়াজ— কি এক কাপ চিনি, এসব চেয়ে নিয়ে যায় অঞ্জনা। দোকান যদিও দূরে নয়; ফ্ল্যাটবাড়ির গেটের বাইরেই সবকিছু পাওয়া যায় হাতের কাছেই—

তবু নানান জিনিস চাওয়া অঞ্জনার অভ্যাস। তমাল আর অবিনাশের মাঝখানে মৃগাঙ্কর ফ্ল্যাট। তার বৌ এই ভয়েই দরজার কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেটে তালা দিয়ে রাখে সারাদিন। কখন কি চায়।

এই প্রথম অবিনাশের মনে হল— আসলে বোধহয় অঞ্জনা পাল মেয়েটা নিতান্তই সরল। কুচুটেপনা যেটুকু করে ফেলে, সেটাও বেশ সরলভাবেই করে! মেয়েরা তো এমনিতে কুচুটেই হয়। সে সব যারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে তারাই বরং দেখা যায় বেশী গোলমেলে।

তমাল এমনিতে ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। কিন্তু লোকের বিপদে বেশ এগিয়ে আসে। পাঁচশো আদা কিনতে বড়বাজার ছোটে। কিন্তু অঞ্জনা অন্যদের ভাত-মাছ-তরিতরকারি খাওয়াতে গেলে কিছু বলে না।

তমালের সঙ্গে ভাব এই ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে। ছোটবেলাটা অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে খুব কষ্টে কেটেছে তমালের, ঠিক অবিনাশের মতই। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হয়েছে দুজনের দুরকম। তমাল হয়েছে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও হাড় কৃপণ। সিগারেট পর্যন্ত নিজের পয়সায় কিনে খায় না। বন্ধুরা কেউ সিগারেট খেলে অর্দ্ধেক খাওয়ার পর হাতটা বাড়িয়ে দেয় নির্ভুল আত্মবিশ্বাসে। আর অবিনাশ এসব ভাবতেই পারে না। ছোটবেলা থেকে অর্থাভাবে ভুগে ভুগে তার কাছে টাকা পয়সা জিনিসটাই অর্থহীন হয়ে গেছে। দু-হাতে ধার করে আর খরচ করে। যেন জেনে গেছে, দরকার মতন টাকা পয়সা জিনিসটা সে ঠিক হাতের কাছে পেয়ে যাবে। যতদিন আছে- ধার শোধ করার কোনো চিন্তা নেই। আর তমালের কোনো ধারই নেই কারো কাছে। উল্টে সে বিপন্ন বন্ধুবান্ধবদের ধার দিতে ভালোবাসে। এক ধরণের সূক্ষ্ম সুখ পায়।

একসঙ্গে অফিসে যেতে যেতে একদিন বলেছিল একদম সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকাই সবচেয়ে ভালো। যে কোনো লাইনে একটু অসাধারণ হতে গেলেই অনেক ঝামেলা।... শুধু যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয়।...

আর হাত পাতাটা যে অবমাননার কাজ অবিনাশ সেটা বুঝতেই পারে না।

বিয়ের পর দু-তিন মাসের মাথায় একবার বৌয়ের জন্যে ওষুধ কিনতে গিয়ে তমাল অবিনাশকে বলেছিল। মেয়েদের এত কথায় কথায় শরীর খারাপ হয় কেন বল তো। যখন তখন ওষুধ। বাজে খরচ যত।

তবু তো তোর বউয়ের কোনো ঝামেলাই নেই। মিনতির মতন মাইগ্রেন গ্যাসটিক কি ইউটেরাসে টিউমার থাকলে কি করতিস্‌?

অবিনাশ না বলে পারেনি।

বিয়েই করতুম না। গম্ভীর জবাব তমালের।

বিয়ের আগে জানতে পারলে তো?

অবিনাশ না হেসে পারেনি।

বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একদিন পড়ন্ত বিকেলে পেটের যন্ত্রণায় বিছানায়

কুঁকড়ে যাচ্ছিল মিনতি। নিকটতম নার্সিংহোমে নিয়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নিল। আলট্রাসোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ল টিউমার— ফাইব্রয়েড গ্রুপ। একটা পলিপ্ আছে বাইরের দিকে। আপাততঃ সেটুকু বাদ দেওয়া যাক্— বলে অপারেশন হল। সাত হাজার। সেই শুরু।

তারপর তিন বছর ধরে শুধু ডাক্তার আর ডাক্তার। এ ডাক্তারের কাছে তিন মাস, ও ডাক্তারের কাছে ছ-মাস। একজন তো বলেই ফেললেন— কত আর ওষুধ খাবেন। ইউটেরাসটা বাদ দিয়ে দিন। ছেলেমেয়ে নেই ঠিকই। পরে না হয় অ্যাডপ্ট করে নেবেন।... সুস্থভাবে বেঁচে থাকা তো দরকার।...

অসুখটা এনডোমেট্রোসিস্। পিরিয়ডের সময় ব্লাড সেডিমেন্টেড হয়ে হয়ে শ্যাওলার মত টিউমার হয়। কনসিভ্ করার পক্ষে অসুবিধাজনক। অথচ কন্‌সেপশান ছাড়া এ রোগ সারবেও না।... যেসব ওষুধ খেয়ে যেতে হচ্ছে তার এক একটার দাম একুশ-বাইশ টাকা।

অঞ্জনার এসব অসুখ থাকলে তমাল পাল পাগল হয়ে যেতো।

বরাদ্দ সাড়ে তিন পেগের দেড় পেগ মতন চড়িয়েছে সবে। মিনতি চিঁচি করে বলল— অঞ্জনার মাসতুতো বোন কোঠারি হাসপাতালের নার্স। ওখানে একবার দেখাবে ?

—সে তো অনেক খরচ। অবিনাশ চায়ের গ্লাসটায় বেশী ঢাললো।

—না না। আউটডোর আছে। ও-পি-ডি। বড় বড় ডাক্তার বিনে পয়সায় দেখে।

—এতদিন বলেনি কেন ?

—এখন তো বলেছে।

সুতরাং টেলিফোনে কার্ড হয়ে গেল। সিসটার সমর্পিতা সেন খুব সদালাপী। সোমবার সোমবার বেলা দুটোয় ডাক্তার আসেন। ডি কে চক্রবর্তী। ভারী অমায়িক মানুষ। বড় ডাক্তারদের মতো গোমড়ামুখো নয়। প্রথমেই বললেন— ল্যাপারোসকপি না করে কিছু বলা যাবে না।

করা হল। দু'হাজার একশো। ট্যাক্সি ভাড়া নব্বুই। ওষুধ একশো পঁচাত্তর। অফিস কো-অপারেটিভের ডিরেক্টর তমাল, এম-ডি পল্লব সেনগুপ্তকে ধরে এক কথায় চার হাজার ধার পাইয়ে দিয়েছে। চিন্তা কি।

অপারেশন থিয়েটার থেকে ডাক্তার বেরিয়ে বললেন— অনেকগুলো ব্লক ছিল। সব ওপেন করে দিয়েছি। টিউমার আছে। তবে অসুবিধে নেই। এবার কন্‌সিভ্ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকেও একটা ওষুধ খেতে হবে। আপনি কি অ্যালকোহলিক ? স্মোক করেন ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো অবিনাশ।

ওগুলো মিনিমাম করতে হবে। বায়োপ্‌সি করতে পাঠিয়েছি। সব রিপোর্ট একসঙ্গে নিয়ে আসবেন। ঠিক তিন সপ্তাহ পরে।

যাওয়া হোল। ওষুধ লিখে দিলেন ডাক্তার চক্রবর্তী। বললেন— বয়েস একটু বেশী হয়ে গেছে। কিন্তু চান্স আছে পুরোপুরি। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। ভালো করে চেষ্টা করুন।

প্রায় উড়তে উড়তে কোঠারি মেডিকেল সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল অবিনাশ আর মিনতি।

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে 'গুড্‌লাক' বলল সিসটার সমর্পিতা সেন। অঞ্জনার মাসতুতো বোন।

বাইরে বেরিয়ে মিনতি বলল— তোমার খিদে পাচ্ছে না?

অবিনাশও ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছিল। রিপোর্ট জানার টেনশানে টিফিন করা হয়নি কিছুই। অফিস থেকে চলে এসেছে সোজা। মিনতি এসেছে বাড়ি থেকে।

এ তল্লাটে তো কোনো দোকানপাট নেই। চিড়িয়াখানার সামনে পাওয়া যেতে পারে। একটু হাঁটতে হবে।

—চলো। বলে তরতর করে এগিয়ে গেল মিনতি। তাকে এতটা উৎফুল্ল মেজাজে গত কয়েকবছর দেখেনি অবিনাশ।

চিড়িয়াখানার সামনে থেকে বেছে বেছে পেয়ারা কিনলো মিনতি। ফালি করে কাটিয়ে তাতে নুন-ঝাল মাখিয়ে দিতে বলল। সঙ্গে ঝালমুড়ি-মাখা হাতে নিয়ে হঠাৎ বালিকার মতন বলল— চিড়িয়াখানায় যাবে? সেই কোন্ ছোটবেলায় গেছি!

অফিসে ফেরার তাড়া ছিল অবিনাশের। দুপুর এখনও বিকেল হয়নি। গুমোট একটা গরম। অবশ্য ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘও আছে আকাশে। হঠাৎ একটা হাওয়া দিল কোত্থেকে। শেষ চৈত্রের হাওয়া।

দু-একটা অবাঙালী পরিবার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে লাইন দিয়েছে। অবিনাশের হঠাৎ মনে হল, এ-সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। টিকিট এখন তিন টাকা হয়ে গেছে। এক হাতে ঝালমুড়ির ঠোঙা নিয়ে দুটো টিকিট কাটলো অবিনাশ। যেন জন্মান্তর পরে।

—ভেতরে একটা বীয়ার পাব্ ছিল না? অনুরূপ আর শ্রীময়ীর সঙ্গে শেষ যেবার এসেছিলুম, প্রচুর বীয়ার খাওয়া হয়েছিল, মনে পড়ছে।

—তোমার খালি ঐসব খাওয়া। পেয়ারা খাও। এত মদ খেতে শিখলে কি করে?

—সঙ্গদোষে শিখে গেছি। তোমার ভাইও তো খায়।

—সে তো কনট্রাক্টরের কাজ করে বলে।

—আমার ছেলেপুলে নেই; রাত্তিরে ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—এবার তো হবে।

বলতে বলতে পেয়ারা খেতে লাগলো দু'জনে। অবিনাশের মনে হল, ছোটবেলায় দুপুরের দিকে গ্রামের বাড়িতে পেয়ারা গাছের ডালে বসে আছে পা ঝুলিয়ে।

এদিক ওদিক বিভিন্ন গাছতলায় জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে যুবক-যুবতী। জলের

ধারে একদিকে ইশারা করে মিনতি বলল— কানে চুমু খাচ্ছে, দেখো। অবিনাশ বলল, আস্তে আস্তে শিখে যাবে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি বিবাহিত দম্পতি সে কথা শুনে ফিক্ করে হাসলো।

—অঞ্জনার হাত থেকে বাঁচার আর কোনো রাস্তা নেই। হঠাৎ বলল অবিনাশ।

—হ্যাঁ, ওর বোনকে দিয়ে এত উপকার হল; তুমি শুধু শুধু ওদের ওপর রাগ করো!

—বাড়ি ফিরলেই রোজ যদি শুনতে হয় অঞ্জনা এই বলল, আর তমালদা আজ বড়বাজার থেকে তাই এনেছে— কত শস্তায়— আমার কি করে ভালো লাগবে বলো।

—তোমার কত সঙ্গীসাথী আছে। আমার তো এখানে আর কেউ নেই। বদ্ধ ফ্ল্যাটে তো থাকিনি কোনোদিন। তবু ভাগ্যিস, অঞ্জনা একটু কথা-টথা বলে। জিনিস চায় তো কি হয়েছে! কি আর এমন দাম! তবু তো আসে। কেউ না এলে ফাঁকা ঘরে—। এ-মা, সিংহটা কি রোগা। খেতে দেয় না বোধহয় ভালো করে। পেটগুলো কেমন চুপসে আছে। চোখে পিচুটি। এই সিংহ, আমায় খাবি?

পাশ থেকে একটা গ্রাম্য বৌ বলল— পেলে কি আর ছেড়ে দিত?

অবিনাশের মনে হল, সিংহ নয়; যেন নিয়তির সঙ্গে খুনসুটি করছে মিনতি।